জীবন সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ড. তাপস রায়চৌধুরী
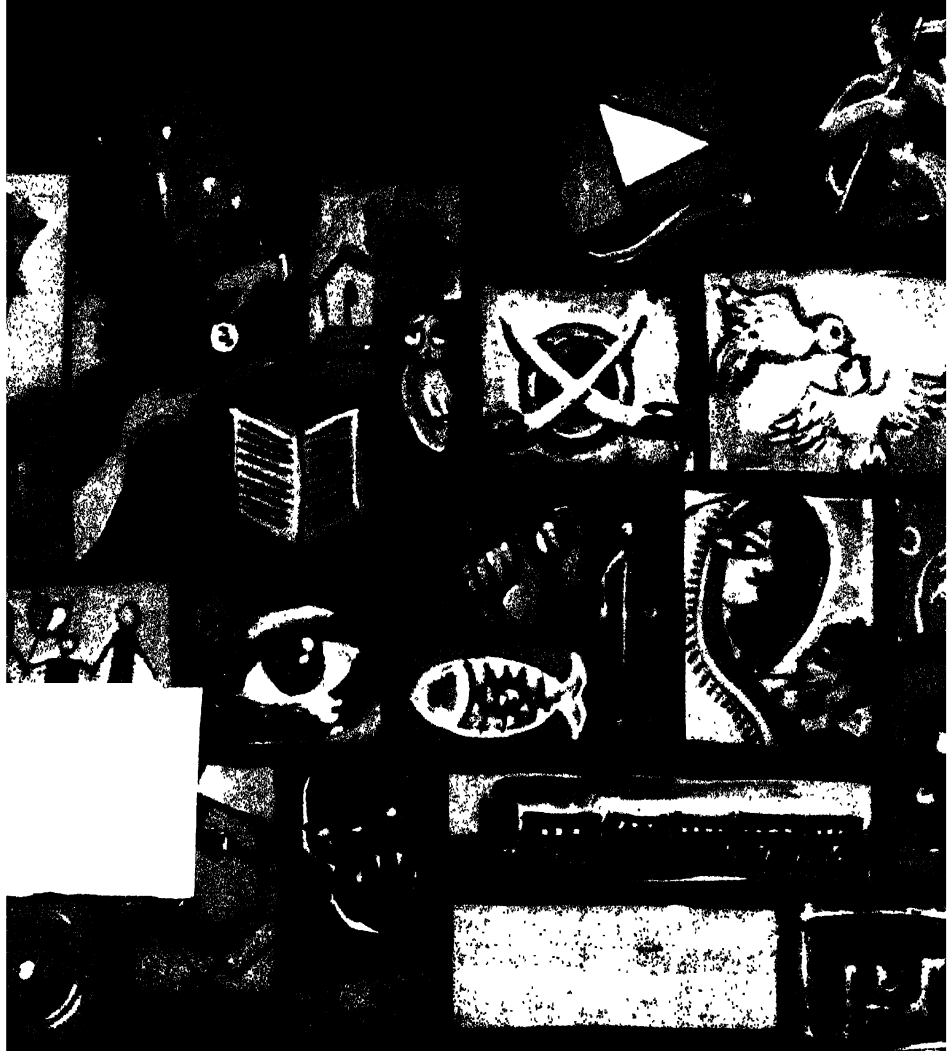
প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০১১

অক্ষর বিন্যাস ঃ নিউ হরাইজন (অনীক দেব), মেলারমাঠ, আগরতলা-০১
মুঠোফোন ঃ ৯৮৬২৩৯২৫৯১/৯৭৭১৪৭৯৫৫/৯৮৫৬৯৩৫০১২

জীবন সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
JIBAN SAMASYAR SAMADHANE SRIMADBHAGAVADGITA
(Reflection of the Gita on Human Life)
by Dr. Tapas Raychoudhuri

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ কৌস্তুভ রায়চৌধুরী
প্রচ্ছদ লিখন ঃ প্রশান্ত মজুমদার ও অসীম দাস
প্রকাশক ঃ উত্তম চক্রবর্তী, ব্যাসদেব প্রকাশনী, শকুন্তলা রোড,
আগরতলা -০১, পশ্চিম ত্রিপুরা। **মুঠোফোন** ঃ ৯৭৭৪৫১৯১৭৭
মুদ্রণ ঃ কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬।

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

e-mail : vyasdevprakashani@rediffmail.com
ISBN : 978-81-909689-4-2.

প্রাপ্তিস্থান ঃ **নিউ আগরতলা বুক সেন্টার**, শকুন্তলা রোড,
আগরতলা -০১, পশ্চিম ত্রিপুরা। **মুঠোফোন** ঃ ৯৮৬২২০৮৩৯৯।
সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬।

ওঁ পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু।।

যাঁদের কৃপায় এই মধুময় ধরণীর ধূলিতে জন্মগ্রহণ করেছি
সেই পিতৃদেব ৺ধরানাথ কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় এবং
৺মাতৃদেবী ঊষা রাণী রায়চৌধুরীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

পরম স্নেহনীয়

শ্রীতাপস কুমার চৌধুরী এম, এ,

পরমকল্যাণবরেষু—

সমগ্র অশেষ শুভাশীর্বাদ-বীজমন্ত্র প্রদান করিলাম

ইতি—

শুভাশীর্বাদক

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ভাটপাড়া (২৪ পরগনা)

১৭. ৭. ৮৩

বিগত শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্য জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব দেশিকোত্তম ড. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তাঁর মৌলিক অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় অধ্যাপক জীবনের সমাপ্তির পর তিনি নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে সংস্কৃত বিভাগে বক্তৃতা প্রদান করতেন। বর্তমান গ্রন্থকার সেই সময়ে তাঁর অমৃতময় বক্তৃতার আস্বাদন পেয়েছিল। তাছাড়াও লেখকের শিক্ষাগুরু ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ছাত্রজীবনে ড. ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর হাতে এই গবেষণা-সন্দর্ভটি তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বার্ধক্যের শত অসুবিধাকে উপেক্ষা করেও গ্রন্থটি আদ্যপান্ত পাঠ করে তাঁব স্ব-হস্তে এই আশীর্ব্বাণীটি লিখে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এখানে তাঁর স্ব-হস্তে লিখিত আশীর্ব্বাণীটি তুলে ধরা হল।

আমার কথা

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমার ছাত্রজীবনের শেষ দিকে বিগত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ায় আমার শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রেরণায় আমি গবেষণাকার্যে ব্রতী হই। সেই সময়ে বাংলার তথা ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হয়েছি। তাদের মধ্যে ড. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ড. অনন্তলাল ঠাকুর, ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ড. কালীকিঙ্কর দত্ত শাস্ত্রী, স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, শিশির কুমার ব্রহ্মচারী, ড. নৃসিংহ রামানুজ দাস প্রমুখের নাম আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। আমার পূজনীয় পিতৃদেব পণ্ডিত ঁধরানাথ কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অন্তেবাসী ছাত্র ছিলেন। তাঁর এবং স্বর্গতা মাতৃদেবীর উৎসাহ ও নিরন্তর অনুপ্রেরণায় আমার কাজটি আরও সহজ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া অগাধ পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের আধার ঁশিশির কুমার ব্রহ্মচারী মহারাজের দিক্ নির্দেশ আমার ক্ষেত্রে আশীর্বাদরূপে নেমে এসেছিল। তাঁরা অনেকেই আজ বিদেহী, আমার এ স্মৃতি তর্পণে তাঁরা অভিসিঞ্চিত হবেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ আমার শিক্ষাগুরু আচার্যদেব গবেষণা সন্দর্ভটি প্রকাশ করবার জন্য প্রেরণা দিয়ে আসছেন, গ্রন্থ প্রকাশ তারই ফল। দীর্ঘ ২৫/২৬ বৎসরে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিকেই পরিবর্তন হয়েছে। মানসিক ভাব ও চিন্তাচেতনার জগতে যে পরিবর্তন এই দীর্ঘ সময়ে আমার ঘটেছে তার কিছু কিছু পরশ এই গ্রন্থটিকে দিতে হয়েছে। কালোচিত করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কিছু কিছু পবিবর্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. পার্থদেব ঘোষ বিজ্ঞানের সাথে সাথে সারস্বত সাধনায় নিবেদিত প্রাণ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে এর সৌকর্য বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এই কাজে আমার সহধর্মিনী অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য এবং পুত্র শ্রীমান কৌস্তুভ রায়চৌধুরীর যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। কৌস্তুভ চিত্রশিল্পী হিসেবে বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত। শ্রীমান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করে দিয়েছে। সেজন্য তাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে ব্যাসদেব প্রকাশনীব কর্ণধার শ্রী উত্তম চক্রবর্ত্তী এবং তার সহযোগী সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি দান করুন— 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

বিনীত —
ড. তাপস রায়চৌধুরী
এসোসিয়েট প্রফেসর
উইমেন্স কলেজ, আগরতলা।

৬ মার্চ, ২০১১
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
১৭৫-তম শুভ আবির্ভাব তিথি

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে নিয়ে কত মহাজনের কত প্রকার ভাবনা ও চিন্তার প্রতিফলন আমরা বিভিন্নভাবে দেখেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের এক বৃহৎ হীরকখণ্ড বললে অত্যুক্তি হবে না। একটি হীরক খণ্ডকে ঘুরালে বিভিন্ন কোণ থেকে যেমন আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে তেমনি এই গ্রন্থের মন্ত্রমালা নানা আঙ্গিকে নানা ভাবে, নানা রূপ মাধুর্যে, চিন্তার প্রজ্ঞায় বিচ্ছুরিত হতে থাকে। গ্রন্থকার অতি সুনিপুণভাবে পাঁচটি পর্যায়ে যথাক্রমে সংস্কৃত সাহিত্য এবং মহাভারত, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ এবং সর্বশেষে সামাজিক সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করেছেন।

বর্তমান সভ্যতার সংকটের এই ক্রান্তিলগ্নে এরকম গ্রন্থের প্রকাশ করে গ্রন্থকার জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন বলে আমি মনে করি। অধ্যাপক ড. তাপস রায়চৌধুরী ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার একজন জ্ঞানতাপস বলা চলে। ১৯৮০ সালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ১৯৮৩ সালে প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণা কর্ম চলাকালীন তিনি শ্রীমদ্‌হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা এবং তার সমন্বয়ী ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেন। এই গ্রন্থে তাঁর বিদগ্ধ জনোচিত উপস্থাপনা আশা করি পাঠককে মুগ্ধ করবে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে গ্রন্থকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যেমন মহাত্মা গান্ধী, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বালগঙ্গাধর তিলক, আচার্য বিনোবা ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীমদ্‌মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি এবং নিম্বার্কীয় আচার্য কেশবকাশ্মীরি ভট্টাচার্যের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থসমূহের বহু উদ্ধৃতি চয়ন করে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এরূপভাবে পূর্বাপর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার বর্ণময়ী, রূপময়ী,

ছন্দময়ী, রসময়ী রূপকে কেউ একসঙ্গে সংযোজিত করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

সর্বশেষে সামাজিক সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— এটি একটি গীতা সম্পর্কে নবতম অনুধ্যানের আকর। গীতাকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বললেই শেষ কথা বলা হয় না। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে জীবন ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে গীতার ভূমিকা যে অসামান্য তা এখানে সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সুদীর্ঘ দু-দশকের বেশি অধ্যাপনা এবং গবেষণার গভীর অন্বেষার দ্বারা মান্যবর ড. তাপস রায়চৌধুরী এই অনন্য সারস্বত জগতকে তৃপ্ত করেছেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ, সেই তরুণ তাপস, যৌবনের তাপস, এখন প্রজ্ঞায় বিভূষিত প্রৌঢ় তাপসকে আমার হৃদয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সচ্চিদানন্দঘন শ্রীরাধাবৃন্দাবনবিহারীজির নিকট তাঁর জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি। অলমতিবিস্তরেণ—

ভবদীয়—

ড. পার্থ দেব ঘোষ, এফএলএস (লন্ডন)
প্রফেসর (উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

শুক্লা পঞ্চমী, মাঘ, ১৪১৭
কল্যাণী।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়ণ

ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির বীজ যে অমৃতময় রসসরোবর থেকে সুধা সঞ্চয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তা হল এই সংস্কৃত ভাষা। এই সুধা সাগরেই সন্তরণ করেছিলেন প্রাচীন ঋষিগণ এবং কালে কালে বহু মণীষী। এই ভাষার দ্বার দিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং মননশীলতার রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশবাসীগণ। এমন এক সময় ছিল যখন সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত বাগ্ ব্যবহারের মাধ্যম ছিল। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে —'বিচার্যমানানাম্' (৮-২-৯৭) এবং 'পূর্বং তু ভাষায়াম্' (৮-২-৯৮) ইত্যাদি সূত্রদ্বয় রচনা করেছেন। 'উল্লিখিত নিদর্শনদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে সংস্কৃত ভাষা যদি প্রচলিত বাগ্ ব্যবহারের মাধ্যম অর্থাৎ সোজা ভাষায় কথ্য ভাষা না হত তবে পাণিনি ভাষা শব্দটির ব্যবহার করতেন না।' *('ভাষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা' — রত্না বসু, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭০)* পাণিনি পূর্ব যুগে এবং পাণিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক কালেও যে ভাষা সাধারণ্যে কথ্যভাষা রূপে ব্যবহৃত হত তা এই সংস্কৃত ভাষা। দেবদেবীর মধ্যে কথোপকথন এই ভাষার মাধ্যমে হত বলে তা 'দেবভাষা' নামেও সমধিক পরিচিত। ১৯৯১ সালের ভারতবর্ষের জনগণনায় দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে এখনও ৪৯,৭৩৬ জন মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারেন। যার মধ্যে ৪২,৮৩৩ জন মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং ৬,৯০৩ জন মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। এখনও পূজা পার্বণাদিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রসমূহ এই ভাষাতেই প্রযুক্ত হয়, যার কোন বিকল্প নেই। বস্তুতপক্ষে কোনো একটি জাতির বা সমাজের উন্নতির পরিচয় তাদের ভাষার মধ্যেই সম্যকভাবে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্যগণ তাদের ভাষা সংস্কৃতের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে ভারতবর্ষের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শুধু তাই নয়—'এক্ষণে পৃথিবীমণ্ডলে যত ভাষা পরিজ্ঞাত ও প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা সর্ব প্রধান। পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীমণ্ডলের যাবতীয় ভাষার তুলনা করিয়া একবাক্যে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত

ভাষা যথার্থই অপর সকল ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ। এমন কোন চিন্তা স্রোত এযাবৎ মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই, যাহা সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপে প্রকাশিত করা যায় না। সংস্কৃত ভাষার ধাতু সকল এমন ব্যাপক অর্থ যুক্ত যে, মনুষ্যজাতির কোনোপ্রকার শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাপার ইহাদের ব্যঞ্জনার বহির্ভূত নহে। কেবল সংস্কৃত ভাষা নহে, সংস্কৃত বর্ণমালা যে রূপ বৈজ্ঞানিক কৌশলে গঠিত এবং যেরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাহা আর কোনো ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না।' *('ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্ম বিদ্যা' — ১০৮ স্বামী সন্তদাস, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪৫)* এই বৈজ্ঞানিক ভাষার মাধ্যমে মানুষের মনে দিব্যভাবের জাগরণ ঘটে। এই ভাষা যে কত সরল প্রাঞ্জল তা এর বহুল প্রসার দেখে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। এই সুমধুর ভাষায় মাত্র শতবৎসর পূর্বেও পরস্পরের মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ হত। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিশ্বকবি রূপে বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিলেন তাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক যে ডি.লিট উপাধি দেওয়া হয় তা তাদের দেশের প্রাচীন ভাষা ল্যাটিনে লিখিত হয়েছিল। কবি তাঁর প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায় —'ভবন্ত উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়স্য প্রতিভূব:' ইত্যাদি ক্রমে।' *('জনশিক্ষা ও সংস্কৃত', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৯)* সংস্কৃত ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছিলেন— 'ভারতবর্ষের যে চিরকালের চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব।' *('আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৪৪-৪৫)* এই ভাষার অনুপম মাধুর্যে এবং সুধারস সিঞ্চনে মুগ্ধ হয়েছেন বহু বিদেশি প্রাজ্ঞ। সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত কাব্য ও মহাকাব্যগুলোর রসাস্বাদনের জন্য বিদেশি মণীষিগণ বহুভাষায় তাদের অনুবাদ করেন। শুধুমাত্র অনুবাদ পাঠেই তারা মুগ্ধ হয়ে যান। এই ভাষার অপূর্ব ঔদার্য যাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল তারা এর প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাদের স্বল্প কয়েকটি উক্তির উপস্থাপন এখানে করা হচ্ছে। Sir William Jones ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন—'The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammer, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all without believing to have sprung from some common source which perhaps no longer exist ...' *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)* প্রফেসর Will Durant তাঁর 'The Case of India' গ্রন্থে বলেছেন— 'India was the motherland of our race,

and Sanskrit the mother of Europe s languages; she was the mother of our philosophy; mother, through the Arabs, of much of our mathematics; mother through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity; mother, through the village community, of self-government and democracy.' *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)* শুধু তাই নয়, বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ প্রফেসর Max Muller বলেছেন— 'Sanskrit no doubt has an immense advantage overall other ancient languages of the East. It is so attractive and has been so widely admired, that it almost seems at times to excite a certain amount of feminine jealously. We are ourselves Indo-Europeans. In a certain sense we are still speaking and thinking: or more correctly Sanskrit is like a dear aunt to us she takes place of a mother who is no more.' *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)* স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন— 'Our whole culture, literature and life would remain incomplete so long as our scholars, our thinkers and our leaders and our educationists remain ignorant of sanskrit.' ***('Address of Sanskrit Viswaparisad', Beneras, 16/11/62, Dr. Rajendraprasad)*** অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং জীবন অসম্পূর্ণ হত যদি আমাদের পণ্ডিতবর্গ, চিন্তানায়কগণ নেতৃবর্গ এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ হতেন। বিখ্যাত দেশনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন—'If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly - it is the Sanskrit language and literature and all that it contains.' *('জনশিক্ষা ও সংস্কৃত', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২২)* যখন ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সর্বত্র প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক সেই সময় দূরদর্শী চিন্তানায়ক ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন যে প্রযুক্তি বিদ্যার সাথে আধ্যাত্মিক বিদ্যার সমন্বয় একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব — 'The gulf between technical and spiritual education should be bridged. sanskrit is varily that bridge' ***('The Teaching of Sanskrit', Dr. Rajendraprasad, Page - 15)*** অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাই হচ্ছে প্রযুক্তি বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার সমন্বয় সেতু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে ভাব বিনিময় সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই হত। ১৯৬০ সালে জুন মাসে লেনিনগ্রাদ নগরে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সোভিয়েত সরকার একটি মানপত্র প্রদান করে, বলাবাহুল্য যে তা সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার চর্চা এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলা

ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি প্রথম জীবনে মাতৃভাষা বাংলাকে অনাদর করে ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখা অভ্যাস করতেন তিনিও সংস্কৃত ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে 'সংস্কৃত' নামক একটি অপূর্ব চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করে এই ভাষার কাছে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বাংলা সাহিত্যের বিশ্রুত কীর্ত্তি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণ সংস্কৃত ভাষার নিকট তাদের ঋণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগতে সংস্কৃত ভাষা সমুদ্রে সঞ্চরমান নাবিকের নিকট বাতিঘরের কাজ করেছে।তাঁর দার্শনিক চিন্তার মূলে উপনিষদগুলো বীজ নিক্ষেপ করেছিল বলেই তাঁর 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে অনুপম প্রবন্ধের কুসুমরাজি বিকশিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন —'সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায় যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্য শ্রেনীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে,এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে।' *('সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ', রবীন্দ্র রচনাবলী. ৪র্থ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১২৭- ১২৮)* এই মধুময়ী ধাত্রী ভাষায় যারা কাব্য ও নাটক রচনা করে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, সুবন্ধু, বানভট্ট, দণ্ডি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের আত্মপ্রকাশের আগেই ভাস এবং অশ্বঘোষ নাট্যকার হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে Shakespeare যেমন সুবিখ্যাত তেমনই প্রাচ্যের সাহিত্যালোকে কালিদাসের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য। তিনি তিনটি মাত্র নাটক এবং কয়েকটি কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তৃত গগন পরিমণ্ডলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বিরাজ করছেন। তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।এই নাটকটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ সমাজ সংস্কৃত ভাষার অমৃত স্পর্শ লাভ করেছে। পৃথিবীর নানাদেশে বিভিন্নভাষায় নাটকটি অনূদিত এবং মঞ্চস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। এর দ্বারা নাটকটির এবং সংস্কৃত ভাষার সার্বজনীনতা প্রমানিত হয়। মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবি এক একটি মাত্র কাব্য বা মহাকাব্য রচনা করে ভারত ভূখণ্ডে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষাকে করেছেন অখিলজগৎ পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। বানভট্ট, সুবন্ধু এবং দণ্ডির মত গদ্যকাব্য প্রণেতা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাঁরা তাদের অমর লেখনী দিয়ে একথা প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃতে কেবলমাত্র

পদ্যই রচিত হয় না,মধুরকোমলকান্ত পদাবলী সমন্বিত গদ্যও রচনা করা যায় এবং তার আস্বাদ্যমানতা পদ্যের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। এই ভাষায় যে কেবল কাব্য নাটক রচিত হয়েছে তাই নয় সহজ সরল ভাষায় লিখিত 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয় আবালবৃদ্ধবনিতার নৈতিক চরিত্রের ক্রমোন্নতির সোপান স্বরূপ। এখানে বলা হয়নি এমন কোন উপদেশ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত বলে কোথাও এতটুকু দুর্বোদ্ধিতা নেই। 'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ও ভারতের আর্যধর্মের তত্ত্ব যদি কোনো একখানি গ্রন্থদ্বারা জানিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে একমাত্র 'মনুসংহিতা'র নামই উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসীর ইহাই গর্ব এবং গৌরবের বিষয় যে সমুদ্রপরিখা বেষ্টিত পর্বতমালা দ্বারা সুরক্ষিত এই ত্রিকোণ ভূখণ্ডটুকু আয়তনে বহু দেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অধিবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জ্ঞান অন্য কোনো দেশ হইতে ঋণ করিয়া আনিতে হয় নাই।' *('অর্থশাস্ত্র মনুসংহিতা সমীক্ষা', সীতারাম দাস, ওঙ্কারনাথ)* এই প্রসঙ্গে মনুকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন —

'এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।'

('মনুসংহিতা', ২য় অধ্যায়, ২০ শ্লোক)

তাছাড়া আছে 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' যা অতি সহজ ভাষায় লিখিত এবং রাজধর্মের দিশারী। বস্তুত কবি বা নাট্যকারগণ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল দুই কাব্যহর্ম্য 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'কে সম্মুখে রেখে স্বীয় কল্পনালোকে নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টিকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছেন। শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই নয় তার সন্তানস্বরূপা বাংলা ভাষাতেও যারা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাদের সেই সাহিত্যকর্মের পিছনে রামায়ণ-মহাভারতের অবদান খুব কম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা', নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' ও 'প্রভাস', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রভৃতি সাহিত্য স্রোতস্বতীর উৎসমুখ অনুসন্ধান করলে যাদের পাওয়া যাবে তারা হল রামায়ণ মহাভারত। উপরন্তু —'আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবন সংস্কৃত।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৬৪৭)* শুধু যে বাঙালী বা ভারতবাসী এই অমৃতের সন্ধান পেয়েছিল তা নয়, সংস্কৃত

ভাষায় বিরচিত কাব্য নাটকগুলোর রসাস্বাদনের পর বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্ বিদেশী মনীষী স্যার হোরেস্ হেমান্ উইলসন্ সংস্কৃত ভাষার যে প্রশস্তি রচনা করেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

'অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোধিকম্ ।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে।।
ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।।'

('জনশিক্ষা ও সংস্কৃত', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫)

অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই ভাষার সাথে যে কেবল বাংলা ভাষার সংযোগ আছে তা নয়। 'প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সামর্থ্য বিধানে, ভারতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্য রক্ষণে,মানসিক ও আত্মিক উন্নতি সাধনে, এক কথায় সকল ভারতবিদ্যা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃত একান্ত অপরিহার্য। —সংস্কৃত ব্যতীত ভারত সংস্কৃতি রক্ষার উপায় নাই।' *('সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন', ড. রামজীবন আচার্য, যুগান্তর - ১১.৪ ৮৪)*

মহাভারতের প্রশস্তি

এই অমৃতময়ী সুধারসসঞ্চারিণী ধাত্রীভাষা সংস্কৃতে বিরচিত হয়েছে সনাতন ধর্মের মর্মগ্রন্থ চিরন্তন মহাকাব্য 'মহাভারত' যার আবেদন বহু সহস্র বছর পরেও লক্ষ লক্ষ জনমানসে গভীর ছায়াপাত করে। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের শাশ্বত সংস্কৃতির বাঙ্ময় বিগ্রহ এই মহাভারত।এর সুবিশাল আকৃতি এবং অপরিমেয় জ্ঞানের জন্য 'মহাভারত' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কথিত আছে যে দেবগণ এর ভার পরিমাপের জন্য তুলাদণ্ডের এক পাশে সমগ্র বেদ-পুরাণ-উপনিষদ এবং অপরদিকে মহাভারত রেখে দেখলেন যে মহাভারতের ভারই বেশী। 'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।' *('মহাভারত', উদ্যোগপর্ব)* বিশাল আয়তন বিশিস্ট এই মহাগ্রন্থে যা আছে তার সন্ধান অন্যত্র পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মহাভারতে যা নেই তার সন্ধান কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই বলা হয়েছে— 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।' *('মহাভারত', আদিপর্ব, ২য় অধ্যায়, ৩৭০ শ্লোক)* এই মহাগ্রন্থের ভাষা এতই সাবলীল যে তা পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। মহাভারতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করে কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন —'রামায়ণ

মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। —স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' *('প্রাচীন সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৬০)* ভারতীয় জ্ঞান ও মনীষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর 'ভারতকথা' গ্রন্থের প্রারম্ভেলিখেছেন— 'জীবনে যাহা কিছু করিয়াছি সেই সকলের কথা স্মরণ করিয়া দেখিলে এই কথাই মনে হয় যে, আমার জীবনে সব চাইতে বড় কাজ হইয়াছে তামিল জাতির জন্য গল্পাকারে মহাভারত লেখা! আমি বিশ্বাস করি এই সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারত পাঠ করিলে পাঠক পূর্বাপেক্ষা ভাল দার্শনিক হইবেন,এবং যদি তিনি হিন্দু হন তাহা হইলে পূর্বাপেক্ষা ভাল হিন্দু হইবেন।' *('ভারত কথা', ভূমিকা, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী)* উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীত হয় যে মহাভারতের অনুবাদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণগুলো যখন এতখানি গুরুত্ব বিদ্বৎ সমাজে লাভ করেছিল তখন সমগ্র মহাভারত মানব সমাজে কি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী তথাগতানন্দ তাঁর 'মহাভারত কথা' গ্রন্থে বলেছেন— মহাভারত মানব চরিত্রের বিচিত্র কর্মশালা, মহাভারতের চরিত্রাবলীর পাঠে. তাঁদের জীবনের সমালোচনায় আমরা যেন মনে রাখি কুরুযুদ্ধ ঘটে এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে' অতএব যে সমাজচিত্র, আচার-ব্যবহার আমরা পাই মহাভারতে তা বহু প্রাচীন। কাজেই বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হব।' সুতরাং মহাভারতকে বিচার করতে হবে তার কালের প্রেক্ষিতে। সে সমাজের অনেক কিছুকেই হয়ত বর্তমানের সভ্য সমাজ কদর্য বর্বরতায় ভরা বলে মনে করে তেমনই বর্তমানের অনেক কিছুই সেই কালের দৃষ্টিতে দেখতে অমানবিক অসুন্দর বলে সন্দেহ হবে। 'হরিবংশে' মহাভারতের যে বিপুল মহিমা কীর্তিত হয়েছে তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। —

'ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ।।
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধা কথাঃ।
ভারতং সেব্যতে দেবৈর্ভারতং পরমং পদম্।।
ভারতং সর্ব শাস্ত্রানামুত্তমং ভরতর্ষভ।
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে।।
মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সরস্বতীম্।
ব্রাহ্মণান্ কেশবঞ্চৈব কীর্তয়ান্নাবসীদতি।।

বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদারন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ ।
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পদমিহেচ্ছতা ।।
এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ধর্ম নিদর্শনম্।
এতৎ সর্বগুনোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।।'

বেদ হিন্দুদের পরম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু এর গভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলো সাধারণ মানুষের বোধের অতীত ছিল। সেই কারণে সকলের বেদপাঠে অধিকার জন্মাত না। নিজেদের তপস্যা ও ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হতেন সেই ব্রাহ্মণকুলই কেবল বেদপাঠের অধিকারী হতেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে ছিল আপামর জনসাধারণের সমান অধিকার। কারণ এই মহাগ্রন্থে গভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলো এমন সহজ সরল গল্পের ছলে ব্যক্ত হয়েছে যে তা জনমানসে 'পঞ্চমবেদ' রূপে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। পঞ্চমবেদরূপ এই মহাগ্রন্থের ভিত্তি সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে—'মহাভারতের অনেক কিছুই আমার কাছে সত্য, তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এমনকি প্রাকৃতিক কোন প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোন প্রমাণ আমি তলব করতে চাইনে, তাকে সত্য বলে অনুভব করেছি এই যথেষ্ঠ।' *('দীপিকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৪৫৭)* কবি যাকে সত্য বলে তাঁর জ্ঞানালোকে প্রতিফলিত দেখেছেন তার সত্যতা বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্বসভায় পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে —'বাস্তবিক এই রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানব জাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।' *('বিবেকানন্দ রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, 'মহাভারত' প্রবন্ধ, পৃ. ২৭৬)* প্রাচীন আর্যগণের বীর্যগাথা এবং ভারতীয় সভ্যতার বীজগুলোকে মহাভারতরূপ একটি সূত্র দিয়ে মহামতি ব্যাসদেব এমনভাবে গ্রথিত করেছেন যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মহাভারতে বর্ণিত রাজগণের বীর্যগাথা এবং জীবনালেখ্য চিরকালীন ইতিহাসরূপে বিদ্যমান। 'রামায়ণ মহাভারত শুধু মহাকাব্য নহে, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে কারণ সেইরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালীন ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত

হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' (*'রবীন্দ্র রচনাবলী', প্রাচীন সাহিত্য, ১৩শ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৬২*) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সুবিশাল মহাকাব্যের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি বেদব্যাস। 'স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া একবার বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন—ভগবন্ আমি তোমার জন্য 'মহাভারত' নামক পরম পবিত্র পুরাতন ইতিহাস সম্যকরূপে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি —প্রকল্পিতং ময়া সম্যক্ তব শ্লোকয় তন্মুনে , তুমি তাহা শ্লোকবন্ধ কর। তখন বাল্মীকি বলিলেন —কৃতং রামায়নং ব্রহ্মন্ ব্যক্তং মোক্ষস্য সাধনম্,' আমি রামায়ন রচনা করিয়াছি, তাহা স্পষ্টভাবেই মোক্ষের সাধন। আর রামায়ন রচনা করিয়া আমি ক্ষোভ মোহ বিবর্জিত হইয়াছি। —

কিমর্থমপরং ব্রহ্মণ্ করিষ্যামি বৃথোদ্যমম্।
অহং রামায়নং কৃত্বা কৃতার্থোহভবমীশ্বরম্।।

হে ঈশ্বর ! আমি রামায়ণ রচনা কবিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি, দ্বাপরে ব্যাস জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাকে আমি কাব্যবীজ বলিয়া দিব। তিনি আপনার বাসনা পূর্ণ করিবেন।' (*'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', রামদয়াল মজুমদার, প্রথম ষট্‌ক, পৃ. ১*)

ব্যাসদেবের গাত্রবর্ণ কালো থাকায় তিনি 'কৃষ্ণ'এবং দ্বীপে ভূমিষ্ট হবার জন্য তিনি 'দ্বৈপায়ন' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। মহাভারতরূপ মহাগ্রন্থে অনেক জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এবং অনেক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে যা জাগতিক সুখ ভোগে নিরত মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হত না যদি এই কৃষ্ণ ঋষি তা আমাদের কাছে প্রকাশ না করতেন। কৃষ্ণ কর্তৃবাচ্যে,অর্থাৎ যা আকর্ষণ করে। 'কৃষ্ণ' শব্দের এই প্রত্যয়গত অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হয় যে মহাভারত নামক মহাগ্রন্থকে যিনি আবেগময় পদলালিত্যপূর্ণ ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন বা তাদের আকৃষ্ট করেছেন তিনি এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সাংখ্য দর্শন মুনিদের অধিকারে এবং বেদান্তদর্শন ঋষিদের অধিকারে। ব্যাসদেবের মহাকাব্যে সাংখ্য ও বেদান্তের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হওয়ায় তিনি মুনি এবং ঋষি উভয়পদবাচ্য। তাঁর রচনা তাই মৌনেয় এবং আর্ষেয় উভয়ই। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য কেবলমাত্র ব্রহ্মার সাথে তুলনা করার যোগ্য। তাই বিশ্বকবি রচনা করেছেন, ব্যাসদেবের মহাকাব্য রচনার সাথে ব্রহ্মার মহাসৃষ্টির তুলনা করে এই কবিতা—

'জগতের মহা বেদব্যাস
গঠিলা নিখিল উপন্যাস

বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।'

('সঞ্চয়িতা', কবিতা 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩৪)

মহাকবি ব্যাসদেব তিন বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একলক্ষ শ্লোকে এই মহাভারত নামক সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাশক্তির অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে বঙ্গজ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মহাভারত' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় লিখেছেন—

'কল্পনা বাহনে সুখে করি আরোহণ
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে
করে বীণা ,গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতীসুত কবি — ঋষিকুল ধন।'

('মধুসূদন রচনাবলী', মহাভারত সনেট, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১১৬)

মহাভারতের বিষয়সংক্ষেপ

মহামতি ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন তার বদরিকাশ্রমে। তাঁর লেখকরূপে কলম ধরেছিলেন স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ। লেখা সম্পূর্ণ হলেই প্রশ্ন দেখা দিল যে এই বিরাট মহাভারত কিভাবে জগতে প্রচারিত হবে। একথা চিন্তা করে ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে পাঁচজনকে মহাভারত পড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন বৈয়াসকী শুকদেব, শিষ্য পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন এই মহাভারত প্রথম পাঠ করা হয় তক্ষশীলায় (পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি) জনমেজয়ের সর্পসত্রে গ্রন্থকার ব্যাসদেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ জনমেজয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং ব্যাসদেবের আদেশে বৈশম্পায়ন সমবেত সুধিবৃন্দকে প্রথম মহাভারতের কাহিনি শোনান। দ্বিতীয়বার নৈমিষারণ্যে শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারত আবৃত্তি করেন। ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতের বিষয়বস্তুর একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যার দ্বারা মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর এবং মুখ্য চরিত্রগুলো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। মহাভারত এবং তদন্তর্গত গীতাগ্রন্থ পাঠ করতে হলে এর পটভূমিকা এবং দেবগণের মাহাত্ম্য সবিশেষ জানা প্রয়োজন কারণ—

'অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দ দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ।'

('ঋক সংহিতা ভাষ্যম'; শ্রৌতপাঠ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬)

বেদ অধ্যয়নের সময় যেমন প্রত্যেক মন্ত্রেরঋষি ছন্দ দেবতা প্রভৃতির বিষয় না জেনে নিলে পাপ স্পর্শ করে তেমনই পঞ্চমবেদরূপ মহাভারত অধ্যয়নে নিরত হবার আগেই উপরিউক্ত পাপ যাতে স্পর্শ না করে সেজন্য এগুলো জানা প্রয়োজন।

মহাভারতের বিষয়সংক্ষেপ

রাজা দুষ্যন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজচক্রবর্তী রাজা ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। এই রাজা ভরতের নামানুসারে এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। ভরতের প্রপৌত্র ছিলেন হস্তী। তার নামানুসারে তাদের রাজধানীর নাম হয়েছিল হস্তিনাপুর। হস্তীর পৌত্র রাজা সংবরণ সূর্যতনয়া তপতীকে বিয়ে করলে তাঁর গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়। বলাবাহুল্য যে কুরুক্ষেত্রের সাথে তার অক্ষয় কীর্ত্তি বিজরিত হয়ে আছে। এই কুরুর পঞ্চম পুরুষ পরে রাজা শান্তনু স্বর্গের দেবী সুরধুনী জাহ্নবীকে বিয়ে করেন। তাদেরই অষ্টম সন্তান প্রিয়ব্রত যিনি উত্তরকালে 'ভীষ্ম 'নামে মহীতলে স্বীয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন। জাহ্নবী স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনের পর অন্তর্হিতা হলে রাজা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী এক লাবন্যময়ীকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গাদের জন্ম হয়। তারা উভয়েই অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর পরাশর মুনির ঔরসে মৎসগন্ধার গর্ভজাত সন্তান মহাত্মা দ্বৈপায়ন জননীর অনুরোধ পরতন্ত্র হয়ে বিচিত্রবীর্যের অম্বিকা নাম্নী মহিষীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকা নাম্নী মহিষীর গর্ভে পান্ডু এবং অন্য এক দাসীর গর্ভে বিদুর নামক সন্তানত্রয় সৃজন করেছিলেন।

এখানে ব্যাসদেবের বিষয়ে কিছু অলোচনার অবকাশ আছে। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাসদেবের উপরিবর্ণিত কার্য গর্হিত মনে হতে পারে। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর,সেই কারণে তার লেখনী নিসৃত বাক্যরসধারা ভগবানের বানীরূপে পূজিত হয়। 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণে' বশিষ্ট রামচন্দ্রকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছেন যে এই ব্যাসদেব জীবন্মুক্ত কেবল দেহবানের মত দেখাচ্ছেন। অন্তরে ইনি দেহাভিমানশূন্য। তিনি সূর্যরূপে উত্তাপ দিচ্ছেন, বিষ্ণুরূপে জগত্রয় রক্ষা করছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালস্থিত দৃশ্য মাত্রই তিনি। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় ব্যাসদেবের মহিমা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

'জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর
আমি মাত্র তবালোকে দীপ্ত শশধর।'

('নবীনচন্দ্র রচনাবলী', কুরুক্ষেত্র, ৪র্থ খণ্ড, দত্ত চৌধুরী এন্ড সন্স প্রকাশিত, পৃ. ২০)

সুতরাং এরূপ যাঁর প্রকৃতি, যাঁর অনন্ত প্রতিভা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময় উৎপাদন

করে তার পক্ষে কোন কাজই গর্হিত হতে পারে না।

ব্যাসদেবের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তাই তিনি সিংহাসনের অধিকার লাভ করেননি। অনুজ পাণ্ডু তাই সিংহাসনে আরোহন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র এবং পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষান্তে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ তনয় যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে হয় গৃহবিবাদের সূত্রপাত। দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহাত্মা বিদুরের কৃপায় পাণ্ডবেরা রক্ষা পান। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বনে পরিভ্রমণ করতে করতে তারা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার কথা জানতে পেরে সেখানে উপস্থিত হন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতা কুন্তীর আদেশক্রমে পাঁচ ভাই একই পত্নীর স্বামীত্ব লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে বলেছেন — 'ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটি পরবর্তী আভাষ মাত্র।' *('বিবেকানন্দ রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩)* এরপর ধৃতরাষ্ট্র এবং তার পুত্র ক্রোধান্ধ মহাতেজা দুর্যোধন পাণ্ডবদের সাথে সন্ধি করে অর্ধরাজ্য তাদের প্রদান করেন। যুধিষ্ঠির সেখানে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নামক মনোরম নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে রাজসূয় যজ্ঞ করে সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাভূত করে মর্ত্তেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেন। তার সহায় ছিলেন তার চার ভাই এবং শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্যোধনের ঈর্ষ্যাপ্রদীপ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। তিনি পাণ্ডবদের প্রতি অমর্ষ প্রযুক্ত হয়ে কুটিলমতি মাতুল শকুনির পরামর্শে কোন এক অশুভক্ষণে পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন। ক্রীড়াযুদ্ধে আহূত হয়ে পশ্চাদপসারণ করা অক্ষত্রিয়োচিত বিবেচনা করে যুধিষ্ঠির শকুনির সাথে পাশা খেলতে আরম্ভ করেন। শকুনি ও তার অনুচরবর্গ কপট পাশার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বারংবার পরাজিত করে শর্তানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য, রাজধানী,ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদীসহ সবকিছুই অধিকার করে নিল। দয়াপরবশ স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ফিরিয়ে দিতে চাইলে দুর্যোধন অন্তিম খেলার জন্য প্রার্থনান্তে পিতার অনুমতি লাভ করলেন। ঠিক হল পরাজিত পক্ষ দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকবেন এবং এই অজ্ঞাতবাসকালে যদি বিজয়ীপক্ষ পরাজিতদের সন্ধান পায় তবে পুনরায় বনবাসে থাকতে হবে। যুধিষ্ঠিরের বিধি বিমুখ, তিনি পরাজিত হয়ে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ বন'।মন করলেন। দুর্যোধন হলেন আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত।

এই দ্বাদশ বৎসর পাণ্ডবেরা অশেষ দুঃখ সহ্য করলেন। জীবনের অনেক বন্ধুর

পথ অতিক্রম করে ত্রয়োদশবর্ষে উপনীত হলেন। অজ্ঞাতবাসবর্ষ পঞ্চ পাণ্ডব যথাক্রমে কঙ্ক, বল্লভ, বৃহন্নলা, গ্রন্থিক, তন্ত্রিপাল এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধরে বিরাট রাজ্যের রাজধানীতে অতিক্রম করলেন। দুর্যোধন শত চেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পাণ্ডবদিগের কোনো রকম সন্ধান পেলেন না। অজ্ঞাতবাসের পর আত্মপ্রকাশ পূর্বক যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের নিকট ধর্মত অর্ধরাজ্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কুটিল দুর্যোধন অর্ধরাজ্য দূরের কথা পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত প্রদান করতে স্বীকৃত হল না। তিনি স্পর্ধা দেখিয়ে ঘোষণা করলেন —

> 'তিলার্দ্ধং যবষড় ভাগং সূচাগ্রে বিদ্যতে মহী।
> বিনাযুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।'

('মহাভারত', বিরাটপর্ব)

ধৃতরাষ্ট্র সন্ধির চেষ্টা করলেও তিনি পুত্রস্নেহ পাশে বদ্ধ থাকায় অন্তিমে দুর্যোধনের ইচ্ছাই বলবতী হল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি কৌরব সভার পলিতকেশ বৃদ্ধগণই শান্তির পক্ষে দুর্যোধনকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। পাণ্ডবগণের একান্ত সুহৃদ ভগবান কৃষ্ণ জ্ঞাতিবিরোধ নিবারণের জন্য শান্তির দূত রূপে কৌরব সভায় এসে দুর্যোধন কর্তৃক অপমানিত এবং প্রত্যাখ্যাত হন। শুরু হল অস্ত্র সজ্জা, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ কেউ পাণ্ডবপক্ষ কেউ বা কৌরব পক্ষ অবলম্বন করলেন। বিশ্বকবির ভাষায় সেই ভয়াবহ যুদ্ধ বৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণিত হয়েছে —

> 'দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
> ভারতের যত ক্ষত্র শোনিত
> ত্রাসিত ধরনী করিল ধ্বনিত
> প্রলয় বন্যা গানে।'

('সঞ্চয়িতা', কবিতা 'পুরস্কার', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭৯)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অসম্মত হল। তবে তিনি অর্জুনের কপিধ্বজ রথের সারথ্য স্বীকার করলেন। কারণ পাণ্ডব ন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ। পক্ষান্তরে দুর্যোধনকে একেবারে বঞ্চিত না করে আপন দুর্জয় নারায়ণী সেনা তাকে দেন। বলাবাহুল্য যে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁর নারায়ণী সেনাকেই প্রবলতর মনে করেছিলেন। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ সেনাপতিগণ সমেত একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা এবং পাণ্ডবপক্ষে সপ্তঅক্ষৌহিনী সেনা সাকুল্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আঠারো দিন ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপ্ত হন। যুদ্ধে

পাণ্ডবগণ বিজয় লাভ করে। কিন্তু কবির কথায়—

'সমর বন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান।'

('সঞ্চয়িতা', কবিতা 'পুরস্কার', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৮০)

যুদ্ধ অবসানের পর ধৃতরাষ্ট্র ৫০ বছর ধরে যুধিষ্ঠিরদের দ্বারা পূজিত হয়ে সসম্মানে অবস্থান করেন। পরে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার প্রদান করে স্বীয় মহিষী গান্ধারী এবং পাণ্ডব জননী কুন্তীকে নিয়ে বনগমন করেন। ইতিমধ্যে ৩৬ বছর অতিবাহিত হলে একদিন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পাণ্ডবদের কাছে পৌঁছল, এই দুঃসংবাদ শুনে ব্যকুলিত পাণ্ডবগণ দ্বারকায় উপস্থিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিরহে নিজেদের আর ইহলোকে থাকার প্রয়োজন মনে করলেন না। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে মহাপ্রস্থানের জন্য হিমালয়াভিমুখে সকলে গমন করলেন। পথিমধ্যে যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই একে একে পতিত হলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুরাগ দেখে মোহিত হয়ে দেবগণ সকল ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সমেত যুধিষ্ঠিরকে অক্ষয় স্বর্গবাসে নিয়োজিত করলেন। এই খানেই মহাভারত সমাপ্ত। অতি সংক্ষেপে বিশাল ভারত বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল। কেবল এই বৃত্তান্তের কেন্দ্রস্থিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয় কিছু উপস্থাপন করা হয়নি কারণ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাই আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে।

বেদে যে সমস্ত তত্ত্ব বিবৃত করা হয়েছে, যাগযজ্ঞের যে সমস্ত সাধন প্রণালি বর্ণিত হয়েছে তার সকল কিছুর সারসংকলন মহাভারতে কাব্যকারে পরিস্ফূট হয়েছে। বেদাদি গ্রন্থপাঠে ব্রাহ্মণেতরের অধিকার নেই কিন্তু মহাভারত সর্বজন সুখ পাঠ্য গ্রন্থ। এর মধ্যে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, অর্থনীতি কখনো ব্যাসদেব কখনো শ্রীকৃষ্ণ কখনো বা পিতামহ ভীষ্মদেবের কণ্ঠে এত সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে যা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মহাভারতের অপর নাম 'জয়কাব্য' কারণ 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই বাণী মহাভারতের সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। অধর্মের বশীভূত দুর্যোধনের প্রার্থনায় বিদুষী গান্ধারী পুত্রকে এই আশীর্ব্বাদ করেছেন। আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য তা হলো—

সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।

মহামতি ব্যাসদেবের সমস্ত রচনার মধ্যে মূল বক্তব্য দু'টি, তা হলো পরোপকারে পুণ্য লাভ এবং পরপীড়নেই পাপ। আবার সত্যের প্রশংসায় মহাভারত পঞ্চমুখ। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তাই বলেছেন—'নাস্তি সত্যসমং তপ' (১২/২৩৯/৬),

'যতো ধর্মস্ততঃ সত্যং সর্বং সত্যেন বর্ধতে' (১২/১৯৯/৭০), 'সত্যেন বিধৃতং সর্বং সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্' (১২/২৫৪/১০)' কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালান্তর' কাব্যগ্রন্থের 'আরোগ্য' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'এতে (মহাভারতে) দেখা যায়, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন— এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ। এই নির্দেশ সকলকালে সকল মানবের প্রতি। যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করতে হবে। যে ভোগে সর্ব মানবের ভোজের আহ্বান আছে সভ্যতার স্বরূপ আছে তার মধ্যে।' সেই কারণেই এটা বেদবহির্ভূত হয়েও পঞ্চমবেদরূপে আসমুদ্রহিমাচল আপামর জনসাধারণের নিকট পূজিত হচ্ছে।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচনাকাল নির্ণয়

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারা আবহমান কাল হতে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বভূমিকে প্লাবিত করে আসছে তার মধ্যে মহাভারত কোন সময়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল তার সঠিক মূল্যায়ণ করা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রাচীন ভাষ্যকাররা এবং মহাভারতকার স্বয়ং 'মহাভারতের' ন্যায় ধর্মশাস্ত্রের বহিরঙ্গ আলোচনায় বিমুখ ছিলেন। তাঁরা নিমজ্জিত হয়েছিলেন এই সুধাসরোবরের গভীরে এবং আহরণ করে এনেছিলেন অমৃতকলস। নিহিতার্থের পুনঃপুনঃ অনুধাবন করতে গিয়ে কেউ মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ করেননি। সেই কারণে এই বিষয়ের আলোচনা পারস্পরিক বিষয় অনুধাবনের উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করে করতে হয়। আর একটি বিষয় অবশ্য মনে রাখা দরকার যে শ্রীমদ্ভগবদগীতা মহাভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁর রচনাকালই মহাভারতের রচনাকাল এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাস বিরচিত ১৩খানি নাটকের পাণ্ডুলিপি বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে ত্রিবান্দ্রম শহরে আবিষ্কার করেছেন। ভাস তাঁর নাটকগুলোর বিষয়বস্তু অধিকাংশ মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন। অনেকে মনে করেন মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ... 'সমুদ্যতোহয়ং ভারো মে সুমহান সাগরোপমঃ' এই পঙক্তির 'ভার' কথাটি কবিকে 'কর্ণভার' নামক নাটক প্রণয়নে প্রেরণা দিয়েছিল। ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী তা নির্বিবাদ। ভাসের নাটকের একটি শ্লোক চাণক্য তাঁহার 'অর্থশাস্ত্রে' উদ্ধৃত করেছেন বলে গণপতি শাস্ত্রী 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামক নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং চাণক্য ভাসের

পরবর্তী। ভাসের সময় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে তা সুনিশ্চিত।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২.২.২৬) এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৩.৪.৪) মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণুর সহস্র নাগের উল্লেখ পাওয়া যায় (১.২২.৮)। বৌধায়ন খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে বুহ্লার সাহেব সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কালিদাস পূর্বযুগের বিখ্যাত নাট্যকার অশ্বঘোষ তাঁর 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সৌন্দরানন্দম্' নামক সংস্কৃত মহাকাব্যে মহাভারতের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। 'সৌন্দরানন্দম্' মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে স্ত্রী বিরহ কাতর নন্দ বলেছেন —

'পরাশরঃ শাপশরস্তথর্ষিঃ কালীং সিষেবে ঋষগর্ভযোনিম্।
সুতোহস্য যস্যাং সুষুবে মহাতপা দ্বৈপায়নো বেদবিভাগকর্তা।'

('সৌন্দরানন্দম্', অশ্বঘোষ, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৯ম খণ্ড, শ্লোক - ২১, পৃ. ১৩১)

এর থেকে মহাকাব্য প্রণেতা অশ্বঘোষ যে মহাভারত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন তা সূচিত হয়। উপরন্তু 'বজ্রসু চিকোপনিষদ' নামক যে গ্রন্থ তাঁর ব্যাখ্যাত তাতে 'হরিবংশের' স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং মহাভারতের শান্তি পর্বের ২৬১তম অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শকাব্দের আরম্ভের পূর্বেই মহাভারত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাভারতে মেষ, বৃষ রাশিগুলোর কোনো উল্লেখ নেই। গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আসার পর এই রাশিগুলো ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বেই মহাভারত বর্তমান কলেবরেই বিদ্যমান ছিল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাঁর 'গীতারহস্য'র ৪৮০ পৃষ্ঠায় এটা প্রতিপাদন করেছেন যে মহাভারত শকাব্দের আরম্ভের ৫০০ বৎসর পূর্বেই উদ্ভূত হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ সালে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় যে মেগাস্থিনিস নামক গ্রীকদূত এসেছিলেন। তিনি মহাভারতের বিষয়ে অনেক কিছুই অবগত ছিলেন। এ সময়ে কেবল মহাভারত নয় শ্রীকৃষ্ণের পূজাও লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। অতএব মহাভারত শকাব্দের ৫০০ বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

'আমাদের প্রাচীন আর্য ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চাশ শতাব্দী পূর্বে কালপ্রেরিত হইয়া ভারতভূমির রাজন্যবর্গ, স্বীয় স্বীয় বীরবাহিনী সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত পূর্বক নিধন প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গ্রহাচার্যেরা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং নববর্ষারম্ভ সময়ে

বৎসরের ফলাফল গ্রামবাসী সকলে গ্রহাচার্যের নিকটে শ্রবণ করেন। এই পদ্ধতি প্রাচীন কাল হইতে এই দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যুধিষ্ঠির হইতে গণনা করিয়া পঞ্জিকাগুলিতে বৎসর বৎসর কলিকালের আয়ু সংখ্যায় এক এক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরাব্দের স্থিতি পরিমাণ বিষয়ে বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা অল্প। এতদ্দেশীয় পঞ্জিকানুসারে এক্ষণে ইহার ৫০১১ বৎসর চলিতেছে। দুর্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপরাপর অসুরেরাও কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভুত হইয়াছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্র বিচারে জানা যায় যে, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কিছু পূর্ব হইতেই কলিকাল প্রাদুর্ভাব হয়। 'রাজতরঙ্গিনী'তে উল্লেখ আছে যে, কলির ৬৫৩ অব্দে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বছর হইল হইয়াছে।' *('ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', স্বামী সন্তদাস, পৃ. ৪৩)* পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এবং সময়ান্তরে প্রদর্শিত হবে যে গীতা মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং গীতা কোন্ সময়ে রচিত সেই বিষয়ে নিশ্চয় করতে পারলে মহাভারতের সময়সীমাও নির্ধারণ করা সহজ সাধ্য হবে। সেই অভিপ্রায়ে গীতার উপর নির্ভর করে মহাভারতের সময় নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে একটি শ্লোক রচনা করেছেন যার সাথে গীতার একটি শ্লোকেরও অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কালিদাস রচনা করেন -

'অনব্যাপ্তন্নবাপ্তব্যং নতে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানু গ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্মনোঃ ।'

('রঘুবংশম', কালিদাস, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১০ম খণ্ড, শ্লোক - ৩১, পৃ. ৩৫৩)

গীতায় ভগবান বলিলেন —

'নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মনি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক)

এই শ্লোকদু'টির অদ্ভুত সাদৃশ্য এটাই প্রমাণ করে যে কালিদাস গীতার বিষয়ে অবগত ছিলেন।

কালিদাস পূর্ববর্তী যুগে ভাস একটি উজ্জ্বল নাম। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কালিদাসের পরেই। তাঁহার 'কর্ণভার' নাটকের— 'হতোহপি লভতে স্বর্গং জিত্বাতু লভতে যশঃ' *('কর্ণভার' ভাস, ১২ শ্লোক, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১২ খণ্ড, পৃ. ১৫)* এই

শ্লোকাংশের সাথে গীতার 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক)* এই শ্লোকাংশের অপূর্ব সাদৃশ্য এটাই প্রমাণিত করে যে ভাসের পূর্বেও গীতার অস্তিত্ব ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঠিক সময়ের বিষয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেন যে— 'অপ্রচলিত শব্দ সংগঠন এবং আভ্যন্তরীণ উল্লেখসমূহ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এর রচনা নিশ্চিত খ্রীষ্টপূর্ব যুগের। মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা বলা যায়।' *('ভারতীয় দর্শন', ড. রাধাকৃষ্ণণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২)*

সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্য কাব্যকারগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বাণভট্ট। যিনি ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধন বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি তার 'কাদম্বরী' নামক গদ্য কাব্যে একটি শ্লেষময় বাক্যে মহাভারত ও গীতার উল্লেখ করেছেন। বাক্যটি এইরূপ — 'মহাভারতমিবাস্তগীতকর্ননানন্দিততরং' *('কাদম্বরী', বাণভট্ট, অনুবাদক : শ্রীহরি চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩১০-৩১১)*

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের নামের সাথে 'যোগ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— কর্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি। গীতার 'যোগ' শব্দ এবং পাতঞ্জলভাষ্যে'র যোগ শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দের অর্থ করেছেন 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ'। কিন্তু গীতার 'যোগ' শব্দ 'যোগঃ কমর্যু কৌশলম্' এই ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। গীতা 'পাতঞ্জল সূত্র' অপেক্ষা প্রাচীনতর। পতঞ্জলি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার। পাণিনির সময় খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৫০০ বৎসরের মধ্যে। সুতরাং গীতা তার চেয়ে প্রাচীন।

সুপ্রাচীন গ্রন্থকারগণ গীতা থেকে বহু শ্লোক সংগ্রহ করেছেন। কবি মাত্রই এক অর্থে চোর হয়ে থাকেন। কালিদাস বলেন— 'নাস্তি অচৌর কবিজনঃ'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — 'সাহিত্য রাজ্যে চুরি বিদ্যা বড়োবিদ্যা — এমনকি ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করে এসেছেন, এমন কি সেক্সপিয়রও বাদ যান না।' *('গল্পগুচ্ছ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৩৭০)* গীতা থেকে কে কোথায় কি উদ্ধৃত করেছেন তা ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে তাঁর 'বৈদিক ম্যাগাজিন' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বলে লোকমান্য তিলক তার 'গীতারহস্যে' উল্লেখ করেছেন। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে — 'তদাহ ভগবান্' বলে গীতার নবম অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। যথা — 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।' *('বৌধায়ন', গৃহ্যসূত্র - ২.২২.৯)*

এছাড়াও বৌধায়নকৃত পিতৃমেধ সূত্রের তৃতীয় প্রশ্নের প্রারম্ভেই নিম্নোক্ত বাক্যটি দেখা যায় — 'জাতস্য বৈ মানুষস্য ধ্রুবং মরণমিতি বিজানীয়াত্তস্মাজ্জাতে ন প্রহৃষ্যেন্মৃতে চ ন বিষীদেত।' (*'বৌধায়ন', পিতৃমেধ সূত্র*) এটা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭ ক্রমাঙ্কের সেই অবিস্মরণীয় মহাবাক্যটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়--

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি'।।

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

শকারম্ভের চারশত বছর আগে বৌধায়নের সময় তা মহামনীষী বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'গীতারহস্যে' সিদ্ধান্ত করেছেন। অতএব এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মহাভারত এবং গীতা তার পূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কেবলমাত্র বৈদিক গ্রন্থসমূহ থেকেই যে গীতার প্রাচীনতা সিদ্ধ করা যায় তা নয়। বৈদিক গ্রন্থাদি এবং বৌদ্ধধর্ম থেকেও গীতা বহু প্রাচীন এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহাযানপন্থী কবি অশ্বঘোষ তাঁর 'সৌন্দরানন্দম্' কাব্যের অষ্টাদশ সর্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি রচনা করেছেন --

'অবাপ্তকার্যোহসি পরাং গতিং গতো ন তেঽস্তি কিঞ্চিৎ করনীয়মণ্বপি'

('সৌন্দরানন্দম্', অশ্বঘোষ, ৫৪ শ্লোক, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪)

এই শ্লোকাংশের সাথে গীতার— 'তস্যকার্যং ন বিদ্যতে' ইত্যাদি বাক্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার সৌন্দরানন্দমের— 'বিহায় তস্মাদিহ কার্যমাত্মনঃ কুরু স্থিরাত্মন্ পরকার্যমপ্যথো' (*'সৌন্দরানন্দম্', অশ্বঘোষ, ৫৭ শ্লোক, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৯ম খণ্ড, পৃ ১৮৪*) ইত্যাদি শ্লোকাংশ গীতার অনাসক্ত পরোপকারী কর্মী হবার এই উপদেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়— 'তস্মাদসক্ত সততং কার্যাং কর্ম সমাচর।' (*'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ১৯ শ্লোক*) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধাবান ভক্তকে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পাত্র মনে করেছিলেন। 'সৌন্দরানন্দমে'ও দেখা যায়— 'নত্যো হি ভক্তশ্চ নিয়োগমর্হসি।' (*'সৌন্দরানন্দম্', অশ্বঘোষ, ১৮ সর্গ, ৫৩ শ্লোক*) বালগঙ্গাধর তিলক 'গীতারহস্যে' বলেছেন— 'বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এবং স্বয়ং বৌদ্ধগ্রন্থকারগণের লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে মহাযান বৌদ্ধপন্থা বাহির হইবার পূর্বে— অশোকেরও পূর্বে— অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বৎসর পূর্বে ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল।' (*'গীতারহস্য', বালগঙ্গাধর তিলক, পৃ. ৪৮৫*)

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অশ্বঘোষ গীতার ভাষার সাথে পরিচিত ছিলেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন— 'গীতাতে বৌদ্ধমতের কোন প্রকার উল্লেখ নাই এবং উহার ভাষাও পাণিনীয় নহে। সুতরাং গীতা নিশ্চিতই বুদ্ধের পূর্বে রচিত

কিছুতেই বুদ্ধের পরবর্তী যুগের নহে।'

অতএব ড. আর. জি. ভান্ডারকর, ড. রাধাকৃষ্ণাণ, মনীষী তিলক, ড. তেলাঙ্গা প্রমুখ মনীষিগণের মতামত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শালিবাহন শকের ৫০০ বৎসর আগেও গীতার অস্তিত্ব ছিল। এই সময় থেকে আরম্ভ করে গীতার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য, যাঁর ভাষ্যই লব্ধ ভাষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম, তাঁর কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গীতার পারম্পর্য সুষ্ঠুরূপে দেখানো যেতে পারে।

খ্রীষ্টধর্মের সাথে বা খ্রীষ্টানদের রচিত গ্রন্থ এবং বাইবেলের নূতন অনুশাসনের সাথে গীতার কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। তা দেখে কোনো কোনো খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে গীতা খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠার পরে রচিত এবং কেউ কেউ সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদিত ছিল। কিন্তু এটা নির্বিবাদ যে গীতা খ্রীষ্টের জন্মের অনেক বছর আগে রচিত হয়েছিল। এই বিষয়ের সমর্থন করেছেন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মতকেই আরো সুদৃঢ় করেছেন। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতারহস্যে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত ৫০০ বৎসর পূর্বে গীতা রচিত হয়ে থাকবে।

ইতিহাস এবং পুরাণ হিসাবে মহাভারতের স্বীকৃতি

মহাভারত এবং তন্মধ্যস্থিত পরম আধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অন্তে কয়েকটি সংশয়াত্মক প্রশ্নের নিরসন করা যেতে পারে। প্রথম যে সংশয় তা হল মহাভারত ইতিহাস না পুরাণ?

মহাভারতে বর্ণিত দেশকাল ও জাতির সঙ্গে আমরা যেটুকু পরিচয় লাভ করি তা থেকে মহাভারতের ঐতিহাসিকতাই সিদ্ধ হয়। আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে গেলে—

'অষ্টসর্গান্নচ ন্যূনং বিংশৎ সর্গাচ্চ নাধিকম্
মহাকাব্যং প্রযোক্তব্যং মহাপুরুষ কীর্তিযুক্।।'

('সাহিত্য দর্পণ', বিশ্বনাথ কবিরাজ)

— এই লক্ষণানুসারে মহাভারতকে মহাকাব্যই বলতে হয়। কারণ মহাভারত বিশাল অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত; এটা অষ্ট এবং বিংশ সর্গের মধ্যবর্তী তাতে সংশয় নেই এবং শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ইত্যাদি মহৎ চরিত্রের অধিকারীদের মহাপুরুষ বলতেও কোথাও বাধা নেই। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্যের বিদগ্ধসমাজ মহাভারত ও রামায়ণকে

Epic বা Great Epic বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিদেশিনী বিদুষী Annie Basant বলেছেন — 'The Mahabharat is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study.' ***('The Story of the Great War', Annie Basant, Introduction, P-7)***

বস্তুতপক্ষে এই মহাকাব্যের ভিতরে যে সকল উপাখ্যান প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তারাও এক একটি মহাকাব্যের রূপলাভ করতে পারত। প্রসঙ্গাক্রমে 'নলোপাখ্যান', 'শকুন্তলোপাখ্যান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সেই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz যথার্থই মন্তব্য করেছেন— 'Some of the poem which have found admission in the Mahabharata are of such proportions, and from a complete whole to such an extent that we can speak of them as epics within the epic.' ***('History of Indian Literature', Winternitr, Vol.-I, P - 387)***

যদিও মহাভারত মহাকাব্য হিসাবেই বেশি স্বীকৃতি লাভ করেছে তথাপি এর ঐতিহাসিক মূল্যও একেবারে অগ্রাহ্য করবার বিষয় নয়। মহাভারত যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এর ঐতিহাসিকতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্য তীর্থ বলিয়া ভারতে পরিচিত, অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যেই স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথি কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্যু ক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখান আজও পুত্রহীনারা পুত্র কামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করেন; যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত বীরগণের সংকার সমাপন হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৯)* মহাভারতোত্তর রাজাগণ যে সত্যই ভারতবর্ষের শাসক ছিলেন তারও স্পস্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতি-হ-আস এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'ইতিহাস' পদটি পাওয়া যায়। ইতিহাস বলতে পূর্ববৃত্ত কথাই বোঝা যায়।

'ধর্মার্থ কামমোক্ষানামুপদেশ সমন্বিতং।
পূর্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।' *(দেবীভাগবত পুরাণ)*

এই লক্ষণানুসারে মহাভারতকে ইতিহাসই বলতে হয়। কারণ মহাভারতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের জ্ঞানই কথিত হয়েছে। পুরাকালের

ঘটনাসমূহই এর বর্ণনীয় বিষয়। এই অপূর্ব মহাগ্রন্থে চতুবর্গের সম্মিলন পরিলক্ষিত হওয়ায় মহাভারতের ঐতিহাসিকতাই সিদ্ধ হয়।

মহাভারতকে পুরাণ হিসাবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ—

'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরানং পঞ্চলক্ষনম্।।' (*'বায়ুপুরাণ', ৪।১১*)

পুরাণের এই লক্ষণটি মহাভারতের ক্ষেত্রেও সুপ্রযুক্ত হয়। পুরাণরূপ এই মহাগ্রন্থখানি সূর্যের সহস্র রশ্মির প্রভার ন্যায় সমগ্র ভারতীয় সভ্যতাকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। বিষ্ণু কল্প ঋষি বেদব্যাস স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার সম্মুখে স্বকীয় গ্রন্থ বর্ণিত বিষয়ের এমন একটি বর্ণনা দিয়েছেন— 'ভগবান আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি। তাহাতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ এই সকলের সারসংকলন ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ এবং ভুত ভবিষ্যত ও বর্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি।' —

'তপসা ব্রহ্ম চর্যেণ ব্যস্যবেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুন্যং সত্যবতীসুতঃ।।
ইতিহাসপুরাণামুন্মেষং নির্মিতং চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ ত্রিবিধংকাল সঞ্জিতম্।।'

(*'মহাভারত', আর্যশাস্ত্র, আদিপর্ব, ১ম অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক, পৃ. ৮*)

বালক যেমন পিতাকে ভাই বলে সম্বোধন করলে তাঁর পিতৃত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না সেরকম মহাভারতকে ইতিহাস বা পুরাণ যে রূপেই চিহ্নিত করা হোক না কেন তাতে মহাভারতরূপ এই মহাগ্রন্থের গুরুত্বের কোনো রূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত নয়

দ্বিতীয়ত যে সংশয়টি সাধারণ মানুষকে সংশয়াবিষ্ট করে তা হল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভাবতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কিনা? অর্থাৎ গীতা পৃথকভাবে লিখিত একটি গ্রন্থ, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গ্রন্থকার তাকে মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই প্রশ্নটি নিয়ে বহু মনীষী তাঁদের গবেষণালব্ধ সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে এরূপ একটি জটিল প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াস করা হচ্ছে।

অষ্টাদশপর্বে বিরচিত এই বিশাল মহাভারতের ষষ্ঠপর্ব 'ভীষ্মপর্ব' নামে খ্যাত। এই ভীষ্ম পর্বের মধ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে গীতাপর্বাধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। এবং পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় থেকে দ্বিচত্বারিংশত্তম (২৫-৪২) অধ্যায় পর্যন্ত অষ্টাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রলহরীর

কথা চিন্তা করলে তার মধ্যে বাত্যাহত একটি ক্ষুদ্র বৈতরণীর ছবি স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু গীতার প্রক্ষিপ্তবাদ যারা স্বীকার করেন তাঁরা বলেন যে পৃথিবীর বিবরণ বর্ণনা করতে করতে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সঞ্জয় ভীষ্মের রণপতন সংবাদ নিবেদন করলেন। এতে পূর্বাপর সংগতি কোথায়?

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অষ্টাদশ দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মহা সমর সংগঠিত হয়েছিল। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মদেব পতিত হলেন। বিষ্ণুকল্প ব্যাসদেবের আশীর্বাদে দিব্যচক্ষের অধিকারী সঞ্জয় কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে এসে বললেন—

'সঞ্জয়োহহং মহাভাগ নমস্তে ভরতর্ষভঃ।
হতো ভীষ্ম শান্তনব ভরতানাং পিতামহ।।'

('মহাভারত', ভীষ্ম পর্ব, ১৩ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ মহারাজ! আমি সঞ্জয় আপনাকে নমস্কার করি। ভরতগণের পিতামহ শান্তনু নন্দন ভীষ্ম নিহত হয়েছেন। ভীষ্মের রণপতন সন্দেশে মর্মাহত বিস্মিত ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণাভিলাষে প্রশ্ন করবেন—

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ১ শ্লোক)

অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে আমার পুত্ররা এবং পাণ্ডবগণ কি করেছিল? সেই অবসরে সঞ্জয় অর্জুনের বিষাদন্তে শঙ্খশব্দে যুদ্ধঘোষণা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বীরগণের বধবৃত্তান্ত বর্ণনা করবেন। এই অভিলাষেই গ্রন্থকার ভীষ্ম পর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গীতার সূচনা করেছেন।

গীতার মতো এরকম আধ্যাত্ম শাস্ত্রের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই নিবিষ্টচিত্ত না হলে গীতা বলা এবং শোনা কোনোটাই সম্ভব নয়, কিন্তু অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার তুমুল কলরোলের মধ্যে থেকে গীতার ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব? এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে প্রক্ষিপ্তবাদিগণ অর্জুনকে সমর্থন করেন। তদুত্তরে এটা বলা যেতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণাধার, সর্বদর্শী এবং অর্জুনের মতো অস্ত্রবিশারদ সেই বিষয়ে অসতর্ক ছিলেন না। ভীষ্ম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের নিয়ম নির্ধারণ করে বলা হয়েছিল—'সমাভাষ্যং প্রহর্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিরলে।' *('মহাভারত', ভীষ্মপর্ব, ১ম অধ্যায়)* যুদ্ধের এই যে নিয়ম যুদ্ধোন্মত্ত দুই পক্ষের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে যোদ্ধাদের মানসিক উৎকর্ষের এবং নৈতিকতার পরিচয় আছে। সুতরাং অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে যুদ্ধস্থলের মধ্যে থেকেও গীতার ব্যাখ্যা করতে এবং

শুনতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু গীতা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছে। সাধারণযোগী যোগ সাধনার জন্য নির্জন স্থান পছন্দ করেন। কিন্তু অসাধারণ যোগী অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করে বাহ্যকেই অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই যোগবলে কুরুক্ষেত্রের কল-কোলাহলের মধ্যে থেকেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই গীতার আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানসম্পন্ন যোগশাস্ত্র বর্ণনা ও শ্রবণ করেছেন। উপরন্তু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। যিনি ভগবান্ তাঁর সম্বন্ধে সম্ভবাসম্ভবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিপক্ষবাদিগণ এইরকম বলে থাকেন যে ব্যাসদেব, যিনি কেবল মুখরোচক গল্পলেখায় পারদর্শী এবং যিনি কবি তাঁর পক্ষে গীতার ন্যায় অধ্যাত্মশাস্ত্র লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে না। যিনি মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে 'সনৎসুজাত' নামক অধ্যাত্মশাস্ত্র লিখেছেন, বেদান্ত দর্শন যার লেখনী নিসৃত এবং পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যভূমিকা যার দ্বারা বিরচিত তার পক্ষে গীতা রচনা করা কোনো রকমভাবেই অসম্ভব বলে প্রতিভাত হতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে গীতাকে মহাভারতের মধ্যে কোনোরকমভাবেই প্রক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে না। গীতা যদি প্রক্ষিপ্তই হত তা হলে মহাভারতের অন্যান্য পর্বগুলোতে গীতার কোনো রকম উল্লেখ পরিলক্ষিত হত না। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হয়েছে। বর্তমানে দুটি মাত্র উদাহরণের সাহায্যে এই সংশয় ভঞ্জন করা হচ্ছে।

মহাভারতের শান্তি পর্বে নিম্নোক্ত শ্লোকটি পরিদৃষ্ট হয় —

'সমুপোঢ়েস্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৩৪৮ অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)

অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের সময় যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও অর্জুন বিষণ্ণ তখন এই ধর্মের উপদেশ ভগবান স্বয়ং প্রদান করেন। আবার নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এই ধর্ম ঈশ্বর পূর্বে ভগবদ্গীতাতে বর্ণনা করা হয়েছে— 'কথিত হরি গীতাসু।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৩৪৮ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক)* শান্তি পর্ব এবং অশ্বমেধ পর্ব যা মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ পর্বের স্থান অধিকার করে আছে তাতে সাকুল্যে সাতটি স্থানে গীতার উল্লেখ দেখা যায়। তা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। এই সকল বিষয় বিচক্ষণতার সাথে বিচার করে ড. রাধাকৃষ্ণাণ এবং লোকমান্য তিলক সমগ্র গীতাকেই মহাভারতের প্রকৃত অংশ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহাভারতের রচয়িতা এবং তাঁর স্বরূপ

কোনো কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মহাভারত, অষ্টাদশাধ্যয়ী গীতা এবং বেদান্ত দর্শণ, একই ব্যক্তির লেখনী নিসৃত নয় বলে অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা 'ব্যাস' একটি নিছক উপাধি বিশেষ মনে করে এইরূপ সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু এই সংশয় কোনো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা অনায়াসেই প্রতিপাদন করা যেতে পারে।

সুবিশাল মহাভারতরূপ কর্মযজ্ঞে যিনি পৌরোহিত্য করেন তিনি পরাশরাত্মজ সত্যবতীনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। 'ব্যাস' সত্যই একটি উপাধি বিশেষ। 'মহামহোপাধ্যায়', 'বিদ্যাসাগর', 'ভারতরত্ন' ইত্যাদি উপাধি যেমন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষেই লাভ করা সম্ভব সেইরূপ মহাভারতের যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ঋষি ব্যতীত অপর কেউ এই খ্যাতি লাভ করেছিল বলে শোনা যায় না। ব্যাসগণ সকলেই নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদনাভিলাষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের আর্বিভাবের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দেবী ভাগবত পুরাণের প্রথমস্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে সুত বলেছেন--

'মন্বন্তরে সপ্তমেহত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্ঠাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ।।
ব্যাসঃ সত্যবতীসুনুর্গুরুর্মে ধর্মবিত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে দৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি।।'

('দেবীভাগবত পুরাণ', ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ 'বর্তমান বৈবস্বতনামক শুভ সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে মুনি প্রবর সত্যবতী নন্দনই ব্যাস, ইনিই আমার গুরু এবং ইনি ধর্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একোনত্রিংশৎ দ্বাপরে দ্রোণপুত্র হইবেন ব্যাস।' অতঃপর ঋষিগণ সুতের নিকট পূর্ব দ্বাপর যুগে উদ্ভূত পুরাণ প্রবক্তা ব্যাসগণের বিষয় বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বলেন—

'ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতি সংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা।।'

('ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', স্বামী সন্তদাস, পৃ. ২৪)

'সপ্তবিংশতি দ্বাপরে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আমি যদ্রুপ শ্রুত হয়েছি তদ্রুপ এই অষ্টাবিংশতি ব্যাসের কথা বললাম।'

এই মহামতি ব্যাসদেব ব্রহ্মার নির্দেশে বেদবিভাগে প্রবৃত্ত হন। বেদ বিভাগান্তে তিনি চারজন বেদজ্ঞ শিষ্য--- পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে যথাক্রমে

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। বিষ্ণু পুরাণে এটাই দেখা যায়—

'ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ সজগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্।'

('গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রথম ষট্‌কের ভূমিকা, বিষ্ণু পুরাণ ৩.৪.৭, পৃ. ৪৮)

এই ব্যাসদেবের বিষয় মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে—

'যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।।
লোকে ব্যাসত্ত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ।'

('গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রথম ষট্‌কের ভূমিকা, মহাভারত ১.১০৫.১০,পৃ. ৪৮)

অর্থাৎ যে ভগবান ঋষি স্বীয় তপস্যা প্রভাবে বেদরাশিকে তপোবলে চারভাগে বিভক্ত করে ব্যাস নামে অভিহিত হন, কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বীপজাত বলে তাঁরই নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ হয়েছে। সুতরাং সাধারণ জনমানসে ব্যাসের কার্যাবলী নিয়ে যে সংশয় দেখা যায় অর্থাৎ অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, যোগসূত্রভাষ্য, ব্রহ্ম সূত্র, মহাভারত প্রভৃতি একই ব্যক্তির রচনা নয় তা সম্পূর্ণ অমূলক এবং এটাও যথেষ্ট প্রত্যয়ের সাথে বলা যেতে পারে যে ঐ সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি ছাড়া অন্য কারও ব্যাসত্ব সিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাভারত ও গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রশস্তি

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে মহাভারতের প্রাচীনতা তার গুরুত্ব এবং জনমানসে তার অপরিসীম প্রভাবের কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রূপ গহন অরণ্যানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অরণ্যানীর প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে কঠিন আত্মজ্ঞানের সরল সিদ্ধান্ত। মহাভারতের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'ভীষ্মপর্ব'। এই ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে গীতা পর্বাধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। উক্ত পর্বেরই পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে দ্বিচত্বারিংশৎতম অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে এটা সুপরিকল্পিতভাবে মহাভারতের মধ্য পরবর্তী কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই কারণে পূর্ববর্তী মতের অসম্ভাব্যতা এবং অপ্রাসঙ্গিকতা পূর্বেই খণ্ডন করা হয়েছে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের এই কবিত্বময় ভাবঘন ভগবদ্বাণীর সংস্কৃত ভাষায় প্রথম ভাষ্য রচনা করেন এবং মহাভারতরূপ মহাগ্রন্থ থেকে গীতাকে বের করে এনে প্রচার করেন। তার আগে ভীষ্ম পর্বের মধ্যেই গীতা সীমাবদ্ধ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের এই মহান কীর্তিকে সাদর সম্মান জানিয়ে বলেছেন যে— 'শঙ্করাচার্য গীতার প্রচার করেই মহাগৌরবের ভাগী হয়েছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁর মহৎ জীবনে যেসব বড় বড় কাজ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতা প্রচার ও গীতার একটি অতি সুন্দর ভাষ্য প্রণয়ন অন্যতম। ভারতের সনাতন পন্থাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে গীতার এক একটি ভাষ্য লিখেছেন।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, ৪র্থ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩)* বর্তমানে কেবলমাত্র গীতার বিষয় আলোচনা করতে হলে মহাভারতের যে উল্লেখটুকু করা প্রয়োজন তাই করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে গীতার বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কথা মনে হয় তা হল— গীতা কি? তার

মর্মবাণীটি কী? যে গ্রন্থকে অবলম্বন করে বহু যুগ ধরে প্রায় সমগ্র পৃথিবী উৎসুক রয়েছে, গভীর অধ্যাবসায়ের সাথে যে গ্রন্থের পঠন-পাঠন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার আকর্ষণ এবং আস্বাদ্যমানতা নিশ্চয়ই প্রভূত।

বস্তুত অষ্টাদশ পর্বের বিশাল মহাগ্রন্থ মহাভারতে যা বলা হয়েছে তারই নির্যাসটুকু, অষ্টাদশাধ্যয়ী গীতাগ্রন্থের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। সমগ্র মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরি গীতা ব্যাখ্যা আরম্ভ করবার পূর্বে এই কথাই বলেছেন—

'ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা।।'

সমস্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই গীতা। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি জ্ঞানের প্রগাঢ়তায় এই গ্রন্থকে অতিক্রম করতে পরে না। এতে যে তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে তাই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্ত উপনিষদের মধ্যে যে তত্ত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে সেই কুসুমরূপ তত্ত্বগুলোকে চয়ন করে গীতা রূপ শোভন মাল্য গ্রন্থন করা হয়েছে। এই অপূর্ব মালঞ্চের মালাকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আচার্য শংকর 'গীতাভাষ্যে'র ভূমিকায় বলেছেন— 'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত বেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্' অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের স্বনামধন্য দার্শনিক ড. রাধাকৃষ্ণণ বলেন— 'এই বিখ্যাত গীতাশাস্ত্র সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম-সংগ্রহ। এর শিক্ষায় মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ. শ্রীশুভেন্দ্র কুমার মিত্র অনূদিত, পৃ. ২)* ধ্যানযোগী বীর ঋষি অরবিন্দ বলেন— 'গীতা অযুতরত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই পুরাতন সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করতে করতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না। শত বৎসর খুঁজতে খুঁজতে সেই অনন্ত রত্ন ভাণ্ডারের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দু-একটি রত্ন উদ্ধার করতে পারলে দরিদ্র ধনী হয়, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্বিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান কর্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও সন্নদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন।' *('গীতার ভূমিকা', শ্রীঅরবিন্দ. ৩য় সংস্করণ. প্রস্তাবনা, পৃ. ১)* এই গীতার এমনই সর্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য যে, যে ব্যক্তি একবার মনোযোগের সাথে এই গ্রন্থ পাঠ করেছেন তিনি অপার আনন্দ, অবিমিশ্র ভক্তি এবং অপরিমেয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। জীবনই ছিল যাঁর বাণীর স্বরূপ সেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছেন— 'ভগবদ্গীতাতে আমি যে সান্ত্বনা পাই, 'সারমন অন্ দি মাউন্ট'-এও তা সব সময় পাই না। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যখন একটি আলোক রেখাও নজরে পড়ে না, তখন আমি ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করি। এখানে ওখানে এক আধটা শ্লোক পড়তে

পড়তেই দারুণ শোকাবহ ঘটনাসমূহের মধ্যেও আমার মুখে হাঁসি ফুটে ওঠে। এবং এ সব ঘটনা যদি আমার মনে স্থায়ী ও দৃশ্য কোনো ক্ষতচিহ্ন না রেখে থাকে, শুধু ভগবদ্গীতার উপদেশেই তা সম্ভব হয়েছে।' *('গীতাবোধ', মহাত্মা গান্ধী, অনুবাদক : শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকুমার চন্দ্র জানা, ৩য় সংস্করণ, প্রস্তাবনা)* গর্ভধারিনী জননীর স্বর্গগমনের পরে গীতা তাঁর স্থান অধিকার করেছে বলে মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন। রামদয়াল মজুমদার বলেছেন— 'শ্রী গীতা একবার অধ্যয়ন কর মনে হবে এতে কত কি আছে, যেন কত কি তিনি দেখাবেন আশ্বাস দিয়েছেন, আবার পড়, আরও রমণীয় মনে হয় যেন এর কোনো শেষ নেই।' *('গীতা পরিচয়', রামদয়াল মজুমদার, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১)* আমাদের বর্তমান সমস্যাসংকুল জীবনে একমাত্র আলোকের পথ দেখাতে পারে এই গীতা। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানে এই পরম মনোরম গ্রন্থ আলোকবর্তিকার ন্যায় প্রতিভাত হয়। তাই মহাত্মা গান্ধী বলেন— 'যখনই কোনো সঙ্কটে পরি তখনই সঙ্কট হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য গীতার নিকট ছুটে যাই এবং তাঁর কাছে সান্ত্বনা লই।' *('গীতাবোধ', মহাত্মা গান্ধী, অনুবাদক : শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকুমার চন্দ্র জানা, ৩য় সংস্করণ, প্রস্তাবনা)* গীতার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ সরল ভাষায় লিখিত হয়েছে যার দরুণ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের ন্যায় তা তত দূরূহ হয়ে পরেনি। বোধহয় এই কথা স্মরণ করে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক বলেছেন— 'গীতার ন্যায় এইরূপ সরল দ্বিতীয় গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন জগতের সাহিত্যেও দুর্লভ। কেবল কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহাকে উত্তম কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, এবং ইহা জ্ঞান সমন্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য', বালগঙ্গাধর তিলক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত এবং ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ১)* গীতার অপূর্ব কবিত্ব মধুতায় তন্ময় হযে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — 'ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দর জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। গীতা স্পষ্টবুঝিয়ে দিয়েছে, এই জীবনের আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদিগকে জয়ী হইতে হইবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সবটুকু প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবন সংগ্রামের রূপক, তাই যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা বর্ণনার স্থান নির্ণিত হওয়ার অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। .... অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই সকল উপদেশই গীতাকে পরম আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদান্ত দর্শনই গীতায় নিবদ্ধ।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫১)* সাহিত্যসম্রাট ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কারমুক্ত মনে সনাতন মতামতের অপেক্ষা না রেখে গীতার নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য তাঁর অমূল্য এই রচনাটি অসম্পূর্ণ। তিনি তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে গুরুর কণ্ঠে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে—'যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্য লোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোনো মনুষ্যপ্রণিত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফূট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভবদ্গীতায়।' *('ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১৪৯)* এছাড়া গীতা সম্বন্ধে চরমতম উক্তি আর কিই বা হতে পারে। বস্তুতপক্ষে গীতার আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিলেও এর কাব্যিক উৎকর্ষ অতুলনীয়। তাই এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের কাব্যামৃতরূপ অমৃতফলের প্রতি বহু শত বৎসর ধরে মানবচিত্ত আকৃষ্ট হয়ে আসছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতা নামক অপূর্ব ও অমরকাব্যরূপে জগতে পরিচিত ভারতে ইহাই সর্বজন পরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় শাস্ত্র, আর ইহাতে যে উপদেশ আছে তাহা শ্রেষ্ঠ উপদেশ।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭)* শুধু তাই নয় জাতীয় চেতনার উন্মেষের পক্ষে এই গ্রন্থটি ছিল অপরিহার্য। এর বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে। এখানে সামান্য একটু বলা যেতে পারে যে এই গ্রন্থ পাঠ করে বহু মনীষীর মনে নব নব চেতনার উন্মেষ হয়েছে। যাদের নাম এই বিষয়ে শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে প্রধান ভারতরত্ন আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় 'গীতাপ্রবচন' নামকগ্রন্থ রচনা করে তাহাতে লিখেছেন— 'আমার দেহ মার দুধে যতটা বর্ধিত হইয়াছে, আমার হৃদয় ও বুদ্ধি গীতার দুধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্ঠ হইয়াছে।' *('গীতা প্রবচন', আচার্য বিনোবা ভাবে, অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ, ১ম অধ্যায়, পৃ. ১)* কবি নবীনচন্দ্র সেন সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন এবং তার ভুমিকায় বলেন— 'অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরম ধর্মামৃত ও চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। ... গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম— নিষ্কাম ধর্ম।' *('নবীনচন্দ্র রচনাবলী', ড. শান্তি কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০)* গীতোপদিষ্ট এই নিষ্কাম ধর্মই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ও রচনায় প্রচার করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছেন— 'গীতার বাণী বিশ্বজনীন, বাস্তবমুখী, শক্তিদায়ী এবং পবিত্রকারী। মহান উপনিষদ্‌সমূহে মানব সম্পদের এবং

মানবিক সম্ভাবনার যে অসামান্য বিজ্ঞান গড়ে তোলা হয়েছে, তা গীতার মধ্যে লাভ করেছে বাস্তব প্রয়োগমুখী তাৎপর্য ও লক্ষ্যনির্দেশ।'*('ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭)* বহু শত বৎসর পর্যন্ত এই গীতা হিন্দুদের নিকট পূজিত হয়ে আসছে। কিন্তু এর আবেদন কেবলমাত্র হিন্দুদের নিকটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গীতার প্রসঙ্গে মহাবিজ্ঞানী Albert Einstein বলেছেন— 'When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad-gita and find a verse to comfort me; and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meanings from it everyday.' *(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)* শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ম্যানহাটন্ প্রকল্পের পরিচালক, আণবিক বোমার প্রস্তুতকারক Julius Robert Oppenheimer ভগবদ্গীতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তিনি গীতাকে বলেছিলেন - পরিচিত কণ্ঠের সুন্দরতম সঙ্গীত, তিনি গীতার দু'টি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন নিউ ম্যাক্সিকোর ট্রিনিটিতে আণবিক বোমার সফল পরীক্ষা করার পর। তিনি বলেছিলেন— 'If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky that would be like the splendor of the mighty one.' 'দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ'। এবং 'Now I am become death, the destroyer of the worlds' 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো'। *(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)*

ব্রিটিশ অধীকৃত ভারতের গভর্ণর জেনারেল Warren Hastings লিখেছেন— 'The Bhagavad Gita is the gain of humanity – a performance of great originality, of a sublimity of conception, reasoning and diction almost unequalled.' *(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)* পাশ্চাত্যের বিবুধমণ্ডলী গীতার ভাষা ও ভাব এবং গীতিময়তায় আকৃষ্ট হয়ে এর চরম দার্শনিকতাকে নিজেদের উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। ইংরেজ সাহিত্যিক Aldous Huxley লিখেছেন— 'The Bhagavad Gita is the almost systematic statement of spiritual evaluation of endowing value of mankind. The Gita is one of the clearest and most comprehensive summaries of the spiritual thoughts ever to have been made.' *(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)* আমেরিকার অতিন্দ্রিয়বাদি থেরো তাঁর বই 'Walden' এ বলেছেন— 'প্রাতঃকালে আমি আমার বুদ্ধিকে অবগাহন স্নান করাই ভগবদ্গীতার সুবিশাল মহাজাগতিক দর্শনে, যা রচনার পর দেবতাদের বহু বছর কেটে গেছে এবং যার তুলনায় আমাদের আধুনিক পৃথিবী ও তার সাহিত্যকে

অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে বোধ হয়।' *('ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা', স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২)*

বিশ্বের প্রায় সমগ্র দেশ শ্রদ্ধার সাথে অবনত মস্তকে গীতা চর্চা করে থাকে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে গীতার স্থান উচ্চে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিনস্ গীতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তখন থেকেই বর্তমান পাশ্চাত্যের নানা দেশে গীতার আদর্শ এবং ভাবধারা প্রকাশিত হতে থাকে। উইলকিনস্কৃত গীতার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় ভারতবর্ষের প্রথম গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছেন— 'গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্য-জাতির এক বৃহৎ অংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতা পাঠে শুধু ইংরেজ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতা ধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত, ১১শ সংস্করণ, পৃ. ১৫)* এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গোটা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি ও অনুবাদক অগাস্ট উইলহেল্ম ভন্ স্লেজেল পরবর্তীকালে এ অনুবাদ পড়ে বলেছিলেন — 'The most beautiful, and perhaps the only truley phylosophical poem, that the whole range of literature known to us has produced'. *('ওয়ারেন হেস্টিংস ও ভগবদ্গীতা', শ্রীসমীর রায় কর্তৃক লিখিত এবং ২২.০৫.'৮৩ তারিখের 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত)* এই স্লেজেলই ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লাতিন ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। বস্তুতপক্ষে গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হলেও তা কেবল হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই উপদিষ্ট হয়নি। এর আবেদন সার্বজনীন। অ্যালডাস হাক্সলে বলেন — 'সনাতন দর্শনের যে সকল সার সংগ্রহ প্রণীত হয়েছে গীতা তার মধ্যে সবথেকে প্রাঞ্জল ও সার্বিক। এই জন্যই এর মূল্য শুধু হিন্দুদের কাছে বা ভারতীয়দের কাছেই নয়, সমগ্র মানব সমাজের কাছেই স্থায়ী। ভগবদগীতা বোধহয় সনাতন দর্শনের সবচেয়ে সুসমঞ্জস আধ্যাত্মিক বিবৃতি।' *(স্বামী প্রভবানন্দ এবং ক্রিস্টোফার ইসার উড কর্তৃক প্রকাশিত 'ভগবদ্গীতা'র মুখবন্ধ, ১৯৪৫)* নিখিল মানবমনের চিরন্তন অনুভূতির অপূর্ব অভিব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানার্থ সংযুক্ত যে ধর্মগ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তা এই গীতা। সেই জন্যই হয়ত শাহজাহানের জেষ্ঠ্যপুত্র সুপণ্ডিত দারাশিকো লিখেছেন— 'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্য লাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরম পুরুষের কথা বিবৃত ও ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের

দ্বারোদঘাটন করেন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, ১১শ সংস্করণ, পৃ. ১৪)* ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সাহিত্য কীর্তির জন্য যে উপনিষদগুলির কাছে ঋণী তা সর্বজনবিদিত। কবি নিজেও এই কথা অবধারণ করে উপনিষদ রূপ গাভীসমূহের দুগ্ধরূপ গীতাশাস্ত্র জ্ঞান অন্তরে উপলব্ধি করে বলেছেন — 'ভগবদগীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়ত কোন কালেও পুরাতন হবে না।' *('সাহিত্যের স্বরূপ', প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৫১৬)* এই জন্যই সাধকেরা তত্ত্ব এবং তথ্যের ইঙ্গিতে পরিচয় দিয়ে এই মহাগ্রন্থকে প্রণতি জানিয়েছেন—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরানমুণিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবার্ষিণীং ভগবতীমষ্ঠা দশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদ্বেষিনীম্।।

অর্থাৎ — 'হে অষ্ঠাদশাধ্যায়িণি, অদ্বৈতামৃতবার্ষিণি, ভবযন্ত্রণা মুক্তিদায়িনি, মাতঃ ভগবতি ভগবদগীতে, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ তোমাকে অর্জুনের নিকট উপদেশরূপে প্রকাশ করেছেন, এবং প্রাচীন মহর্ষি ব্যাস তোমাকে মহাভারতের মধ্যে গ্রথিত করেছেন আমি তোমাকে প্রাণিধান করি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, অনুবাদক : শ্রীশুভেন্দ্র কুমার মিত্র, 'গীতাপ্রশস্তি', পৃ. ২)*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মবাণী

সংক্ষেপে গীতা মর্মবাণী এবং কেন তা জনমানসে চিরস্থায়ী রেখাপাত করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

নিখিল জ্ঞানের অনন্ত পিপাসার আত্যন্তিক নিবৃত্তি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা। সকল ধর্মের সকল সত্য ও তত্ত্বের সার বিধৃত রয়েছে এই ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থটির মধ্যে। তাই হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করে এসেছে এই মাতৃস্বরূপা গীতা। গীতাকে জানলেই সুগম হয় ধর্মপথ। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাই বলেছেন—

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা।।

গীতাকে সুন্দরভাবে গান বা পাঠ করা কর্তব্য, অন্যান্য শাস্ত্রের আর কী প্রয়োজন, যেহেতু গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে বিনিসৃতা।

কী আছে এই গীতায়? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন বার বার

গীতা বললে যা হয় তাই গীতার সার কথা। অর্থাৎ ত্যাগই গীতার সার কথা। কিন্তু সংশয় হতে পারে 'গীতা' শব্দটি উল্টো করলে 'তাগী' হয়, ত্যাগ হয় না। য-ফলাটি থাকে না সেক্ষেত্রে বলা যায় 'তগ্' ধাতুর সাথে ঘঙ্ প্রত্যয় যোগ করলে 'তাগ' হয়। তার সাথে ইন্ প্রত্যয় যোগ করলে তাগী হয়। ত্যাগী ও তাগী একমানে। উভয়ের অর্থই ত্যাগ করা। কিন্তু কী ত্যাগ? না, স্বার্থ ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ। কেবল নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান-ভক্তি সহকারে জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়াই গীতার মূল বাণী।

গীতাকে বলা হয়ে থাকে সমন্বয় শাস্ত্র। কারণ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় গীতাকে নিজ নিজ মত ও পথের অনুকূলে ব্যাখ্যা করলেও গীতা কিন্তু সকল মত ও পথের সমন্বয় সাধন করেছে। কোনো কোনো সম্প্রদায় বলছেন, কর্মই শ্রেষ্ঠ, কর্মেই সিদ্ধি। কেউ কেউ বলছেন জ্ঞানেই মুক্তি আবার জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি, আবার অন্য কেউ কেউ বলছেন মুক্তি হল ভক্তিতে। নিজ নিজ দৃষ্টিতে সকলেই সঠিক গীতার ১৮টি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে কর্ম, যোগ, জ্ঞান এবং ভক্তির কথা। অনেকেই গীতাকে তিনটি ষটকে ভাগ করে প্রথম ষটকে কর্ম, দ্বিতীয় ষটকে জ্ঞান এবং তৃতীয় বা অন্তিম ষটকে ভক্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে বলেছেন। কিন্তু এইভাবে অধ্যায় বিভাগ সর্বাংশে সমীচীন নয় কারণ—প্রথম ষটক বা প্রথম ছয়টি অধ্যায় ছাড়াও গীতার অন্যত্র কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় ষটকে ছাড়াও গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় ষটকের আগেও ভক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে যোগের পথকে অনেকে পৃথক পথ বলে মনে করলেও যোগ কর্মেরই অঙ্গীভূত। এই চারটি পৃথক পথের সমন্বয় সাধন গীতা কীভাবে করেছে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

গীতায় নিষ্কাম কর্ম সাধন করার কথা বলা হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্ম অনায়াস সাধ্য না হলেও একেবারে অসাধ্যও নয়। কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা, কর্তৃত্ববোধ এবং আসক্তি এই ত্রিবিধ দোষ শূন্য যে কর্ম তাই নিষ্কাম কর্ম পদবাচ্য। গীতা বলছেন কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তাই কর্মত্যাগ নয় নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি আসবে কর্মফল ত্যাগের মধ্য দিয়ে। কর্ম করতে হবে যথাসম্ভব ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে। ঈশ্বর আমাকে কর্মে নিয়োগ করেছেন, তাঁর নির্দেশিত পথে তাঁরই কাজ আমি করছি। এই বোধ থেকে কর্ম করলে ফলাকাঙ্ক্ষা লোপ পাবে। গীতায় অনেকরকম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। কর্ম একরকম যজ্ঞ, বিশেষত যে কর্ম ঈশ্বরার্থে করা হয়। কথাটা কঠিন বলে মনে হলে ধরতে হবে পরার্থে কৃত সকল কর্মই যজ্ঞ পদবাচ্য। এইভাবে কর্ম করেই প্রাচীনকালে রাজর্ষি জনক প্রমুখ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন—'কর্মৈনৈব্য হি

সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।' ভগবান নিজেকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করে বলছেন যে দেখ অর্জুন, তিন লোকে আমার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কোনো বস্তু নেই তথাপি আমি লোক কল্যাণের জন্য সর্বদা কর্ম করে যাই। সুতরাং তুমি আমাকে অনুসরণ কর। নিষ্কামভাবে কর্ম সাধন করতে করতে অন্তরে জ্ঞান সূর্য প্রস্ফুটিত হবে। আর একবার জ্ঞান লাভ হলে—'সর্ব কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' অখিল কর্ম জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানযোগের চাইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট। পাপীর চাইতে অধিক পাপীষ্ঠ ব্যক্তি এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সংসাররূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারে এমনই জ্ঞানের মহিমা। এই জ্ঞান একবার লাভ হলে অন্য কোনো লাভকে আর লাভ বলে মনে হয় না। এই জ্ঞানরূপ অগ্নি মানুষের সমস্ত কর্মকে ভস্মস্যাৎ করে ফেলে। কর্ম জ্ঞানের চাইতে নিকৃষ্ট হলেও কর্মের সোপান বেয়েই জ্ঞান মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায়। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান যখন আমাদের অন্তরে এসে বাসা বাঁধে তখন সেই ডেকে নিয়ে আসে ভক্তিকে। কারণ ভক্তি হল জ্ঞানপূর্বিকা। ভক্তিরূপা শলাকার অগ্রভাগে থাকে জ্ঞানরূপ ফলক। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। আমি যাকে জানি না বা চিনি না তাঁর প্রতি আমার ভক্তি কখনও আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেব বা ইষ্টদেবকে না জানছি ততক্ষণ তাকে আমি ভক্তি করব কীভাবে? যে মুহূর্তে জানব তখনই আসবে ভক্তি। তখনই আমার বলা সার্থক হবে—একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে। এইভাবে কর্মজ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে গীতা অধ্যাত্ম জগতের সমন্বয়সাধিকা হিসেবে বিশ্ববন্দিতা হয়ে রয়েছেন।

শুধুমাত্র সমন্বয়সাধন করার জন্যই কি গীতা সর্বজনাদৃতা? না, তা নয়। ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম শাস্ত্র কম নেই, তাসত্ত্বেও গীতার এই সমাদর কেন? কারণ গীতাই বিশ্ববাসীকে দিয়েছে অনাস্বাদিত পূর্ব অভিনব চারটি তত্ত্ব। সেগুলো হল—নিষ্কাম কর্ম, শরণাগতি, অবতারতত্ত্ব, এবং ভক্তিতত্ত্ব। নিষ্কাম কর্মের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই কর্ম আমাদের সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কর্ম করার কথা বেদে অনেক স্থানে বলা হয়েছে। বেদের অন্তভাগ উপনিষদ বা বেদান্ত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঈশোপনিষদে ঋষি বলছেন—

কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

এই জগতে কর্ম করেই শত বৎসর বাঁচার ইচ্ছা করবে। তোমার পক্ষে এছাড়া অন্যকোনো উপায় নেই। এইভাবে কর্ম করলে মানুষ কর্মে লিপ্ত হয় না। এখানেও

কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'নিষ্কাম' এই শব্দটি গীতাতে প্রথম বলা হয়েছে। কর্ম যদি নিষ্কাম হয় তবে তা কখনোই বন্ধনের হেতু হতে পারে না বরং তা মুক্তির পথকেই প্রশস্ত করে।

গীতায় অপর যে নূতন তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে তা হল শরণাগতি। গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন—'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে শ্রেয় পথের সন্ধান দাও। এইভাবে অর্জুন নিজেকে ভগবানের পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন বলেই তিনি স্বকর্ণে ভগবদ্‌কথামৃত শুনতে পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই লাভ করেছিলেন তাঁর অহৈতুকী কৃপা। সেজন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, কখনই বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বিড়ালের বাচ্চা হ। বাঁদরের বাচ্চা তাঁর মায়ের কোলে নিজের হাতে মাকে ধরে ঝুলে থাকে। মা যখন লাফালাফি করে তখন সে পড়ে গিয়ে আঘাত পায়। কিন্তু বিড়ালের বাচ্চা তার মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে দেয়, মা তাকে ঘাড়ে ধরে যেখানে খুশি নিয়ে যায়। সে কিন্তু নিশ্চিন্ত। তার পড়ে যাবার ভয় থাকে না। ভগবান গীতায় বলেছেন—'অনন্যচেতা হয়ে যে আমার আরাধনা করে আমি তার যোগ এবং ক্ষেম বহন করি। এই শরণাগতি আমাদের বিশ্বাস এনে দেয় আর বিশ্বাস এনে দেয় ভক্তি।

অবতারতত্ত্ব গীতার আর একটি মহাদান। ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য। লোককল্যাণের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। তার এই দীব্যলীলা বিলাস যিনি তত্ত্বত জানেন এই দেহত্যাগের পর তার আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি সকল চাওয়া পাওয়ার অতীত হয়েও জীবের দুঃখ দূর করার জন্য নরদেহ ধারণ করেন।

এইভাবে তাঁকে জানলে, তাঁকে বিশ্বাস করলে তাঁর প্রতি ভক্তি উপজাত হয়। গীতায় ভগবান অঙ্গীকার করে বলেছেন—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রনশ্যতি' অর্থাৎ হে কৌন্তেয়। তুমি নিশ্চয় করে জেনে রাখো যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না। কারণ সে কখনও আমার দৃষ্টির বাইরে থাকে না এবং আমিও কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচোর হই না। কাজেই প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং ঐকান্তিক শরণাগতি ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। যথার্থ ভক্ত অবিরল অশ্রুধারা বিধৌত চক্ষে তখন কেবল ভগবানকেই দেখেন কারণ তিনি যে জীবের হৃদ্দেশে সতত বিরাজমান। 'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুনস্তিষ্ঠতি'। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন গীতা পড়ছেন আর একজন ভক্ত দূরে বসে শুনছেন আর অঝোরে কাঁদছেন। তাঁর কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে আমি গীতা বুঝি না কেবল

চোখের সামনে দেখছি অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ কথা বলছেন তাতেই আমার চোখে জল আসছে। এই ভক্তি আসে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে শরণাগতির ফলে। রামনামে এমন শক্তি যে হনুমান রামনাম করে এক লাফে সাগর পার হয়ে গেল। কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্রকে সাগরপার হবার জন্য সেতু বাঁধতে হয়েছিল। শুধু কি তাই? ঈশ্বর যখন সাকার সগুণ হন তখনই তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি নিবেদন করা সম্ভব হয়। আর নিরাকার নির্গুণের ধারণা করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— 'কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর, ঠান্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে। তেমনি ভক্তিহীম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান সূর্য উঠলে বরফ্ গলে যায়। আগেকার যেমন জল তেমন জল। অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করছে— ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার। আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলেছে।' *(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, মৌসুমী প্রকাশনী, পৃ. ২৩৮)* কাজেই গীতা তার সমন্বয় দর্শন এবং প্রাগুপ্ত এই চারটি অভিনব তত্ত্বের জন্যই সর্বজনগ্রাহ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহাভারতের সম্বন্ধ

মহাভারতের সাথে গীতার সম্পর্ক কি, তা অবলম্বন করে প্রায়শই বিভিন্ন প্রকার আলোচনা হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে মহাভারতরূপ সুবিশাল মহাসাগর অতিক্রমনের জন্য গীতারূপ ক্ষুদ্র বৈতরণীর সাহায্যে একান্ত অপরিহার্য তা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যেতে পারে এই বৈতরণী যা ভবযন্ত্রণা হতে অগণিত মানুষকে মুক্তি প্রদান করে আসছে তার কর্ণধার পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন তার আরোহী। এই গীতাগ্রন্থকে কেউ কেউ মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি যে শ্লোকটির যথার্থ অর্থোদ্ধার ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার করতে পারেননি বা যে শ্লোকটির পূর্বাপর সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেননি তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন। যার ফলে সহজ সরল শ্লোকগুলোতেও অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম' এই বাক্যকে স্মরণ করে কেউ কেউ আবার নবীন ব্যাখ্যাতৃগণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কিন্তু প্রমাদাশংকা তাতে বিন্দুমাত্র কমেনি। যাহোক মহাভারতের বহু স্থানে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পুনরায় এখানে দেখানো যেতে পারে গীতার সেই শ্লোকগুলোকে যাদের কোনোরূপ পরিবর্তন না করে মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো শ্লোকার্দ্ধের অনুরূপ শ্লোকও মহাভারতের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

এর থেকে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে মহাভারতের মধ্যে গীতা প্রক্ষিপ্ত নয়। স্বল্প কয়েকটি শ্লোকের উপস্থাপনের দ্বারা আলোচ্য মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে—

ক) গীতার প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে কুরুরাজ দুর্যোধন স্বীয় শক্তির প্রাবল্য প্রকাশের সময় যা বলেছেন 'ভীষ্মপর্বের' ৫১তম অধ্যায়ে অনুরূপ শ্লোক দেখা যায়—

'অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তমিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।।'

খ) মহাভারতের 'স্ত্রীপর্বের' দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকটিতে কেবলমাত্র 'অব্যক্ত' পদের পরিবর্তে 'অভাব' পদ যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে —

'অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত।
অভাব নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।'

গীতায় আছে —'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্ত নিধান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।'

মহাভারত এবং গীতার উক্ত দুই শ্লোকের মধ্যে সাদৃশ্য কষ্টকল্পনা নহে তাহা উভয়ের পাঠের পর আর পুনরুল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

গ) শ্রীমদভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক শ্লোকটির উল্লেখ শান্তিপর্বের ২৪৬তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শুকানুপ্রশ্নে দেখতে পাওয়া যায়। তার মূল আছে কঠোপনিষদে —

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ।।'

ঘ) 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত।
অভ্যুথানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।'

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম সংখ্যক এই শ্লোকটি গীতার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ এই শ্লোকটির মধ্যেই নিহিত আছে দেবতার অবতার গ্রহণের মূল কথা। আবার মহাভারতের বনপর্বের ১৮৯তম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় প্রশ্নে ২৬ সংখ্যক শ্লোকের পরে এই শ্লোকটিই কেবলমাত্র 'ভারত' এর পরিবর্তে 'সত্তম' পদ ব্যবহৃত হয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

ঙ) 'যৎ সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।'

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকটি মহাভারতের শান্তিপবের ৩০৫তম অধ্যায়ে বশিষ্ঠ করাল সংবাদে স্বল্প পাঠভেদের পর ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে শ্লোকটি

নিম্নরূপ হয়েছে —

'যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখৈস্তদনুগম্যতে।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান।।'

চ) 'বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিণ।।'

এই সুবিখ্যাত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোক। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্বের ২৩৯তম অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক শ্লোকটির সাথে এর কোনো রূপ পার্থক্যই নেই।

ছ) নরকের দ্বারা স্বরূপ কাম ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে গিয়ে গীতায় বলা হয়েছে—

'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কাম ক্রোধস্তথালোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।'

পুনরায় মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ৩২ তম অধ্যায়ের ৬৫ সংখ্যক শ্লোকের পরে লোকহিতার্থে সেই একই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুই উপদেশের মধ্যে কোনোরূপ ভিন্নতা নেই।

জ) মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩৪৮তম অধ্যায়ে নিম্নরূপ একটি শ্লোক দেখা যায়। যথা — 'অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথিগ্বিধম্।

বিবিধা চ তথা চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।। ৮৯।।

পুনরায় এই শ্লোকটিই গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের অন্তে অভিন্নরূপে ব্যবহার হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদভগবদগীতার কতগুলি শ্লোকের অংশ বিশেষ মহাভারতের মধ্যে পরিদৃস্ট হয়। এইভাবে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা গীতার প্রক্ষিপ্ততাকে নিঃসংশয়েই অপসৃত করা চলে। কেবলমাত্র গীতা ও মহাভারতের শ্লোক সাদৃশ্যই নয় তাদের শব্দ সাদৃশ্য এবং অর্থ সাদৃশ্য দেখে এটা অনুমিত হয় যে গীতা ও মহাভারত পরস্পর অভিন্ন এবং একই ব্যক্তির লেখনীমুখ হতে নিসৃত। মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে গীতার নামোল্লেখ স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের উপস্থাপনের দ্বারা উপরিউক্ত সংশয় নিরসনের সুদৃঢ় প্রয়াস করা হচ্ছে।

মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্ব বর্ণনা করবার সময় বলা হয়েছে — 'পূর্বোক্তং ভগবদগীতাপর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ'। পুনরায় এই পর্বেই ভীষ্মপর্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে —

'কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।

মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ'২।২৪৭

আদি পর্বের প্রথম অধ্যায়ে দুর্যোধনের বিজয় লাভ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন — 'যখনই শুনিলাম যে, অর্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তখনই আমি ভয় সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম।' *('মহাভারত', আদিপর্ব, ১ম অধ্যায়, ১৮১ শ্লোক)*

পুনরায় শান্তিপর্বের শেষে নারায়নীয় বা ভাগবত ধর্মের পরম্পরা বর্ণনা করবার সময় বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলছেন যে, এই ধর্ম সাক্ষাত নারায়ণ হতে নারদ প্রাপ্ত হন এবং এই ধর্মই — 'কথিতো হরিগীতাসু সমাস বিধি কল্পিতঃ', হরি গীতা বা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। আবার শান্তিপর্বের ৩৪৮তম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলা হয়েছে —

'সমুপোঢেম্বনীকেষু কুরুপান্ডবয়ো মৃঢ়ে
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্।।'

অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় অর্জুন অন্যমনস্ক হলে স্বয়ং ভগবান এই গীতারূপ ভাগবত ধর্মের উপদেশ করেন। এটা ব্যতীত নারায়নীয় ধর্মের পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে — যে, 'এই ধর্ম এবং যতিদিগের ধর্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম দুইই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে' (৩৪৮-৫৩)। অশ্বমেধ পর্বে অনুগীতা প্রকরণে পরিদৃষ্ট হয় যে এই উপদেশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনরায় শ্রবণ করবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন অর্জুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন — 'যুদ্ধারম্ভে তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম পুনর্বার সেইরূপ বলা সম্ভব নহে, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমাকে বলিতেছি।' *('মহাভারত', অশ্বমেধপর্ব, অনুগীতা, ১৬ অধ্যায়, ১-১৩ শ্লোক)* প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে লোকমান্য তিলক তাঁর গীতারহস্যের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এবং অন্তিমে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে— 'ভাষা সাদৃশ্যই ধরুন, বা অর্থ সাদৃশ্যই ধরুন, কিংবা গীতা সম্বেন্ধে মহাভারতে যে ছয়-সাতবার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপর বিচার করুন, এই রূপ অনুমান না করিয়া থাকা যায় না, গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং যে ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য', বালগঙ্গাধর তিলক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত এবং ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৪৪৮)* মহাভারতের মধ্যে গীতার এই উল্লেখগুলি দেখে প্রক্ষিপ্তবাদিগণ বলে থাকেন যে, গীতা মহাভারতেরই অংশ এটা প্রমাণের জন্য ইতস্ততভাবে মহাভারতের মধ্যে গীতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ বাক্যের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। সুতরাং তা অগ্রাহ্য রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। বস্তুতপক্ষে সমগ্র মহাভারতের নির্যাসটুকু গীতার মধ্যে পাওয়া যায়। গীতার মর্মবাণী যথার্থরূপে

অবগত হলে মহাভারতরূপ সুধামঞ্জুষার অর্গল উক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। আবার সমগ্র মহাভারতখানি যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন তবে তন্মধ্যে গীতা যে কী ভূমিকা পালন করছে তা যথাযথ বুঝতে তাঁর বিলম্ব হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গীতা ও মহাভারত উভয়েই উভয়ের সাপেক্ষ। অধিকন্তু বলা যায় যে গীতার মধ্যেকার মূলভাব এবং মহাভারতের মূলভাব অভিন্ন। যে ধর্ম, সততা, সত্যানুসন্ধিৎসা, তেজ ও বীর্যের প্রকাশ মহাভারতের প্রতি ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে তাই গীতার ১৮টি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভগবান প্রচার করেছেন। মহাভারতের জ্ঞান যেমন সর্বসাধারণের উপযোগী ভাষায়, মুখের কথায় প্রকাশিত হয়েছে গীতাও তেমনই সর্বজনের হিতের জন্য ভগবান প্রকাশ করেছেন। অর্জুন এখানে কেবলমাত্র উপলক্ষ্য। তাঁর পশ্চাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও দেশকাল নির্বিশেষে অসংখ্য মানব এই জ্ঞান লাভ করে তাদের জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তর ঘটাতে পারেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। মহাভারত ব্যতীত গীতাগ্রন্থের অস্তিত্ব ঠিকই থাকবে কিন্তু স্থান কাল ও পাত্রের যথার্থ জ্ঞান না হওয়ায় তার মর্যাদা অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে। আর গীতা ব্যতীত মহাভারত অস্তিত্বহীন না হলেও তার গুরুত্ব যে যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে তার যথার্থতা গীতাধ্যায়ীরা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ

এটা সর্বজননবিদিত যে মহাভারতের অভিন্ন অংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর অদ্যাবধি বহু ভাষ্য টীকা এবং ব্যাখ্যা প্রণীত হয়েছে। তথাপি এই নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবীতে এমন কোন সময় আসবে না যখন আমরা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করতে সমর্থ হব যে, 'হয়েছে আর দরকার নেই।' ঠিক এই কথা স্মরণ করেই ঋষি অরবিন্দ বলেছেন — 'গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনো আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না।' *('গীতার ভূমিকা', শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ২)* সেই সুদূঢ় অতীত হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে প্রাচীন ভাষ্যগুলো পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আচার্য শঙ্করের ভাষ্যই প্রাচীনতম। অবশ্য তিনি তাঁর ভাষ্যে তদপেক্ষা প্রাচীনতর ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কালপ্রভাবে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গীতার ভাষ্য হিসাবে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য ভাষ্যগুলোর মধ্যে শংকরাচার্যের ভাষ্যকেই অধিকাংশ মনীষী অধিকতর প্রামাণ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান ও কর্মের মিলিত বা সমুচয়াত্মক সাধনই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। কর্মকে তিনি জ্ঞান প্রাপ্তির গৌণ সাধনরূপে স্বীকার

করেছেন এবং বলেছেন যে সকল কর্মই সন্ন্যাস পূর্বক জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। তিনি প্রবৃত্তিপর সাধনের রূপটি উঠিয়ে দিয়ে তাকে নিবৃত্তিপর বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন— 'শোক মোহাদি সংসারকর্মনিবৃত্যার্থকং গীতাশাস্ত্রম্ ন প্রবর্ত্তকম্।' তিনি যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন তাই অদ্বৈতবাদ। আচার্য শংকরের পরে আচার্য রামানুজ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ জীব এবং জগৎ একই ঈশ্বরের শরীর। পরে তা থেকেই অনেক জীব এবং সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়েছে। আচার্য রামানুজের অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হন দ্বৈতমতের ব্যাখ্যাতা শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ যিনি উত্তরকালে 'মধ্বাচার্য' নামে অধিকতর পরিচিত হন। তিনি পরব্রহ্ম ও জীবের সতত ভিন্নতার কথা উল্লেখ করেন। তারা কখনও অংশ বা পূর্ণরূপে একসূত্রে গ্রথিত নয়। গীতাভাষ্যে তিনি নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে ভক্তিকেই চরম স্থান দিয়েছেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য। তিনি শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রবর্তন করেন। তিনি বলেছেন শুদ্ধ জীব ও পরব্রহ্ম একই দুই নয়। তার পরিবর্তী ভাষ্যকার ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ হলেন— নিম্বার্ক, জ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠসুরি, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য কেশবকাশ্মীরি ভট্টাচার্যের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক সংস্কৃত টীকা গীতাধ্যায়ীদের কাছে পরম আদরের বস্তু। ব্রহ্ম জীব এবং জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত এই টীকায় তিনি প্রকাশ করেছেন। এতে টীকাকারের সনাতন ধর্ম এবং শাস্ত্রের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নজাত জ্ঞানের যে প্রকাশ ঘটেছে তা বিস্ময়কর। তারপর বাংলা সাহিত্যের যুগন্ধর পুরুষ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কার মুক্ত মনে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে গীতার বাংলা টীকা প্রণয়ন করেন। অবশ্য তাঁর রচনা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তথাপি তিনি তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে গীতার ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রীকৃষ্ণ মানবাতিশায়ী প্রতিভার সাহায্যে জ্ঞানকর্ম ও ভক্তির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর সমসাময়িক কালে বঙ্গদেশে গীতা চর্চার এক প্রবল স্রোত বয়ে যায়। এই স্রোতে যাঁরা অবগাহন করেন তাদের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন, উপাধ্যায় গৌড়গোবিন্দ রায় প্রভৃতি প্রধান। কবি নবীনচন্দ্র সেন সুললিত বাংলা পদ্য ছন্দে গীতার অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্যত্রয়ী বৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস। এতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নর নারায়ণরূপে উপস্থাপিত করেছেন। গৌড় গোবিন্দ-এর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর রচনা আজ প্রায় অবলুপ্ত। বঙ্কিম পরবর্তী যুগে যে সকল পুরুষ গীতা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন তাদের

মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য' একখানি অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর ভাষ্যে এই প্রতিপাদন করেছেন যে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ বা প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্ম প্রচার করেছেন। এছাড়াও ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, ড. রাধাকৃষ্ণণ, আচার্য বিনোবাভাবের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। শ্রীঅরবিন্দ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পুরুষোত্তম যোগ অবলম্বন করে স্বীয় দার্শনিক অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি পুরোষত্তমবাদী। মহাত্মা গান্ধীর যদিও মহাভারতের প্রধান বিষয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে রূপক হিসাবে মনে করেছেন তথাপি তাঁর মূল বক্তব্য হল অনাসক্তি যোগ। আচার্য বিনোবাভাবে কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁর সহবাসী সহকর্মীদের প্রতি যে ভাষণ গীতাবলম্বন করে প্রদান করেন উত্তরকালে তাই 'গীতাপ্রবচন' নামে সুবিখ্যাত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সকলকে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করবার উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও যাঁরা গীতার ভাষ্য রচনা এবং ব্যাখ্যা বা টীকা প্রণয়ন করে যশস্বী হয়েছেন তাদের মধ্যে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। এরা কেউ কেউ স্বীয় সম্প্রদায়নুকূল ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে কেবল ভারতীয় বা হিন্দুদের জন্য উপবিষ্ট হয়নি অর্থাৎ এটা যে সার্বজনীন এবং সার্বকালীক তা গীতার বহুল প্রসার দেখে অনুমিত হয়। পাশ্চাত্যের দেশেও গীতার অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত পাশ্চাত্য মনীষী গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে কার্লাইল, এমার্সন, এস.ডি. বার্নেট, অ্যালডাস হাক্সলের প্রমুখের নাম স্মর্তব্য। তবে তাঁরা যে সকল সময় গীতার যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। তবে তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য সর্বদাই তাঁরা অভিনন্দিত হবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশের পরিবেশ ও স্থান — কুরক্ষেত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কোন্ স্থানে কীরূপ অবস্থায় কে কাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সম্যকরূপে বিবৃত করা না হলে গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যথার্থ অনুধাবন করা দুষ্কর হয়। সেই কারণে প্রথমে উক্ত বিষয়গুলি অর্থাৎ গীতোপদেশের স্থান কাল পাত্র বিষয়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। প্রথমে গীতা কোন স্থলে কী অবস্থায় উপদিষ্ট তাই আলোচিত হবে।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত।
অভ্যুৎথানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

'যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই অধর্মের বিনাশ

এবং ধর্মের সংস্থাপনাভিলাষে আমি অবতীর্ণ হই।' এটা গীতান্তর্গত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিসৃত বাণী। কলিযুগের প্রারম্ভে স্বর্গচ্যুত অসুরদল ধরাতলে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে অধর্মাচরণে লিপ্ত হয়। সাধারণ প্রজাবৃন্দ অশান্তিতে পতিত হয়। তখন যথার্থ ধর্মপথের নির্দ্দেশ দিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহদ্বয় নর এবং নারায়ণ ঋষি ক্ষত্রিয় বংশে নারায়ণ শ্রী কৃষ্ণ রূপে এবং নর অর্জুন রূপে অবতীর্ণ হন। মহাভারতের বনপর্বের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) অধ্যায়ের দশম শ্লোকে এর বীজ রয়েছে —

'নর নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমামনুজানীহি ঋষিকেষ ধনঞ্জয়ৌ।।'

সর্বশক্তিমান সর্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণ এটা যথার্থ অবগত থাকলেও অর্জুনের মধ্যে বিষ্ণু শক্তির পূর্ণ প্রকাশ না থাকায় তিনি তা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন না। অতএব জগতের মহত্তম প্রয়োজন সাধন কল্পে অর্জুনকে আত্মবিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত অজ্ঞরূপে ভগবান প্রকাশ করেছিলেন। গীতার বক্তা সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ।

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের পর ফিরে এসে ন্যায়তঃ রাজ্যর্দ্ধ প্রার্থনা করেন। তখন কুরুপতি দুর্যোধন তাতে অসম্মত হয়ে যুদ্ধাভিলাষ ব্যক্ত করেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণের জন্য কৌরব সভায় গিয়ে অপমানিত হয়ে যুদ্ধের অঙ্গীকার করেন। তিনি অর্জুনের রথের সারথ্য স্বীকার করেন এবং দুর্যোধনের বাসনানুসারে তাকে দুর্জয় নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। মদোন্মত্ত দুযোর্ধন এক শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বহু সৈনিকের প্রতি অধিক বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কৌরবপক্ষে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য প্রমুখ ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কেউ পাণ্ডবপক্ষ কেউ কৌরব পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধোদ্যোগী হলেন। কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা এবং পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধের জন্য যে বিস্তির্ণ প্রান্তরে সমবেত হয়েছিল তারই নাম কুরুক্ষেত্র।

দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয় নৃপতি কুরুর নামানুসারে 'কুরুক্ষেত্র' এই নামটি হয়েছে। মহামতি কুরু এই ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে এই বর লাভ করেন যে, 'যাহারা এই স্থানে আলস্য শূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন অথবা যুদ্ধে বানপথবর্তী হইয়া নিহত হইবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবেন।' *('মহাভারত', শল্যপর্ব, ৫৩-তম অধ্যায়, ১-১৪ শ্লোক)* সেই অবধি তা পূণ্যক্ষেত্র। পরশুরাম রোষপরবশ হয়ে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ সাধন করেন। ক্ষত্রশোনিতে তিনি পিতৃগণের তর্পণ করে ঋচীক প্রমুখ পিতৃগণের কাছ থেকে বর লাভ করেন যে এই স্থান তীর্থে পরিণত হবে। চিরকালই এই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে — 'দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ

সোমো মখো বিষ্ণু বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।' *('শতপথ ব্রাহ্মণ')* পুনরায় জাবাল উপনিষদেও কুরুক্ষেত্রের এরকম স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়— 'যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব যজনং সর্বেষাং ভূতানাং সদনম্।' *('জাবাল উপনিষদ', শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, উপনিষদাবলীর ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩১)* উপরন্তু পিতৃতর্পণ দানাদি শুভকর্ম প্রভৃতির প্রারম্ভে জলশুদ্ধির সময় এরকম বলা হয় যে— 'কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুস্করানিচ তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি।' *(জলশুদ্ধিকরণ মন্ত্র)* সুতরাং কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র তা নিঃসংশয় এবং এটাও যথার্থ যে গীতারূপ পরম মনোরম ধর্মশাস্ত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্মমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের কন্ঠ থেকে ধর্মতত্ত্ব পিপাসু অর্জুনের প্রতি উপদিষ্ট

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশের সঠিক সময়

কুরুক্ষেত্রের পঞ্চযোজন দৈর্ঘ্য এবং পঞ্চযোজন প্রস্থ বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অসংখ্য রথী, মহারথী, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমবেত হয়েছেন যুদ্ধ করবার জন্য। মহাতেজা দুর্যোধন তাঁর পক্ষের অন্যতম যোদ্ধা দ্রোণাচার্যকে সাহস দেবার জন্য তার কাছে স্বীয় শক্তির প্রাবল্য ঘোষণা করে বলছেন যে পাণ্ডবপক্ষে আছেন সাত্যকি, বিরাটরাজ, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু আমার পক্ষেও কম নন আপনি স্বয়ং, ভীষ্মদেব, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ এছাড়াও অসংখ্য বীর যাঁরা সকলে 'মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।' সকলেই আদেশের অপেক্ষায় ধনুকে গুণ লাগিয়ে বসে আছেন, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা সর্বত্র বিরাজ করছে। হঠাৎ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ পূর্বক শঙ্খ বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের শুভানুধ্যায়িগণ হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। এইদিকে অপূর্ব শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত রথে সমাসীন নরাবতার গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন এবং অশ্ববল্গা হস্তে বিষ্ণু শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ নরাবতার শ্রীকৃষ্ণ। একবার মানসলোকে এই অপরূপ দৃশ্য কল্পনা করলে আপামর জনসাধারণের অন্তরে যে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয় তা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। অর্জুন 'পাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ উত্তোলন করে তাতে ফুৎকার দেওয়া মাত্র পাণ্ডবপক্ষীয় শঙ্খগুলি যেন গর্জে উঠল। পর্বত কন্দরে পশুরাজ সিংহ যেমন স্বীয় গর্জনের প্রতিধ্বনিকে অপরকোণ সিংহের গর্জন ভ্রম করে যুদ্ধোদ্যোগী হয় তেমনি পাণ্ডব বীরগণ কৌরব শঙ্খ সঞ্জাত শব্দের প্রত্যুত্তরে শঙ্খনাদেই স্বীয় প্রস্তুতির বার্তা ঘোষণা করলেন। অর্জুন জ্যা রোপন পূর্বক শর সন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন

তাঁর বান ক্ষণকাল পরে যাদের শোণিতে আদ্র হবে তাঁরা সকলেই ধার্তরাষ্ট্র। হঠাৎ তাঁর মনে ভাবান্তর হল, শ্রীকৃষ্ন হয়ত মনে মনে একটু হাসলেন। জলদপ্রতিমস্বনে অর্জুন বললেন যে দুবুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকারী কোন্ কোন্ জনের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে তা যতক্ষণ আমি দেখতে না পাচ্ছি ততক্ষণ উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। শ্রীকৃষ্ন অর্জুনের পূজ্য হলেও তাঁর সারথ্য কার্যে নিযুক্ত তাই অম্লানবদনে যোদ্ধার আদেশ পালন করলেন। যথোক্তস্থানে এসে রথের গতি স্তিমিত হল। অর্জুন পিতামহ, পিতৃব্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র-পৌত্র এবং বন্ধুবর্গকে দেখে নিতান্ত শোকসংবিগ্ন চিত্ত হলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল, মস্তক ঘূর্ণিত হল, হাত থেকে গাণ্ডীব স্খলিত হল। সংসারী মানুষের ভাবে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন —

'এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ 'এরা আমাকে হত্যা করলেও আমি ত্রিলোকের জন্যও এদের হত্যা করতে পারব না, পৃথিবী কি ছাড়।'

কিন্তু এটাতো ক্ষত্রিয়োচিত কথা নয়। ক্ষত্রিয়ের কাছে 'যুদ্ধ করব না' এটা অপেক্ষা লজ্জার বা ঘৃণার আর কিই বা আছে? অর্জুন স্বকীয় ধর্মপথ থেকে স্খলিত হচ্ছেন। এখানে একটি প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক কারণেই উঠতে পারে। তা হল ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ কী? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধ করা, তা হতে ভ্রষ্ট হওয়াই ধর্মভ্রষ্ট হওয়া এই রূপ অর্থ করলে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গীতার যে উপদেশ তা সার্বজনীন তথা সার্বকালীক। দেশ কালের বন্ধন এর সুদূর প্রসারী উপদেশতন্ত্রীকে ছিন্ন করতে পারেনি। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রর যে ভেদ তা সকল দেশে সকল সময় নেই। সুতরাং ধর্মের একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ধর্ম প্রধানত কর্মানুযায়ী হবে। মহাভারতে ধর্মের যে সাধারণ সংজ্ঞা আছে তা নিম্নরূপ —

'ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ১০৯ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

শিক্ষকের ধর্ম শিক্ষকতা করা, ছাত্রের ধর্ম অধ্যয়ন করা, গৃহস্থের ধর্ম গার্হস্থ্য জীবন যাপন করা। এই অর্থে যিনি যুদ্ধ করতে কৃত সংকল্প হয়ে এসেছেন, যার পৃষ্ঠে তূনীর এবং হস্তে ধনুর্বান যুদ্ধই তাঁর নিকট প্রকৃষ্ট ধর্ম। এর থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং অধর্মে লিপ্ত হওয়া তুল্যার্থক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের

এইরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন— 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।' *('ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ প্রকাশন, পৃ. ৫৯১)* প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সাধারণ বৃত্তিগুলির যথার্থ স্ফূর্তিকেই ধর্মজ্ঞান করা হয়েছে। এই উৎকর্ষণ একমাত্র সম্ভব স্বীয় বৃত্তিগুলির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে। এটাই স্বধর্মাচরণ করা। মানুষের সহিত মানুষের যে কেবল বুদ্ধিগত ভেদ আছে তাই নয় গুণগত অন্যান্য প্রভেদও আছে। সেই গুণানুযায়ী প্রত্যেক মানুষের কর্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন। একের কার্য অপরে করলে হয় পরধর্মাচরণ। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়মও নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া, মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্য আবশ্যক। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই। মতবাদ ব্যায়াম বিশেষ— ইহা ছাড়া তাহার জন্য কোন উপকারিতা নাই। অনুশীলনের দ্বারা আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১)* আবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছেন — 'সমাজে একের ধর্ম ঝাড়ু দেওয়া ও অপরের ধর্ম হিসাব রাখা। হিসাবকারীকে উত্তম বলা হয় বলিয়া ঝাড়ুদার যদি নিজের ধর্ম ছাড়ে তাহা হইলে সে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ও সমাজে হানি পৌঁছে। ঈশ্বরের দরবারে উভয় সেবারই মূল্য নিজ নিজ নিষ্ঠা অনুসারে পরিক্ষিত হইবে। উপজীবিকার মূল্য সেখানে তো একই। উভয়েই যদি ঈশ্বরাপির্ত বুদ্ধি হইতে নিজের কর্তব্য করে তবে উভয়ে মোক্ষের সমান যোগ্য হয়।' *('গান্ধী রচনা সম্ভার', শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক অনুদিত, গান্ধীভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯১)* অতএব অর্জুন ক্ষত্রিয় জন্য নয়, তিনি যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধত্যাগ করবার সংকল্প করায় ধর্মত্যাগীর ন্যায় প্রতিভাত হয়েছেন। গীতায় এই বাক্যই শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে দৃঢ় রূপলাভ করেছে। তিনি বলেছেন — প্রকৃতি নির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান করলে কেহ পাপে প্রযুক্ত হয় না। স্বধর্মে থেকে নিহত হওয়া পরধর্মাচরাণাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ — 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)*

যুদ্ধক্ষেত্রে রথারূঢ় মোহাবিষ্ট অর্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্বক বলছেন— 'ন কাংখে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।' স্বীয় অস্ত্রবলে রাজ্যরক্ষা করা এবং অধর্মের বিনাশ সাধন করা যাদের একমাত্র কাজ সেই ক্ষত্রিয়কণ্ঠ থেকে অক্ষত্রিয়োচিত বাক্য বিনির্গত হচ্ছে। যাদের জন্য রাজ্য জয় করতে অর্জুন ইচ্ছা করেন তাদের বধ করে তিনি কি প্রকারে সুখী হবেন, এই চিন্তায় তিনি আকুল হয়ে পড়েছেন। বস্তুতপক্ষে অর্জুনের এই বিভ্রমের উদ্রেক করেছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। কারণ তা না হলে তিনি অর্জুনের রথ স্বজনগণের মধ্যে স্থাপন করতেনই না। তিনি এর পূর্বেই কল্পনা করেছিলেন

যে অর্জুনের বিষাদ উপস্থিত হলে তিনি তাকে ধর্মোপদেশ দেবেন এবং অর্জুনের পশ্চাতে অনন্ত কোটি নর-নারীকে তিনি দেখে ছিলেন যারা এই উপদেশামৃত পান করবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে অর্জুন মোহাবিষ্ট তাঁর মোহাবরণ বিদীর্ণ করা প্রয়োজন তখনই তিনি অর্জুনকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন— 'অর্জুন অনার্য জনোচিত স্বর্গগতিরোধক অযশস্কর মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে আসল, এটা তো যথার্থ বীরের ধর্ম নয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২ শ্লোক)* বস্তুতপক্ষে অহিংসা এবং ক্ষমা অতি পরম ধর্ম। কিন্তু এটা যদি দুর্বলতার দ্বার দিয়ে বের হয় তবে মঙ্গালজনক হতে পারে না। যে দুর্বল তাঁর ক্ষমা করার অধিকার নেই। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। গ্রীকবীর আলেকজান্ডার পুরুরাজকে যথার্থই ক্ষমা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর লেখনী বলে —

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।'

('ন্যায়দণ্ড', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ, সঞ্চয়িতা, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪৪১)

কিন্তু অর্জুন ছিলেন প্রকৃত বীর, দুর্বলতার স্থান তাঁর চরিত্রে ছিল না। সেই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে আমি রাজ্য বিজয় সুখ কিছুই চাই না। অর্জুন জানতেন যে যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী তাঁরই করতলগত হবেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে আমি যুদ্ধ করব না। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে পারা সত্ত্বেও যুদ্ধ করব না। তাঁর চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এটা ভয়ের অশ্রু নয়, তা দয়াশ্রু, করুণাশ্রু, মোহাশ্রু। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর যে মোহ তাই তাকে অবসাদগ্রস্ত করেছিল। সুতরাং তাঁর চরিত্রে এই প্রশান্ত করুণ ভাব তাঁর পক্ষেই সম্ভব। 'ন কাংখে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্য সুখানি চ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)* এই প্রকার অমৃতময়ী বাণী অশ্রুতপূর্ব। অর্জুনের আজন্ম গৃহশত্রু দুর্যোধন ও দুঃশাসন। তাদের চক্রান্তে পঞ্চপাণ্ডবের রাজ্য ধনজন সকলের বিনষ্টি। তাঁদেরই সম্মুখে শানিত অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মাণ হয়ে সেই চরম শত্রুর জন্য যাঁর চিত্ত দয়া ও করুণায় আপ্লুত হয় তাঁর মতন মহত্তম জন

আর বিশেষ কেউ নেই। বস্তুত এরকম কথা ভারতবর্ষের মাটিতে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ভারতীয়ের কণ্ঠেই প্রমূর্তরূপ লাভ করেছে।

কিন্তু অর্জুনের রথে যিনি সমাসীন তিনি সকল শক্তির আধার, মানবাতিশায়ী সকল গুণই তাতে বর্তমান। যার সম্বন্ধে কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলেছেন— 'কৃষ্ণ যাঁহাদের অগ্রণী কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিবে। কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।' *('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ২২ অধ্যায়, ১০-১১ শ্লোক (আর্যশাস্ত্র))* যিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন তিনি তো স্বাভাবিকভাবেই অর্জুনকে যথার্থ উপদেশই প্রদান করবেন। তিনি বলেছেন— 'হে অরিবিমর্দন অর্জুন। ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না, এই কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।'[৩৭] এর পর একে, একে অর্জুনের প্রশ্ন শুনে শ্রীকৃষ্ণ তার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন। একাদিক্রমে অষ্টাদশ যোগ বিবৃত হলে বীরেন্দ্রকেশরী অর্জুন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'করিষ্যে বচনং তব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২ শ্লোক)* অর্থাৎ আমার মোহ অপগত হয়েছে, অজ্ঞান জ্ঞানরশ্মিতে বিদীর্ণ হয়েছে, আমি কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছি। সুতরাং হে কৃষ্ণ আমাকে আদেশ দাও তোমার আদেশানুসারে আমি শরজালে কৌরবকুল বিনাশ করি। এর পরে যা ঘটেছিল তা আর বিস্তৃত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বকবির কাব্যে তা এইভাবে বিধৃত হয়ে রয়েছে —

'দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল
ছুটিল রক্ত ধারা —
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিঃশ্বাস রুধি,
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি,
নিবায়ে সূর্য তারা।
সমর বন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান
রাজগৃহ যত ভূতল শয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই।'

('পুরস্কার', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ১৭৯)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্তিমে ভারতবর্ষ বাস্তবিকই মহাশ্মশানে রূপ পরিগ্রহ করল। এতে খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে হতে পারে যে এই সর্বলোক বিধ্বংসী কুকর্মের প্ররোচক ও মন্ত্রণাদাতা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জন্যই এই যুদ্ধ এবং লোকক্ষয়। অতএব তাঁর চরিত্রের মহত্ব কোথায়। এই সংশয় অপনোদনের জন্য মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণর বিষয় সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ধর্মের উপদেশক — শ্রীকৃষ্ণ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই ধ্বংসযজ্ঞে ইন্ধন নিক্ষেপ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কারণ, সাধারণ মানুষের চিত্ত অর্জুনের মতন মোহাবিষ্ট। অর্জুনের মনেও যে এই সংশয় হয়নি তা নয়। বস্তুত অর্জুন স্পষ্টই বলেছেন— 'তৎকিং কর্মনি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ১ শ্লোক)* অর্থাৎ হে কেশব আমাকে কেন এই নিষ্ঠুর কর্মে লিপ্ত করছ। কিন্তু একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে এই বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণীয় যে পাণ্ডবগণ, ন্যায় ও ধর্মের আশ্রয়েই প্রতিপালিত। সততা তাদের চিরসম্বল। কিন্তু দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবেরা এর বিপরীত। অন্যায় এবং অধর্মের প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ৭ এটা মহাভারতেই স্পস্ট উল্লিখিত আছে— 'দুর্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাঁহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা স্বরূপ, দুঃশাসন পুস্প ও ফল এবং অমনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল।' *('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ৩১ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)* পক্ষান্তরে — 'রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখাস্বরূপ, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব পুস্প ও ফল, আমি (শ্রীকৃষ্ণ), বেদ ও ব্রাহ্মণ তাহার মূল।' *('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ৩১ অধ্যায়, ৫৩ শ্লোক)* কুরু ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখা যায় সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে শান্তি সংস্থাপনের জন্য কৌরব সভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকলের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপ্রমাণ মৃত্তিকাও পাণ্ডবদের দিতে চাইলেন না। উপরন্তু কৃষ্ণকে বাঁধবার জন্য অগ্রসর হলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ জানাবার জন্য দুর্যোধনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করালেন। কৌরবসভায় শান্তির দূতরূপে উপস্থিত হয়ে তিনি উভয়পক্ষের মৈত্রীর যে প্রস্তাব করেছিলেন তা এরকম— 'হে সঞ্জয়। আমার অভিলাষ এই যে, জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদের শান্তি লাভ হয়, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও পিতা পুত্রের সহিত মিলিত হন, পাণ্ডবগণ হাসিতে হাসিতে কৌরবদের নিকট গমন করেন এবং আমি সমুদয়

কৌরব ও পাণ্ডবগণকে অক্ষত দেখি। আমি সন্ধি এবং বিগ্রহ উভয় কার্যেই সম্মত আছি, মৃদু ও দারুণ উভয়েই পরান্মুখ নহি এক্ষণে যেরূপ উপস্থিত হইবে তাহাই করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।' *('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ত্রিংশতম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বসুমতী প্রকাশন, পৃ. ১১৫)* এরকম কথা যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের প্ররোচক কখনোই হতে পারে না। এক্ষেত্রে স্মতর্ব্য যে বাল্মীকি প্রণীত আদি কাব্য রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র যখন ইন্দ্রজিতের সাথে সমরে নিরত সেই সময় ইন্দ্রজিতের স্ত্রী প্রমিলা তার প্রমিলা বাহিনী নিয়ে রণস্থলে এসে রামচন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তখন রামচন্দ্র অবলা স্ত্রী জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বীরোচিত নয় বিবেচনা করে তাকে রণস্থলে পতির সাথে মিলিত হবার সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো কাব্যকার রামচন্দ্রের চরিত্রের এই মহত্তম গুণের কথা স্মরণ না করে তাকে ভীত প্রতিপন্ন করেন। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টাকেও কেউ কেউ তাঁর সাহসহীনতার পরিচায়ক মনে করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি দুর্যোধনের প্রবল শক্তিতে ভীত হতেন তা হলে দুর্যোধনের রাজসভায় সর্বসমক্ষে 'আমি বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত' এরকম তেজোদীপ্ত বাক্যোচ্চারণ করতেন না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— 'আমি যত মানুষের কথা জানি তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্যতা, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার— সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার অতিবাহিত হইয়াছে— আজও কোটি কোটি তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। ... সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি।' *(সূত্র: স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সং., পৃ. ২৭৬)* শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত জানতেন যে সন্ধি হবে না, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি হস্তিনায় আসলেন, কেন না যে কর্ম অনুষ্টেয় তা সিদ্ধ হোক বা না হোক তার অনুষ্ঠান করতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে দৈবকে উল্লঙ্ঘন করা যায় না অর্থাৎ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি যুদ্ধে প্রভূত লোকক্ষয় হবে বিবেচনা করে যুদ্ধ নিবারণের জন্য পাণ্ডবজননী কুন্তির কাছে গেলেন পরামর্শের জন্য। কুন্তি সঞ্জয়-বিদুলার কাহিনি

সংক্ষেপে বিবৃত করলেন, যার মর্মার্থ এরকম— মাতা বিদুলা পুত্র সঞ্জয়কে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য বলছেন— 'তুষারের মতন অনন্তকাল ধূমাবৃত হইয়া থাকার চাইতে মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া ওঠা শ্রেয়।' —

'মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরং।' *('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ১৩২ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক)* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্য কবির কণ্ঠেও এই একই কথার সুর প্রতিধ্বনিত হয় —

'One crowded hour of glorius life
Is worth an age without a name.'

('Old Mortality', Sir Walter Scott, Ch. 34.
ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রীর 'গীতায় সমাজ দর্শন', পৃ. ৮ থেকে সংগৃহীত)

সঞ্জয়কে বিদুলা আরও বলেছেন যে—

'শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রমেন বা।
জনান্ যোহভিভবত্যন্যান্ কর্মণা হি স বৈ পুমান্।।'

('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ১২৪ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি বিদ্যা তপস্যা, ঐশ্বর্য বা বিক্রমের দ্বারা অপর সকলকে অভিভূত করেন তিনিই যথার্থ পুরুষ। কুন্তির এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে বিক্রম অবলম্বন করতে বলাই পাণ্ডবজননীর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ভাবলেন মহাবীর কর্ণ কৌরবপক্ষের এক প্রধান যোদ্ধা এবং দুর্যোধনের অন্যতম ভরসাস্থল। সেই কর্ণ তাঁর জন্ম পরিচয় পেলে যদি পাণ্ডবপক্ষাবলম্বন করেন বা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত হন তা হলে কুরুপতি দুর্যোধন হতোদ্যম হয়ে যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করবেন। এই অভিলাষে তিনি কর্ণকে পাণ্ডবাগ্রজরূপে রাজ্য গ্রহণের দাবি জানালেন। কিন্তু বিধি ছিল তাঁর প্রতিকূল, তাই কর্ণও তাকে নিরাশ করলেন। তদন্তর একই অভিলাষে প্রযুক্ত হয়ে কুন্তিও রণস্থলে গিয়ে কর্ণকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবরূপে আমন্ত্রণ জানালেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তা এইভাবে বিধৃত রয়েছে—

'রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথী হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত

গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্য মাঝে রত্ন সিংহাসনে।'

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪০২)

কিন্তু কর্ণ তাঁর রাধেয় নাম পরিত্যাগ করে ক্ষণতরেও পাণ্ডব সাজতে নারাজ। কৃষ্ণের নরজন্ম গ্রহণ যে কেবল কৌরব বিনাশের নিমিত্তই নয় তা বোধ হয় উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। এই বিষয়ে আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে বিরাটরাজ তনয়া উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহোপলক্ষ্যে দ্বারকা হতে কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হয়ে বিরাট নগরে আসলে অন্যান্য রাজন্যবর্গ সেখানেই যুদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবদের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।' *('কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সংসদ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫২৯)* বলাবাহুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ এক্ষেত্রে কেবল পাণ্ডবের পক্ষে যা হিতকর তাই কল্পনা করেননি কৌরবেরা ও তাঁর স্নেহদৃষ্টির বাইরে যাননি। মহাভারতে বীর যোদ্ধা হিসাবে অর্জুন এবং ভীষ্মের পরেই যিনি স্থান লাভ করেছেন তিনি সাত্যকি। সেই সাত্যকি এবং পাঞ্চাল রাজও যখন যুদ্ধ করতে প্রস্তুত তখন শ্রীকৃষ্ণই বলেছিলেন যে পাণ্ডব ও কৌরবের সঙ্গে তাঁর তুল্য সম্বন্ধ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন— 'যদি দুর্যোধন সন্ধি না করে তবে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্থাৎ এই যুদ্ধে আসিতে আমাদের বড় ইচ্ছা নাই।' *('কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সংসদ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৩০)* এরপর তিনি যেভাবে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করলেন তা সকলেই সবিশেষ জ্ঞাত; বলাবাহুল্য যে তিনি দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে আপন দুর্জয় নারায়ণী সেনা তাকে প্রদান করেন এবং নিজে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করেন। এহেন কৃষ্ণ, যিনি শত্রু-মিত্রে সমদর্শী তাঁকে কুচক্রী বা শঠ মনে করবার যথার্থ কোনো কারণ নেই। বস্তুতপক্ষে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্মপ্রচার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মহাভারতের মধ্যে করলেন ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং তদন্তর্গত গীতার মধ্যে করলেন ধর্মপ্রচার —

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মা শুচঃ ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৬ শ্লোক)

এই দুই কার্য সাধনের জন্য তিনি অধর্ম এবং অধার্মিকের বিনাশ কামনা

করেছেন। সেই কারণে কদাচারী অধার্মিক দুর্যোধনের বিনাশই ছিল শ্রীকৃষ্ণের অভীপ্সিত। তিনি সকল সময় এটাই গণনা করতেন যে কিসে অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হয়। একমাত্র দুর্যোধনের বিনাশেই অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন দুই হবে। জরাসন্ধ বধের সময় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অধিক লোকের অমঙ্গলকারীর বিনাশের নিমিত্ত সসৈন্যে অগ্রসর না হয়ে কেবল ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে একমাত্র জরাসন্ধই রাজন্যবর্গকে বলি দেবার অভিপ্রায়ে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সুতরাং তাঁর বিনাশেই অধর্মের বিনষ্টি হবে। সেজন্য আত্মপক্ষের এবং জরাসন্ধের নিরপরাধ বেতনভুক সৈনদের বিনাশ করা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং কুরুবংশ ধ্বংসের একমাত্র মন্ত্রণাদাতা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে চিহ্নিত করা সমীচীন হয় না। বরং সমসাময়িককালে এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, বিদুর, কুন্তি, সাত্যকী প্রমুখ সকলের দ্বারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজিত হয়েছেন। ভক্ত তার হৃদয়ের ভক্তিমিশ্রিত আলোকে তাঁকে যে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন অনবদ্য বাক্যে সেভাবেই তাঁর স্তুতি করেছেন। ব্যাসদেব যিনি ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিজয় নিশান সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সামনে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—

'সত্যং সত্যং পুনঃসত্যং হস্তমুত্থাপ্য চোচ্যতে।
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরম।।'

অর্থাৎ আমি তিন সত্যি করে হাত তুলে বলছি যে বেদের চাইতে বড় কোনো শাস্ত্র নেই আব কেশব বা শ্রীকৃষ্ণের চাইতে বড় কোনো দেবতা নেই। ব্যাসদেবই আবার শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাঁর অপরাধের জন্য। তিনি বলেছেন—

'রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপ্তিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদীনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।।'

অর্থাৎ তুমি রূপবর্জিত, তুমি বাক্য ও মনের অগোচর তবুও তোমার জগৎ ব্যাপ্তিত্ব অস্বীকার করে তোমার সাকার রূপের বর্ণনা আমি করেছি, আমার সেই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। এরকম শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তারূপে অর্জুনের সামনে দণ্ডায়মান। তিনি সমসাময়িককালে ভারতবর্ষের সব মুনি ঋষিদের দ্বারাই স্তুত হয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশের পাত্র বা শ্রোতা — অর্জুন

কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে যে ধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল তার শ্রোতা ছিলেন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর অর্জুন। গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র হিসাবে পাণ্ডবপক্ষের অনেক ধার্মিক বীর থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন নির্বাচন করেছিলেন এরকম ধারণা খুব স্বাভাবিক কারণেই আসতে পারে। সেজন্য এই বিষয়ক কিছু আলোচনা এখানে অপরিহার্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মানবদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখনকার সমসাময়িক ধর্মাত্মাগণ স্বীয়কর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন কৃষ্ণের উপদেশ পালনকারী আত্মীয় ও বন্ধু, উদ্ধব ছিলেন ভক্ত এবং বীরাগ্রগণ্য সাত্যকি তাঁর অনুচর। কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বহু সম্বন্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের সখা, অন্তরঙ্গ সুহৃদ, ভাই এবং সর্বোপরি প্রাণসমা ভগিনী সুভদ্রার স্বামী। এটাও স্মর্তব্য যে সুভদ্রা এবং অর্জুনের বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে দেখে শোকে মূহ্যমান হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি। ভগবদভক্তগণকে ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত করে অমৃতের স্পর্শদান করা যাঁর কাজ সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যথার্থ উপদেশই দিতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন ছিলেন ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,এটা আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিকটই জানতে পারি। সমগ্র গীতায় ভগবান যে মুখ্য উপদেশ প্রদান করেন— 'ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম কর এবং আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ কর'। এটা তো অর্জুন গীতার উপদেশ শোনার আগেই করেছেন। অর্জুন নিঃশঙ্ক চিত্তে বলতে পেরেছিলেন— 'আমি তোমার শরণাগত আমাকে যথার্থ উপদেশ দাও।' গীতা পাঠান্তে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানের প্রকাশ অর্জুনের মধ্যে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর মতন ভক্ত আর কে আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সারথিকে বলতে পারে —

> 'কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ
> পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ় চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
> শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

এর উত্তরে ভগবান্ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বললেন —

'স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ— 'তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলে এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ তোমার কাছে প্রকাশ করলাম।' আবার অষ্টাদশ অধ্যায়েও বললেন —

'সর্বগুহ্য তমং ভূয়ঃ শুনু সে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষামি তে হিতম।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)

সখাই সখার নিকট তার জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করতে পারে, তাতে কোনো লজ্জার ভাব নেই। সখাই সখাকে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' বলে তিরস্কার করতে পারে। কৃষ্ণ তাঁর সখার ভক্তি মিশ্রিত অনেক দৌরাত্ম সহ্য করেছেন। তাই অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পর আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে লোকক্ষয়কারী মহাকালরূপে জেনে তাঁর নিকট নিজের পূর্বকৃত অনবধানতাজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন— 'পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন আপনিও তেমন আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)* অর্জুন ভগবৎ সকাশে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভের একমাত্র অধিকারী হয়েছিলেন। অর্জুনের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই ভগবান তাকে যোগ্যপাত্ররূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। উপনিষদেও এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈস আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।'

('কাঠকোপনিষদ', ১ম অধ্যায়, দ্বিতীয়াবল্লী, ২৩ শ্লোক)

'এই পরমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধা শক্তি দ্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান্ যাকে বরণ করেন তাঁরই লভ্য, তাঁরই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ করেন।' অতএব নিঃসংশয়ে এটা বলা যেতে পারে যে ভগবানের সঙ্গে সখ্য প্রভৃতি মধুর সম্বন্ধ যিনি স্থাপন করতে পারেন তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের যথার্থ উপযোগী পাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

গীতার ১৮টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও নামের সার্থকতা প্রতিপাদন

পূর্বে গীতার বহিরঙ্গ বিষয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়েছে। বর্তমানে গীতার বিষয়বস্তু কি তাই আলোচিত হবে এবং সেই সঙ্গে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিদৃশ্যমান কতকগুলো আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের যথার্থ মীমাংসা সেই সেই অধ্যায়ের আলোচনান্তে করা হবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করে তার মধ্যে কি কি বিষয়ের জ্ঞান ভগবানের শ্রীমুখ হতে উপদিষ্ট হয়েছে এবং অধ্যায়গুলোর নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে এটাই বিচার্য্য। বস্তুতপক্ষে প্রস্তর খণ্ড নির্মিত হর্ম্যের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রস্তরের যেমন পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব এবং ভূমিকা আছে তেমনিই গীতার মধ্যে প্রত্যেকটি অধ্যায় তথা প্রত্যেকটি শ্লোকের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং তুল্যমূল্য আছে।

সংস্কৃতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে — 'প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে।' প্রয়োজন না থাকলে নিতান্ত মন্দধী ব্যক্তিও কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, তা হলে কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণাধার সর্ববলাধার ব্যক্তি গীতোপদেশ করতে আরম্ভ করলেন? বিশেষত পৃথক পৃথক্ নামে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপদেশ, এদের মধ্যে সঙ্গতিই বা কোথায়?

প্রথম অধ্যায় — 'অর্জুনবিষাদযোগ'

গীতোপদেশের পাত্র হলেন অর্জুন। তিনি মানুষ হলেও তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী ছিল দেবোপম। অতএব তাঁকে দেব-সদৃশ্য মানুষ বলাই যুক্তি যুক্ত। তাঁর সম্মুখে ভগবান বসে আছেন রথের সারথিরূপে। অর্জুনের পঞ্চেন্দ্রিয় স্বরূপ রথাশ্বের বল্গাও শ্রীকৃষ্ণের হাতে। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বশেষে উভয় সেনাদল কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সশস্ত্রভাবে সমবেত হয়েছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে — 'দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ কোন্ জন যুদ্ধে সমাগত হয়েছেন আমি দেখতে চাই। আমার রথ

উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্থাপন কর।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ২১-২৩ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* যোদ্ধার আদেশ সারথির পালন করা কর্তব্য সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অভিলাষানুসারী কার্য করলেন। অর্জুন দেখলেন সেই দ্রোণাচার্য যাঁর কাছে আবাল্য অস্ত্র শিক্ষা করেছেন। সেই পিতামহ ভীষ্মদেব যাঁর স্নেহে তিনি আবাল্য অভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁরাই বিপক্ষে দণ্ডায়মাণ। তাছাড়া আত্মীয়, ভাই, বন্ধু সকলেই যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয়। এদের সঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে হবে এই কল্পনা যেন অর্জুনকে মোহগ্রস্ত করল। অর্জুনের জীবন, বাণী, শিক্ষা, ধর্মজ্ঞান সকলই যেন তিরোহিত হতে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন যে এতে সুখলাভ হবে না। আত্মীয় বধে তাঁর ঘোরতর পাপ হবে। সুতরাং এটা কিছুতেই ধর্মানুমোদিত হতে পারে না। অর্জুন এক ভীষণ মানসিক সংকটের মধ্যে এসে পড়লেন। সংকটময় মুহূর্তে সাধারণ মানুষ তাদের সংকটের কথা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু অর্জুনকে দেখা যায় যে তিনি মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরেছেন। অর্জুন যুদ্ধ করা ন্যায় কি অন্যায় এই প্রশ্ন করেননি। কেবল এই যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন বধ করতে হবে বলে তিনি রণে পরান্মুখ হলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় অর্জুনের এই ভাব দয়া থেকে উৎসারিত কিন্তু তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। দয়া অতি উচ্চ প্রবৃত্তি। এটা দেবতাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ, মনুষ্য মাত্রেরই ভূষণ। কিন্তু অর্জুন স্বার্থবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে মোহ কবলিত, মায়াপাশবদ্ধ হয়েছেন। জ্ঞাতিবধ করলে আমার কি হবে এই স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে দুর্বল করেছে।

তিনি ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য, অধর্মকে পরাভব করার জন্য যুদ্ধে এসেছেন। অতএব তাঁর কাছে আমরা যোদ্ধৃজনোচিত ব্যবহারই আশা করতে পারি। কিন্তু অর্জুনের হাত পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে, মুখ শুকোচ্ছে, আর ঘন ঘন রোমাঞ্চ হচ্ছে। দেবপ্রদত্ত গাণ্ডীব যা তিনি বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন তাও তাঁর হাত থেকে স্খলিত হচ্ছে। একদিকে তাঁর স্বজনগণ অপরদিকে ক্ষাত্রধর্ম এই দুইয়ের দোটানায় পরে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন। তিনি আর্ত হয়ে বলে উঠলেন — 'হে কৃষ্ণ। আমি বিজয়, রাজ্য সুখ, এসব কিছুই চাইনা। হে কৃষ্ণ, রাজ্যই বল, ভোগই বল, এমন কি জীবনই বল এতে আমার লাভ কী?' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)* জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষ চরম হতাশার মধ্যে যেমন সংসার ত্যাগের পরিকল্পনা করে তেমনি অর্জুনও বোধ হয় সংসার ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন উপরিউক্তভাবে। একেই মধুসূদন সরস্বতী বললেন — 'সন্ন্যাস সাধন সূচনম্।' প্রচলিত সামাজিক নিয়মে তাঁর মন ভারাক্রান্ত। 'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ।' এই তাঁর অন্তরে বার বার করাঘাত করছে।

তিনি হয়ত ভাবছেন মহাভারতের সেই কথা—

'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ।।'

('মহাভারত', উদ্যোগ পর্ব, ৩৮ অধ্যায়, ৭৩-৭৪ শ্লোক)

অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করাই অর্জুন শ্রেয় মনে করেছিলেন। অর্জুন সুখের জন্যই অতি কাতর। তাই বার বার তাঁর জিজ্ঞাসা— 'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩৬ শ্লোকাংশ)* স্বজনগণকে হত্যা করে আমি কিরূপে সুখী হব। জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাকে অর্জুন পাপ কার্য বলেই ধরে নিয়েছেন—

'পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িণঃ
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩৫, ৩৬ শ্লোকাংশ)

বিপক্ষীয় যোদ্ধাগণ যে আততায়ী তা অর্জুন স্বীকার করলেন তবে স্বভাবতই প্রশ্ন থাকে আততায়ী কারা? শাস্ত্র বলেছেন—

'অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপানির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র দারাহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িণঃ ।।'

('বশিষ্ঠ স্মৃতি', ৩য় অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

অগ্নিদাতা, বিষপ্রদাতা, বধার্থশস্ত্রধারী, ধন, ভূমি ও স্ত্রীহরণকারী এই ছয় জন আততায়ী। ধার্তরাষ্ট্রগণ তা হলে নিঃসন্দেহে আততায়ী। কারণ তাঁরা পাণ্ডবদের জতুগৃহে দাহ করার চেষ্টা করেন। ভীমসেনকে বিষ প্রদান করেন, দ্যুত ক্রীড়াচ্ছলে পাণ্ডবদের ধন ও রাজ্য অপহরণ করেন এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা করেন। এইরূপ আততায়ী যে বধার্হ সে সম্বন্ধে শাস্ত্রেই বলা হয়েছে—

'গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িণমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি।।'

('মনুসংহিতা', ৮ম অধ্যায়, ৩৫০-৩৫১ শ্লোক)

এর অর্থ ঃ গুরু— বালক, বৃদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ যে কেউই হোক না কেন, আততায়ী হলে কোনো বিচার না করেই তাকে বধ করবে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবেই হোক আততায়ী বধে হন্তার কিছুই দোষ হয় না। অধিকন্তু বলা যেতে পারে হিংসা সেখানে অহিংসাতেই পর্যবসিত হয়। অর্জুন শাস্ত্রানুসারে ধার্তরাষ্ট্রদের আততায়ী

বলছেন অথচ শাস্ত্রানুমোদিত পন্থানুসরণ করেছে না। অর্জুন এই স্থলে কর্তব্য নিরূপণ ক্ষমতা হারিয়েছেন। কর্ত্তব্য নির্ধারণ করতে হবে শাস্ত্রের নির্দ্দেশে। তাই ভগবান বলেছেন—

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৬ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক)

অতএব কর্তব্য নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা উচিত। কর্ম করবার স্থল উপস্থিত হলে শাস্ত্রোক্ত বিধান জেনে এই নরলোকে কর্তব্য নির্ধারণ করাই সঙ্গত তা না করলে তার ফল যে কি তাও ভগবান বললেন—

'য শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৬ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করে আপন ইচ্ছামত কাজে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করতে পারে না এবং সুখ ও সদ্‌গতিও লাভ করতে পারে না। অতএব আততায়ী বধ সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিদ্দেশই চূড়ান্ত।

অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যুদ্ধে যে পক্ষই জয়লাভ করুক তাতে জ্ঞাতি বধ হবেই। যদিও দুর্যোধন প্রমুখ প্রথমে আততায়ীর ন্যায় শস্ত্র সম্পাত করতে উদ্যত হয়েছে। তাঁরা জানে না যে জ্ঞাতি বধ থেকেই কুলক্ষয় হবে। অর্জুন ভাবছেন যে কুলক্ষয়জনিত দোষ জানা সত্ত্বেও আমরা কেন তা থেকে নিবৃত্ত হব না। অর্জুন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললেন যে—'যদি বর্তমান ক্ষেত্রে অধার্মিকের দণ্ডবিধান এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা হলে জ্ঞাতিবর্গ সমূলে বিনষ্ট হবে এবং সমগ্র কুলধর্ম বিনষ্ট হবে। অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুলস্ত্রীরা বিনষ্ট হবে এবং তা থেকেই বর্ণ সংকর হবে, এর ফলে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ জল পর্যন্ত পাবেন না। এই বর্ণ সংকরের ফলে জাতি ও পরিবারের চিরাচরিত ধর্মগুলি নষ্ট হবে। হে জনার্দন কুলধর্মের উল্লঙ্ঘনকারীরা অনন্তকাল নরকবাস করে। অতএব—

'যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্র পাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

আমি যদি নিরস্ত্র হয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা না করি এবং সেই অবস্থায় ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে বধ করে তবে তাই অধিক শ্রেয়ঃ।' মধ্যমপাণ্ডব অর্জুনের সংসারের প্রতি বিরাগ আগেই প্রকাশ পেয়েছে, এই কথায় তাঁর জীবনের প্রতি

বৈরাগ্য এবং বিষাদগ্রস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে মানুষরূপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গীতার গুরু এবং তাঁর গূঢ় কর্ম সম্পাদনের জন্য যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করেছেন সেই যুদ্ধের মুখ্য ভূমিকায় সেই যুগের মুখ্য ব্যক্তি নরাবতার অর্জুন। অর্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হয়েছে বলে গুরু শ্রীকৃষ্ণ কী তাকে সমর্থন করবেন? তা হলে কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা অন্য রকম হত। যদি কৃষ্ণ বলতেন যে— হে অর্জুন তোমার কথাই যথার্থ, আমি ও তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চল শেষ জীবন বনবাসে কাটাই, তা হলে পৃথক্ পৃথক্ যোগ ব্যাখ্যা করবার কোনো রকম প্রয়োজনই অনুভূত হত না। কিন্তু যিনি ঈশ্বরাবতার তিনি দেবোপম উপদেশই দিলেন। তিনি দেখলেন যে অর্জুন শাস্ত্রের চাইতে নিজের অহংবোধকেই বড় মনে করছেন। অর্জুন মোহগ্রস্ত এবং হতবুদ্ধি, ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মোহ যে শুধু বুদ্ধিকেই বিভ্রান্ত করে তা নয়, দেহ এবং মনকেও অবসাদগ্রস্ত করে। অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ এবং যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত সেই অবসাদেরই ফল। এটা ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নির্দ্দেশ করে ভগবান গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন —

> 'শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
> দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)

শাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেছেন— 'ক্ষত্রিয়স্য অধ্যয়নং যজনং দানং শাস্ত্রাজীবী ভূতরক্ষণঞ্চ।' ***('কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র', কুমুদরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮১)*** এটাও ভগবানের নির্দেশ যে— 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' ***('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)*** অর্জুন ধর্মভ্রষ্ট হতে চলেছেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলা হয়। বিষাদের মূলে আছে মোহ। এবং এই মোহ যেহেতু অর্জুনকেই আবিষ্ট করেছিল তাই এই অধ্যায় 'অর্জুনবিষাদযোগ' নামে কথিত হয়। অধিকন্তু লক্ষণীয় এই যে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ান্তে — 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে' ইত্যাদি বলে 'অর্জুনবিষাদ যোগোনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ' বা 'সাংখ্য যোগোনাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ' ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে মহাভারত 'পঞ্চম বেদ' এবং গীতা 'উপনিষদ্' রূপে প্রতিভাত হয়। উপনিষদে যে চরম ব্রহ্মজ্ঞান প্রদত্ত হয়েছে তাই কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনের মাধ্যমে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় গীতায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে উপনিষদে অধিকাংশ মন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য খুব ক্ষীণ। যখন যে বিষয়কে অবলম্বন করা হয়েছে তখন সেই বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ও আলোচনায়

স্থান পেয়েছে। কিন্তু গীতায় দেখা যায় ঔপনিষদিক তত্ত্বরাজির সুসংবদ্ধরূপ যা কাব্যাকারে সরস এবং সহজ বোধ্য করে গ্রথিত। তথাপি গীতা এবং উপনিষদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব সকলের সাদৃশ্য দেখে বলা হয়েছে— 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু।' গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে ভিন্ন ভিন্ন যোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা একত্রিত হলেই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে পর্যবসিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গীতায় 'যোগ' শব্দটি কর্মযোগ অর্থেই প্রযুক্ত। সমগ্র গীতায় আমরা দেখতে পাই কর্মের মাহাত্ম্য অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গই গীতায় প্রদর্শিত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে 'যোগঃ কর্মষুকৌশলম্' অর্থাৎ 'কর্মের কুশলতাই যোগ'। অতএব প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যে যোগের কথা বলা হয়েছে তা ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ কর্মযোগেরই অঙ্গ। প্রথম অধ্যায় যেহেতু অর্জুনের বিষাদকে অবলম্বন করে বিস্তৃতি লাভ করেছে সেইজন্য এটা 'অর্জুনবিষাদযোগ' নামে যথার্থতঃ কথিত হয়েছে।

গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের জ্ঞানই মানুষকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে পরিচালিত করে। এক একটি অধ্যায় যেন এক একটি সোপান। ১৮টি অধ্যায় যেন ১৮টি সোপান। প্রথম অধ্যায়ে বিষাদের সোপানে আরোহণ করে অষ্টাদশে মোক্ষের ভূমিতে উপনীত হতে হবে। বিষাদ থেকে মুক্তি তথা মোক্ষ সার্বজনীন আকুতি। গীতায় প্রথম অধ্যায়ই মানুষকে সেই পথে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রহ্ম তথা ভগবানের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে বলে প্রতি অধ্যায়ই 'যোগ'। উপনিষদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথকে উন্মোচিত করে। গীতা সেই কাজই সম্পাদন করছে বলে গীতাও একটি উপনিষদ্। 'যোগ' শব্দের অর্থ এক করে দেওয়া— ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। প্রথম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। বিষাদযোগ কেন বলা হল? কারণ অর্জুনের বিষাদই তাঁকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার উপায় হল। অর্জুনের জীবনে যেমন মোহ কখনো কখনো হয়েছিল আমাদের জীবনে তেমনি প্রতি পদে পদে মোহ হয়। সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পরে সত্য রক্ষার জন্য জাগতিক নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়তে হয়। অর্জুনের মত আমাদেরও ভিতরে বাইরে নিরন্তর সংগ্রাম চলছে। তাই আমরা গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই। ***('গীতাতত্ত্ব', স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৫)***

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে এমন কতকগুলো শ্লোক দেখা যায় যাদের মধ্যে হয়ত অর্থের পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই তাদের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান বিরোধ আছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন— 'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত - বেদার্থ - সারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্। তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈঃ বিবৃতপদপদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ম্ অপি অত্যন্ত বিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈঃ গৃহ্যমানম্

উপলভ্য অহং বিবেকতঃ অর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।' অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র হলো সমস্ত বেদসমূহের শিক্ষার সারসংগ্রহ, এর অর্থ দুর্বোধ্য। অনেকে এর শব্দ তাদের অর্থ ও সামগ্রিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে যুক্তিরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। সাধারণভাবে লোকে এটিকে প্রচুর স্ববিরোধী চিন্তার সন্নিবেশ বলে মনে করেছেন। তা উপলব্ধি করে উপযুক্ত বিচারসহ মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমি এর বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করব।' **(সূত্র : গীতাভাষ্য, আচার্য শঙ্কর)** তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শঙ্করাচার্যের সময়েও সাধারণ মানুষ গীতার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে করতেন। এখানে তাদের 'গীতা সমস্যা' এই আখ্যা দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'গীতা সমস্যা'র প্রথম অংকুর আছে অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতার প্রথম শ্লোকে।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সঞ্জয় এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে ভীষ্মদেব রণে পতিত হয়েছেন। এরপর ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে উৎসুক হলে সঞ্জয় সবিস্তারে ১৩শ অধ্যায় থেকে ২৪শ অধ্যায় পর্যন্ত যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং এও বললেন যে দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মদেব পতিত হয়েছেন। তারপর ২৫তম অধ্যায় থেকে আরম্ভ হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই গীতার প্রারম্ভে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন—

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ১ম শ্লোক)

অর্থাৎ 'হে সঞ্জয়। ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডব এবং কৌরবগণ কি করল?' যিনি সমূদয় যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করলেন তাঁর কণ্ঠে এই প্রশ্ন অযৌক্তিক। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কেউ স্নেহ বা প্রেম বিনিময় করে না। তাহলে 'কিমকুর্বত' এরকম অসঙ্গত প্রশ্ন করলেন কেন?

অধিকাংশ ভাষ্যকার এবং টীকাকার এই বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। কেউ কেউ যদিও বিষয়টিকে বিবেচ্য মনে করেছেন তথাপি যথার্থ উত্তর প্রদান করেননি। কেউ কেউ আবার স্থান মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ তুলে বিষয়টিকে লঘু করেছেন। তাদের বক্তব্য হল কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, সেখানে এসে অর্জুনের মনে ভাবান্তর হলে তিনি দুর্যোধনদের বধ নাও করতে পারেন। বা স্থান মাহাত্ম্যে দুর্যোধনের মনে ভাবান্তর হলে তিনি পাণ্ডবদের অর্ধ রাজ্য প্রদান করে বিবাদের নিষ্পত্তিও করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র এরকম চিন্তা করে ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু এটা সঙ্গত হয় না। কারণ স্থান মাহাত্ম্যে মানুষ ধর্মপথে প্রবর্তিত হবে। অর্জুন ক্ষত্রিয়, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে

দাঁড়িয়ে স্বীয় ক্ষাত্রধর্মানুসারে যুদ্ধই করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অর্জুন তা করেননি। তিনি ধর্মপথ অবলম্বন না করে ক্লীবতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর পুরুষকারকে আচ্ছাদিত করেছে মোহজনিত ক্লীবতা। তিনি বলেছেন — 'ন কাংখে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)* তারপর শ্রীকৃষ্ণের তীব্র ভর্ৎসনা 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩য় শ্লোকের ১ম পাদ)* অতএব স্থান মাহাত্ম্য থাকল কোথায়?

বস্তুতপক্ষে ভীষ্মদ্রোণাদি তাদের পক্ষে থাকায় বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। হঠাৎ ভীষ্ম রণে পতিত হওয়ায় তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হল। কারণ ভীষ্মই ছিলেন কৌরবকুলের প্রধান ভরসাস্থল। ধৃতরাষ্ট্র এতে হতবুদ্ধি হন এবং মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সঞ্জয়কে যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলতে আদেশ করেন। কিন্তু সঞ্জয় যখন সেই কাহিনি বর্ণনা করছিলেন তখন তা ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও তাঁর অন্তঃকরণ একে ধারণ করতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটে যায় যা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। কোনো নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথায় আতুর মন এমন অনেক কথা শুনে যায় এমন অনেক দৃশ্য দেখে যায় যাকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুরিন্দ্রিয় কখনও আলো দেখেনি উপরন্তু তাঁর অন্তশ্চক্ষু মোহশলাকায় অন্ধ ছিল। সুতরাং সঞ্জয় যে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন তা তিনি শুনলেও তাঁর উদভ্রান্ত হৃদয় তাকে সাম্যকরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তিনি 'কিমকুর্বত' এই প্রশ্ন করেছিলেন। স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করার চাইতে এই মত অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলেই প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় — 'সাংখ্যযোগ'

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনকে দেখা যায় অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান। তিনি এখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর মনোবৈক্লব্য দূর করে ধর্মানুমোদিত পথে প্রত্যাবর্তন করান শ্রীকৃষ্ণ লোকসংগ্রহার্থে প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি বললেন— 'হে অর্জুন। এহেন সংকটময় মুহূর্তে ধর্ম সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক অযশস্কর এবং অনার্যজনোচিত মোহ তোমাকে পেয়ে বসল কেন?' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২য় শ্লোক, ভাবানুবাদ)* প্রসঙ্গানুসারে শাস্ত্র অনুমোদিত আর্যের যে স্বরূপ তা বলা হলো—

> 'কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরণ্।
> তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য ইতি স্মৃত।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য', বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলা সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৫৩০)

এখানে অর্জুনের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তা শ্রীকৃষ্ণ জানালেন— 'হে পার্থ। ক্লীবভাব পরিত্যাগ কর, তা তোমার ক্ষেত্রে অশোভন। তুচ্ছ হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে উঠে বস।' প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অর্জুন যে সমস্ত মূল্যবান কথা বলেছেন তা তাঁর বৈরাগ্যজাত নয়। বৈরাগ্য মানুষকে ক্লীব করে না। 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' বৈরাগ্য ভয়গ্রস্তকে অভয় প্রদান করে। জীবন যখন সর্বপ্রকারে আশাহত হয় তখনই তাতে নৈরাশ্য দেখা যায়। অর্জুনের এই ভাবও বৈরাগ্য নয় নৈরাশ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের একটি মাত্র উপদেশেই এই নৈরাশ্য দূর হয়নি। তিনি বিপক্ষ শিবিরে দণ্ডায়মান ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ গুরুজনদের কিভাবে বধ করবেন এই প্রশ্ন তুললেন যেহেতু শাস্ত্রানুসারে তাঁরা অবধ্য। যদি বধও করেন তবেই বা তাঁদের শোনিতাক্ত রাজ্যসম্পদ ভোগ করবেন কী রূপে? যাঁদের বধ করে বেচে থাকতে মানুষ চায় না তাঁরাই যে সম্মুখ সমরে সমবেত হয়েছেন। 'আমি অনুকম্পাজনিত দুর্বলতায় কাতর আমার মন কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে অসমর্থ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি আমাকে নিশ্চয় করে বল কোনটা শ্রেয়? আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী ও শিষ্য, আমাকে উপদেশ দাও।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭ম শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এইভাবে অর্জুন ভগবানের নিকট শরণাগত হলেন। জীবনে চলার পথের প্রদর্শক হলেন গুরু। এতদিন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা ও বন্ধু হিসাবেই দেখেছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ কাছে থাকলেও তাঁর কাছে যথার্থ কল্যাণ কি তা জিজ্ঞাসা করেননি। জিজ্ঞাসু না হলে উপদেশ প্রদান করতে নেই এটাতো শাস্ত্রের নির্দেশ। আসন্ন সংকটে মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হয়। বর্তমানে অর্জুন মহাসংকটাপন্ন, চলার পথে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। এই অবস্থায় পথনির্দেশক তথা পথের আলোক দিশারী গুরুর প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করে যথার্থ কল্যাণকর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। জগতে দু'টি পথ আছে, একটি শ্রেয় অপরটি প্রেয়। শ্রেয় পথ আমাদের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করে আর প্রেয় আমাদের ইহজাগতিক ভোগ্যবিষয় প্রদান করে সংসারে বন্ধন দশা জন্মায়। তাই প্রেয় হলো নশ্বর আর শ্রেয় হলো ঈশ্বর। অর্জুন বললেন— 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' অর্থাৎ 'যা শ্রেয় হবে তা নিশ্চয় করে আমাকে বল'। সর্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হিসেবে নিযুক্ত আছেন। অর্জুন তাঁর কাছে করজোড়ে প্রকৃত পথের সন্ধান জানতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে কিরূপ উপদেশ অর্জুনকে দেওয়া শ্রেয় তাই বিচার্য। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে ভগবান বলছেন— 'সর্বলোকের মঙ্গল বিধানের জন্য আমি

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়েছি। তার মধ্যে—

নির্বিন্নানাং জ্ঞানযোগো নাসিন্নামিহ কর্মসু
তেস্বনির্বিন্ন চিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।।

('ভাগবত', শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ)

যাঁরা অত্যন্ত বিষয়বিরাগী এবং কর্মসন্ন্যাসী তাদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যাঁরা কর্মে বৈরাগ্য যুক্ত না হয়ে সকামকর্মে রত তাদের জন্য কর্মযোগ প্রসক্ত।' কিন্তু অর্জুনের বৈরাগ্য তো যথার্থ বৈরাগ্য নয় তবে তাঁর উপরে এটা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? সমাধান এই যে, অর্জুনের বৈরাগ্য এসেছে যুদ্ধে। তিনি কিন্তু বিনাযুদ্ধে রাজ্য লাভ করতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন না। অতএব তাঁর বৈরাগ্যের অন্তরালে আছে মোহ যা মানুষকে করে ক্লীবভাবাপন্ন এবং অকর্মণ্য। সত্য দর্শন না থাকার ফলে হয় ভয় ভীতি। আত্মার অজর অমরত্ব অপরিজ্ঞাত থাকার ফলে মৃত্যু ভয় মানুষকে অভিভূত করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে বলেছেন— 'অভয়ং বৈ প্রাপ্তোঽসি জনকঃ' অর্থাৎ 'জনক তুমি ভয়হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ।' ভয়হীনতার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিকভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয়। দুর্বলতা বা ভয়ের দ্বারা নয়। আত্মা যেরূপ অজর অমর তেমনই আনন্দস্বরূপও বটে। এই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলেই মানুষ নির্ভয় হতে পারে। তাই শ্রুতি বলেছেন—

'আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান
ন বিভেতি কদাচন।' *('তৈত্তিরীয়োপনিষদ', ২য় অধ্যায়, ৪র্থ মন্ত্র)*

আনন্দ স্বরূপ এই ব্রহ্মকে জানতে পারলে সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব অর্জুনের দুঃখ অপনোদনের জন্য প্রয়োজন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে আত্ম এবং অনাত্ম বিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন গুরুহত্যা এবং স্বজনবধ শাস্ত্রদৃষ্টিতে অন্যায় এটা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণত পণ্ডিতব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিচার করেন। তাই উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'হে অর্জুন। তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলছ অথচ যাদের জন্য শোক করা অনুচিত তাদের জন্য শোক করছ। পণ্ডিতগণ কিন্তু জীবিত বা মৃত উভয় বিষয়েই শোক রহিত হন। আমি, তুমি বা এই রাজন্যবর্গ পূর্বে কখনও ছিলাম না বা পরে কখনও থাকব না এমন নয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ১১-১২ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* অর্থাৎ জীবের অন্তরস্থ যে আত্মা তাঁর নিত্যতা এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন করলেন। তিনি পুনরায় বললেন— 'দেহের বিনষ্টিতে আত্মার ক্ষয় ব্যয় হয় না। যেমন একই দেহে কৌমার যৌবন ও জরা পর্যায়ক্রমে আসে ও যায় মৃত্যুও তেমনি আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কৈশোর থেকে

যৌবনে পদার্পণ করে যেমন কেউ শোক করে না তেমন আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতেও শোক করা অনুচিত। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ অনুভূত হয়। কিন্তু এরা সব অস্থায়ী।' সুখ এবং দুঃখ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়, তা সর্বজনবিদিত। তাই মহাভারতকার বলেছেন—

'সুখস্যান্তরং দুঃখম্
দুঃখস্যান্তরং সুখম্
ন নিত্যং লভতে দুঃখম্
ন নিত্যং লভতে সুখম্।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)

অতএব সুখ এবং দুঃখের এই অবস্থান্তরে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও ব্যথিত হন না। সুখ এবং দুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন হলে শীতোষ্ণাদি তাঁকে ব্যথিত করতে পারে না। সেই ব্যক্তিই মোক্ষলাভের অধিকারী হন। যে সকল বস্তু নিত্য তার কখনও বিলুপ্তি হয় না। যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না তাদের উৎপত্তি সম্ভব নয়। আবার অস্তিত্বশীল নিত্য বস্তুর তেমনি বিলুপ্তি কখনও ঘটতে পারে না অতএব আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে যে দেহের বিনাশ তাকে আত্মার বিনাশ মনে করার কোনো কারণ নেই। দৃশ্যমান এই জগতের সর্বত্র যাঁর অস্তিত্ব আছে সেই আত্মাকে অবিনাশী বলে জানতে হবে। তার বিনাশ করতে কেউ কখনও সমর্থ হয় না। সেই পরামাত্মা এক থেকে নিজেকেই বহুরূপে ব্যক্ত করেন। সৃষ্টির বৈচিত্র্য যে তিনিই তা শ্রুতিতে এইভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপে বভুবঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপে বহিশ্চ।।'

('কঠোপনিষদ', ২য় অধ্যায়, দ্বিতীয়াবল্লী, ৯ম শ্লোক)

একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্য বস্তুর রূপভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করে সেইরূপ সর্ব্বান্তর্যামী অদ্বিতীয় পরমাত্মাও জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তদনুরূপ আকার বিশিষ্ট হন। আত্মা কখনও মরে না, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয়ীভূত, কিন্তু তাঁর আধার স্বরূপ যে দেহ তা বিনাশশীল। অতএব হে অর্জুন। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাঁরা মনে করেন যে আত্মা কাউকে হত্যা করেন বা অপরের দ্বারা হত হন তাঁরা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানেন না। বস্তুতপক্ষে এই আত্মা কারও হননকর্তা নয় এবং তিনি

কারও দ্বারা হত হন না। শ্রুতিতে এইরূপ বাক্য দেখা যায়—

'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেমন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।'

('কঠোপনিষদ', ১ম অধ্যায়, দ্বিতীয়াবল্লী, ৯ম শ্লোক)

জন্ম এবং মৃত্যু হল গুণের খেলা। কিন্তু আত্মা গুণাতীত। অতএব তিনি জন্ম মৃত্যুরহিত। যদি তার জন্ম স্বীকার করা হয় তাহলেও শোকের কোনো কারণ নেই, কারণ যাঁরা মরবেন তাঁরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন। দেহ হল পাঞ্চভৌতিক। তার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়বিধ বিকার আছে, কিন্তু এই দেহ আত্মা নয়। কাজেই বিনাশশীল দেহের বিনাশে দুঃখ করবার কিছুই নেই। হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে বৃদ্ধিশূন্য, অপক্ষয়রহিত ও জন্মহীন বলে জানেন, তিনি স্বয়ং কাউকে হত্যা করেন না বা নিজে প্রযোজক হয়ে অন্যের দ্বারা হত্যা করান না। দেহের বিনাশকে আত্মার বিনাশ মনে করবার যথার্থ কারণ নেই, এটা অবস্থান্তর মাত্র। মানুষ যেরূপ ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে জীবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে অন্য নবতর দেহ ধারণ করে। জীব তার কর্মফল হেতু নূতন শরীর ধারণ করে। উপনিষদ বলেন— 'অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যম্ বা গান্ধর্বং বা প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মং বা ইতি।' অর্থাৎ পূর্ব স্থূলদেহ ত্যাগ করে জীব পিতৃলোক বা গন্ধর্বলোকে অথবা দেবলোকে বা প্রজাপতি লোকে অধিকতর নূতন উৎকৃষ্ট শরীর ধারণ করে। অস্ত্রের তীক্ষ্মতা, অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের আদ্রকরণক্ষমতা, বায়ুর শুষ্ক করার শক্তি কোনো কিছুই গুণাতীত এই আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। এটা সর্বব্যাপী স্থির এবং অচঞ্চল। আত্মা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত, অবিকারী এবং অচিন্তনীয় সুতরাং হে অর্জুন, তুমি এই বিষয়ে শোক রহিত হও। আর যদি তুমি মনে কর এই আত্মা জন্ম মরণের অধীন তথাপি তোমার শোক করা অনুচিত। কারণ— 'জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)* অর্থাৎ 'জন্ম হলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের পুনরায় জন্ম অবশ্যম্ভাবী'। বঙ্গজ কবি মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় এই তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন —

'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর
হায়রে জীবন নদে।'

('বঙ্গভূমির প্রতি', মধুসূদন রচনাবলী, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৮৬)

আবার ভাগবতে দেখা যায় বসুদেব রাজা কংসকে বলছেন —

'মৃত্যুজর্ন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১০ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)

অর্থাৎ 'হে বীর, জন্মবানের মৃত্যু দেহের সাথে জাত হয়। আজ বা শতাব্দী পরে সকল প্রাণীর মৃত্যু অবধারিত।' হিতোপদেশ তো আমাদের এই শিক্ষাই প্রদান করে— 'পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।' পরিবর্তনশীল এই সংসারে মৃত কোন্ ব্যক্তি জন্ম লাভ না করে।

'হে অর্জুন। জীবগণ হল ব্যক্তমধ্য। অর্থাৎ তাঁরা জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অপ্রকাশ থাকে। অতএব এ বিষয়ে শোক করবার কিছুই নেই। এই আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। কেউ কেউ একে বিস্ময় সহকারে দর্শন করেন, কেউ একে সবিস্ময়ে বর্ণনা করেন আবার কেউ এর কথা শুনে আশ্চার্যান্বিত হন। আবার কেউ শুনে সম্যক্ রূপে জানতে পারেন না।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২৮-২৯ শ্লোকের ভাবানুবাদ)*
শ্রুতিতে দেখা যায়—

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলোহনুশিষ্টঃ।'

('কঠোপনিষদ', ১ম অধ্যায়, দ্বিতীয়াবল্লী, ৭ম শ্লোক)

আত্মা বহু ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণ মাত্রের জন্যও সুলভ নহেন। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেও বহু ব্যক্তির তাকে জানতে পারেন না। আত্মতত্ত্বের সুবক্তা হলেন অদ্ভুত পুরুষ এবং কেবল নিপুণ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট বিরল অধিকারীই আত্মাকে জানতে পারেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'হে ধনঞ্জয়। তুমি ভীষ্ম প্রমুখকে বধ করতে হবে বলে শোক করো না কারণ তাঁদের আত্মা অবধ্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো শুভ নেই অতএব তুমি নিজের ধর্মের কথা স্মরণ করে যুদ্ধের জন্য 'কৃতনিশ্চয়' হও। কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অন্যায়ের প্রতিবিধান এবং প্রজাগণের রক্ষা। মনু বলেছেন—

'সংগ্রামেষ্বনিবর্তিত্বং প্রজানাং চৈব পালনম্।
শুশ্রুষা ব্রাহ্মণানাং চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্।।'

('মনুসংহিতা', ৭ম অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক)

অতএব ধর্মপথে থেকে প্রজাগণের রক্ষা করাই অর্জুনের কাজ। ক্ষাত্র ধর্মের স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নির্ণয় করেছেন—

'শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)

'হে অর্জুন! তুমি ক্ষাত্রধর্মানুমোদিত পন্থা অনুসরণ করে যুদ্ধ কর। তা হলেই স্বর্গের দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হবে। এতে তোমার মঙ্গলই হবে। মহাভারতকার বলেন—

'দ্বাবিমৌ পুরুষব্যগ্র সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ।।'

('মহাভারত', উদ্যোগপর্ব, ৩৩ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক)

অর্থাৎ দুই শ্রেণীর মানুষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করে উর্দ্ধলোকে যেতে সক্ষম হয়, এক যোগী পরিব্রাজক, দুই সমরে নিহত ক্ষত্রিয়। সংহিতাকার মনু বলেন—

'আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুদ্ধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাম্মুখঃ।।'

('মনুসংহিতা', ৭ম অধ্যায়, ৮৯ শ্লোক)

যুদ্ধে পরস্পর নিধনকারী ক্ষত্রিয় রাজা যথাশক্তি যুদ্ধ করে যুদ্ধে পরাম্মুখ না হলে স্বর্গলাভ করে থাকে। অতএব অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করার পক্ষে এটাই তো শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বললেন— 'হে অর্জুন! তুমি যদি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হও তা হলে নিজের কুলগত ধর্ম বিনষ্ট হবে এবং ধর্মের বিনষ্টিতেই কীর্তির বিনষ্টি। সম্মানিত ব্যক্তির কীর্তির বিনাশ মৃত্যুতুল্য', কারণ— 'মানোহি মহতাং ধনম্।' *('কিরাতার্জুনীয়ম্', ভারবি, ১ম সর্গ)* মহারথিগণ তোমাকে ভীত মনে করবে এবং যাদের নিকট এ পর্যন্ত তুমি পূজ্য ছিলে তাঁরা হেয় জ্ঞান করবে। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু প্রকার কুবাক্য বলবে। এর চাইতে অধিকতর দুঃখের বিষয় কিই বা হতে পারে? অতএব

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক)

এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে তুমি পৃথিবী ভোগ করবে আর যুদ্ধে হত হলে স্বর্গলাভ করবে। অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাভাষার স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে যুদ্ধ বিমুখ অভিমন্যুকে উপদেশ

দিতে গিয়ে সুভদ্রার কণ্ঠে এই বাক্যের সমাবেশ করেছেন—

'বীরত্ব প্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার,
ধর্মযুদ্ধ হতে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।'

('রচনাবলী', নবীনচন্দ্র সেন, দত্ত চৌধুরী প্রকাশন, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩০)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে সুখ দুঃখ লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে সমজ্ঞান করে যুদ্ধ করলে তুমি পাপের ভাগী হবে না। পৃথিবীতে জাত জীব পর্যায়ক্রমে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভোগ করে। অতএব নিত্য বা চিরন্তন সুখাকাঙ্ক্ষীকে সাংসারিক সুখ এবং দুঃখ দু'টোই ত্যাগ করিতে হইবে। মহাভারতকার ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন— 'সুখমেব হি দুঃখান্তং কদাচিদ্দুঃখতঃ সুখম্।
তস্মাদেতদ্বং জহ্যাদ য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং সুখম্।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক)

সুখে দুঃখে সম বুদ্ধি হওয়াই তো উভয়ের যথার্থ ত্যাগ। ব্যাসদেব বলেন—

'সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়তঃ সর্বমাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্বীরো নৈব হৃষ্যেন্ন শোচৎ।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, লাভ, অলাভ, জীবন ও মরণ এই সমস্তই মানুষ ক্রমশ অনুভব করে। অতএব বুদ্ধিমান লোক অভিষ্ট লাভ করেও আনন্দিত হবেন না এবং অনিষ্ট লাভেও শোক করবেন না। এই তত্ত্বের উপদেশই তো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিলেন। ভগবান সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে এই জ্ঞানোপদেশ করে কর্মযোগ বিষয়ক উপদেশগুলো প্রদান করতে আরম্ভ করলেন। এই কর্মযোগ এমনই যে এর স্বল্প মাত্র আচরণ করলেও মহাভয় থেকে পরিত্রাণ হয়। হে অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগীর বুদ্ধি ভগবৎনিষ্ঠ এবং নিশ্চয়াত্মিকা। অতএব তুমি এই পথ অবলম্বন কর। বেদের কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন সাধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, ফলকামনাযুক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁরা সমাধি লাভ করতে পারে না। ঈশ্বর উপাসনার জন্য অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করাই হল যোগ। হে অর্জুন! তুমি এই প্রকার যৌগিক বুদ্ধি অবলম্বন কর।

হে অর্জুন! বেদের কর্মকাণ্ড সকল ত্রিগুণাত্মক, তুমি এই তিনগুণের প্রতি অনাসক্ত হও। সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সর্বদা নির্মল সত্ত্বে অবস্থিত হও এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কামনা এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য হয়ে আত্মনিষ্ঠ

হও। সমস্ত দিক্ জল প্লাবিত হলে যেমন কূপাদি অন্বেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না সেইরকম আত্মনিষ্ঠ পুরুষের কাছে বেদোক্ত স্বর্গাদি সুখ অনাদৃত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর পণ্ডিত স্বামী বিদ্যারণ্য তাঁর 'পঞ্চদর্শী' নামক বেদান্ত গ্রন্থে লিখেছেন—

'গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থম্ অশেষতঃ'

অর্থাৎ কৃষক যেমন চালের খোঁজে, ধান নিয়ে তাকে কাঁড়ে, তারপর খোসা ফেলে দিয়ে চালটিকে সিদ্ধ করে খায়, তেমনি মেধাবী বুদ্ধিমান লোক প্রথমে বইটি পড়ে, অনুশীলন করে এবং জ্ঞানলাভের পর গ্রন্থটি ত্যাগ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর একটি গল্পে বলেছিলেন— একজন শহরে তার আত্মীয়ের কাছে চিঠি দেয়, 'তুমি গ্রামে আসবার সময়, এই এই কাপড় আর এতটা সন্দেশ আনবে।' চিঠি পেয়ে আত্মীয়টি তা কোথায় রেখেছে খুঁজে পাচ্ছিল না। সারা বাড়ি খুঁজে অনেক কষ্টে চিঠি পেয়ে দেখল, তাতে লেখা আছে— 'গ্রামে আসবার সময় এই এই জিনিস নিয়ে আসবে।' সে তখন চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দোকানে গেল জিনিসগুলি আনতে। তাই বেদের পারে শাস্ত্রের পারে গিয়ে তাদের বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করতে হয়।

হে অর্জুন! তোমার অধিকার একমাত্র কর্মে, কর্মফলের প্রতি আকৃষ্ট হবে না আবার কর্মকে বর্জনও করবে না। অর্থাৎ কর্মে নিযুক্ত হয়ে সফলতা এবং বিফলতাকে সমজ্ঞান কর। কর্মফলে আসক্তি তোমাকে ফলভোগের জন্য সংসারে আবদ্ধ করবে। অতএব যুদ্ধের ফল তোমার অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন তুমি অনাসক্ত চিত্তে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হও।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব তুমি ফলকামনা শূন্য হয়ে ঈশ্বরসেবানিষ্ঠ বুদ্ধিকেই অবলম্বন কর। কারণ যাঁরা বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষ তাঁরা ইহলোকে পাপ পুণ্যের বন্ধন হতে মুক্ত হন। অতএব তুমি বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ হও। কর্মের যে ত্রিবিধ দোষ আছে তুমি তা থেকে মুক্ত হও। এটাই কর্মের কৌশল এবং এই কর্মের কৌশলই যোগ। তুমি মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন বন থেকে উত্তীর্ণ হবে তখন তুমি সকাম কর্মের ফলস্বরূপ যে স্বর্গাদি ভোগের কথা শুনেছ তার প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টি হবে। যখন তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নিশ্চল হয়ে পরমেশ্বরে স্থির হবে তখন তুমি যোগাবস্থা লাভ করবে। হে পার্থ! পুরুষ যখন স্বীয় অবস্থাতেই তুষ্ট থেকে মনের সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করেন তখনই তাকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সুখে দুঃখে অনুদ্বেগ, সর্ব বিষয়ে আসক্তিশূন্য, শুভ প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব তুমিও ইন্দ্রিয় সকলকে বশে আনতে সচেষ্ট হও। যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ আমার চিন্তায় নিরত হয়ে সকল কামনা

বর্জনপূর্বক নিরহংকারী হন তিনি শান্তি লাভ করেন। এইরূপ অবস্থাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য যে জ্ঞানমঞ্জুষার অর্গল ভগবান্ মুক্ত করেছেন তার সারবান্ তত্ত্বগুলো এই অধ্যায়ে অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উপদিষ্ট হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে 'অর্জুন তুমি যুদ্ধই কর' এই বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যায়ের প্রথম থেকে— 'এষা তেহভিহিতা' ইত্যাদি শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে পরে অর্জুনকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য কর্মযোগের মাধ্যমে শুদ্ধান্তকরণ হয়ে স্থিতধীর ন্যায় কর্ম করতে বললেন। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন—

'জ্ঞানং তৎসাধনং কর্মসত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলম্ জ্ঞাননিষ্টৈবেত্যধ্যায়েহস্মিন্ প্রকীর্তিতম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, ১ম ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩)

অর্থাৎ এই অধ্যায়ে জ্ঞান, জ্ঞান সাধন নিষ্কামকর্ম, তার ফল চিত্তশুদ্ধি ও তার ফল জ্ঞাননিষ্ঠাই কীর্তিত হয়েছে। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছেন—

'দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, ১ম ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শোকগ্রস্ত অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক সাংখ্যজ্ঞান প্রাধান্য পাওয়ায় এই অধ্যায়ের নামকরণ 'সন্ন্যাস' যথার্থত হয়েছে। নিষ্কাম কর্মসাধনই গীতার প্রথম এবং প্রধান শিক্ষা, এর দ্বারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কর্মের দ্বারা জগৎসন্দন দ্রুত ও ঠিক পথে চলবে এবং নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করলে জীব ক্রমশ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়ে পরমপদ লাভ করবে। এই জ্ঞানও এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অধ্যায় 'সাংখ্যযোগ' নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ে সাংখ্য - অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য বিষয়রূপে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গীতায় বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করতে গিয়ে অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে বিষয় আপনা থেকেই এসে পড়েছে বা সেই অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্য স্থান অধিকার করেছে সেই অধ্যায়ের নামকরণও সেই বিষয়ানুযায়ী হয়েছে। এই অধ্যায়ে সাংখ্যের জ্ঞানই অধিক পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে। 'সম্যক্ খ্যায়তে অনেন ইতি সাংখ্য' এটাই সাংখ্য শব্দের বুৎপত্তিগত বিন্যাস। 'সাংখ্য' শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকেই বুঝান হয়েছে। অতএব যার দ্বারা বা যে যোগের মাধ্যমে ব্রহ্মের

জ্ঞান হয় তাই সাংখ্য। এই জ্ঞানের প্রারম্ভে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম কর্তব্য বলে গীতায় বলা হয়েছে। চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বকীয় বর্ণ এবং আশ্রম বিহিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে। তা হলে আত্ম এবং অনাত্মবিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। তার পর মোক্ষের জন্য সকল কাম্য বর্জন করে স'তে অর্থাৎ ব্রহ্মেই জীবন ন্যস্ত করাকে সন্ন্যাস বলে। সেই ব্রহ্মে বা সাংখ্যে জীবন সমর্পণের পথকে বলা হয় সাংখ্য মার্গ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই পথেই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগসাধনের কথা বর্ণিত হওয়ায় তাকে বলা হয় 'সাংখ্যযোগ'।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৫ সংখ্যক শ্লোকটিতে একটি আপাত প্রতীয়মান অসঙ্গতি দেখা যায়। তার সমাধান এইভাবে করা যেতে পারে। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—

'ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।'

অর্থাৎ হে অর্জুন! বেদের কর্মকাণ্ডগুলো ত্রিগুণাত্মক, সংসার প্রতিপাদক, তুমি এই তিনগুণের প্রতি অনাসক্ত হও, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হও, সর্বদা নির্মল সত্ত্বে অবস্থিত হও এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কামনা এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উদ্বেগ শূন্য হয়ে আত্মনিষ্ঠ হও।

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডগুলো ত্রিগুণাত্মক ও সংসার প্রতিপাদক। মানুষ ফললাভের আশায় এর অনুষ্ঠান করে থাকে। আমার সন্তান হোক, উত্তম বর্ষণে আমার কৃষি উর্বর হোক ইত্যাদি কামনা মানুষকে বেদোক্ত কর্মে প্ররোচিত করে। তাই বক্ষ্যমান শ্লোকে অর্জুনকে ভগবান বললেন যে তুমি 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব' অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ পরিহার কর। কিন্তু শ্লোকের তৃতীয়ার্দ্ধে পুনরায় বললেন যে— 'নিত্য সত্ত্বস্থো' অর্থাৎ সর্বদা সত্ত্বগুণে অবস্থান কর। তিন গুণের অতীত হতে বললেন আবার সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করতে বললেন এরা পরস্পর বিরোধী নয় কি?

পূর্বাচার্যগণ কেউ এই বিরোধের মীমাংসা করেননি। আচার্য শংকর থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি দুই একজন ছাড়া কেউই বিরোধটি লক্ষ্য করেননি। এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন— 'ত্রৈগুণ্যবিষযাঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশিয়তব্যো যেষাংতে বেদাস্ত্রৈগুণ্য বিষয়াস্ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন নিস্কামো ভবেত্যর্থঃ।' *(আচার্য শঙ্করের ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)* অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য এই সংসার যার বিষয় সেই বেদকে ত্রৈগুণ্য বিষয় বলে। হে অর্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্যো অর্থাৎ নিস্কাম হও। শ্রীধর স্বামীও তৎকৃৎ টীকায় শংকরের অনুসরণ করে বলেন—'ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো নিস্কামো ভব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, ১ম ষট্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭৯)* কিন্তু এই 'নিস্কাম' অর্থ গ্রহণ করলে বলা যায় যে যাকে নিস্কাম হতে বলা হল তাকে আবার সত্ত্বগুণ আশ্রয় করতে বলা হল কেন?

সত্ত্বগুণের ফলে মানুষ জ্ঞান ও সুখ কামনা করে সংসারাবদ্ধ হয়, এটা তো চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবানই বলেছেন।

'গীতারহস্যের' প্রণেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে নিত্যসত্ত্বস্থো মানেও ত্রিগুণাতীত হওয়া। কেননা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের দ্বারাই ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। এই অর্থ স্বীকার করে নিলে আর এক বিপত্তি দেখা দেয় যে উভয়ই যদি অভিন্নার্থ হয় তা হলে একই শ্লোকের মধ্যে ভগবান কেন পুনরুক্তি করেছেন। আচার্য শংকর এবং রামানুজ উভয়েই 'নিত্যসত্ত্বস্থো'কে তিনগুণের অন্যতম সত্ত্বগুণ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু যথার্থ সমাধান করতে পারেননি। নিত্যসত্ত্বস্থের প্রসঙ্গে তিনি বলেন— 'তুমি নিত্যই সত্ত্বগুণে থাকিতে অগ্রে চেষ্টা কর।' *('গীতা', রামদয়াল মজুমদার অনুদিত, ২য় অধ্যায়, ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা)* অর্থাৎ তিনিও সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু এটা ভগবান কৃষ্ণের অভিপ্রেত নয়। কারণ তিনি চতুর্দশ অধ্যায়ের ৫, ৬ সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্টই বলেছেন—

> 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
> নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।। ৫।।
> তত্রসত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
> সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। ৬।।

হে মহাবাহো! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সর্বদেহী আত্মাকে দেহের সঙ্গে আবদ্ধ করে থাকে। হে অপাপবিদ্ধ অর্জুন! এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ সর্বপ্রকাশ স্বভাব, দুঃখ রহিত এবং নির্মল হওয়াতে তা দেহী পুরুষকে সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে বন্ধন জন্মায়। অর্থাৎ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এই প্রকার অভিমান পুরুষে যুক্ত হয় এবং তাকে আবদ্ধ করে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের অনিষ্টকারক এই গুণকে আশ্রয় করার উপদেশ 'নিত্যসত্ত্বস্থো' এই পদে থাকতে পারে না।

এই আপাতবিরুদ্ধ অর্থের অসঙ্গতি এইভাবে দূর করা যেতে পারে। নিত্যসত্ত্বস্থের অর্থ নির্মল সত্ত্বে অবস্থিত হও এরকম করা সঙ্গত। নির্মল সত্ত্ব বলতে বুঝায় নিরপেক্ষভাবে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান। অর্থাৎ ভালোর প্রতি আকর্ষণ এবং মন্দর প্রতি বিকর্ষণ না থাকা। সুখ- দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত হতে উপদেশ দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ে নির্মল সত্ত্বে অবস্থান কর এটাই সারমর্ম। অতএব 'নিত্যসত্ত্বস্থো' এরকম বললে 'নিস্ত্রৈগুণ্যোভব' এর সঙ্গে আর কোন বিরোধ থাকে না।

এটা ছাড়া এই অধ্যায়ের ৪০ সংখ্যক শ্লোকের 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ' এই অংশে পরিদৃশ্যমান 'মহাভয়' পদটির অর্থ সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি বলে মনে হয়। 'নিস্কাম কর্মযোগ মোক্ষমার্গের অনুকূল, এই কর্মযোগে কোন প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না। এর অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়'— এটা সরলার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হল মহাভয় কী? আচার্য শংকর, জ্ঞানেশ্বর, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীধর স্বামী প্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাখ্যাকার মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার, অতুলচন্দ্র সেন, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ সকলেই সংসারে পুনরাবর্তন রূপ যে ভয় তথা মৃত্যুভয় তাকেই মহাভয় বলেছেন। কিন্তু কর্মযোগের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানে এই ভয় কীভাবে দূর হবে সেই বিষয়ে সকলেই নীরব। কিন্তু 'মহাভয়' যদি এই অর্থে গ্রহণ করা যায় যে কোন কিছু না পাওয়া এবং পেয়ে হারাবার যে ভয় তাই মহাভয়, তা হলে উক্ত অসংগতি থাকে না। কারণ কর্মের ত্রিবিধ দোষ-কর্মে আসক্তি, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মে কর্তৃত্ব বোধ, তা থেকে মুক্ত যে নিষ্কাম কর্ম তার অনুষ্ঠান আরম্ভ করলে আরম্ভ করা রূপ অল্প কর্মেই মহাভয় দূর হয়ে যায়। নিষ্কাম কর্মের কোনো সীমা বা শেষ নেই। কর্মের শেষ যখনই হয় তখনই ফলাকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মে তা না থাকায় এর অল্প অনুষ্ঠানেই এই মহাভয় দূর হয়।

তৃতীয় অধ্যায় — 'কর্মযোগ'

অর্জুনের প্রকৃতি জ্ঞান পিপাসুর মত নয়। মহাভারতকার তাঁকে কর্মী রূপে পরিচিত করেছেন। কর্মের যথার্থ পথ কী? কোন্ পথে কর্ম করলে অধিক শ্রেয় লাভ হবে এটাই তার বিচার্য। অর্জুন আগেই 'শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)* ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গুরু যদি ক্রমান্বয়ে উপদেশগুলো প্রদান করতেই থাকেন এবং শিষ্যের তাতে কোনো রূপ আগ্রহই প্রকাশিত না হয় তবে সেই উপদেশ নীরস হতে বাধ্য। তাই অর্জুন প্রকৃত শিষ্যের মতো কর্মের প্রকৃত পথ কি তা জানবার জন্য প্রশ্ন করলেন— 'হে কেশব! তোমার মতে যদি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় তা হলে আমাকে হিংসাত্মক এই যুদ্ধে নিয়োজিত করছ কেন?' দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে— 'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়' ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ সমাধিনিষ্ঠ বুদ্ধিকেই কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছেন আবার পরক্ষণেই অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। কাজেই অর্জুন সংশয়াবিষ্ট হয়ে উপরিউক্ত প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে ভগবান্ বললেন যে মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া

যায়। এক শ্রেণীর লোকের সাংখ্যমার্গীয় জ্ঞানযোগে এবং কারো বা ভক্তিমার্গীয় কর্মযোগে নিষ্ঠা আছে। উভয় পথেই মোক্ষলাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যের সমর্থন উপনিষদে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩১৭তম অধ্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত এক-দু'টির উল্লেখ করা হচ্ছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

'নিত্যোহ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ।।'

('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)

অর্জুনকে কর্মে প্রেরণা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ভগবান বললেন যে কর্ম না করলেই মানুষ কর্মের ত্রিবিধ দোষ মুক্ত কর্মরহিতাবস্থা লাভ করতে পারে না আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধিলাভ হয় না কারণ কর্ম না করে কেউই ক্ষণকাল থাকতে পারে না। মানুষের প্রকৃতি তাকে কর্ম করতে বাধ্য করে। তবে সেই কর্ম যতদূর অনাসক্তভাবে করা যায় ততই ইষ্ট লাভ হয়। ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়। কর্ম না করা অপেক্ষা শাস্ত্র বিহিত কর্মসম্পাদনই উত্তম। কারণ কর্ম না করলে তো জীবনই ধারণ করা যায় না। ভগবানের আরাধনা ব্যতীত অন্য অভিপ্রায়ে কৃতকর্ম মানুষকে বন্ধন দশাগ্রস্ত করে। অতএব হে কৌন্তেয় তুমি অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করে যাও। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে মনুষ্য সকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। জীব সৃষ্ট হল। কিন্তু শরীর ধারণের জন্য নিতান্তপক্ষে আহার্য গ্রহণ রূপ কর্ম করতেই হবে। কর্ম সকাম নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম কর্মের ফল স্বর্গপর্যন্ত এবং নিষ্কাম কর্মে হয় মোক্ষলাভ। তাই ব্রহ্মা বলেছিলেন এই যজ্ঞ অভীষ্টানুযায়ী ভোগ প্রদান করুক। যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ প্রীত হন। দেবরাজ প্রীত হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন শস্য উৎপন্ন হয়। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের এই আদান-প্রদান সম্পর্কে উভয়ের পরম কল্যাণ হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ তাঁর 'ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা' গ্রন্থে লিখেছেন — 'পরস্পরম ভাবয়ন্তঃ শ্রেয় পরমবাপ্সথ— এই অপূর্ব বাণীটি শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই দিচ্ছেন। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার সম্পর্কও আজকাল 'পরস্পরম ভাবয়ন্তঃ' এই তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁরা পরস্পর চিরশত্রু ছিল। আগে লৌহ

যবনিকা এই দুই দেশকে তফাতে রাখত, পরে বংশ যবনিকা, তাও এখন সরে যাচ্ছে। এই হলো সুস্থ আন্তর্জাতিক মানবিক শৃঙ্খলাবোধের গোড়াপত্তন। এই বোধটি দিব্য সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জগতকে দিয়েছিলেন; এটিই হলো যজ্ঞভাব। এই যজ্ঞবোধকে দৃঢ় কর, তবেই আমরা সুখী হব; একে দুর্বল করলে আমরা উপদ্রবের মধ্যে পড়বো। এই যজ্ঞ কেবল মানুষের সঙ্গে মানবের সম্পর্ক নিয়ে নয়, এই যজ্ঞ ভাবনায় মানবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কও বাদ পড়ে না।' দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভোগ্যসকল তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করে যে ভোগ করে সে অবশ্যই চোর। সর্বদা যাঁরা নিজের উদর পূর্তির জন্য পাক করেন, তাঁরা অন্যকে বঞ্চিত করার ফলে পাপ ভোজন করেন। পরম্পরাক্রমে এটাই দেখা যোয় যে সর্বব্যাপী পরমাত্মা কর্মেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে অনাসক্ত চিত্তে কর্মের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

'তিনি গেছেন, যেথায় মাটি কেটে
করছে চাষা চাষ।
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।'

('রবীন্দ্র রচনাবলী', ১১শ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, পৃ. ৯৪)

ভগবান বলছেন যে, এই পারম্পর্য যাঁরা অনুসরণ না করেন, হে পার্থ! ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেই পাপাত্মাগণ বৃথাই জীবন ধারণ করেন। পরন্তু যিনি বাইরের বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করে আত্মাতেই তৃপ্ত হয়েছেন তাঁর পক্ষে কর্ম করা বা না করা দু'টোই সমান। এমন কর্ম নেই যা করলে বা না করলে তার কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। অতএব তুমি আসক্তিশূন্যভাবে কর্ম করে যাও তবেই পরম কল্যাণ লাভ করতে পারবে। জনক প্রমুখ জ্ঞানীগণ কর্মের দ্বারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সাধারণ লোক তাঁদের অনুসরণ করে থাকে। হে অর্জুন ! আমার পাওয়ার বা না পাওয়ার কিছুই নেই তাও কর্ম করি কারণ আমি কর্ম না করলে সাধারণ লোক আমার অনুসরণ করবে তা হলে অসংযমতার জন্য সমাজে বর্ণ সংকরের সৃষ্টি হবে এবং প্রজা সাধারণ ধ্বংসের মুখে পরবে। জ্ঞানিগণ আমার মতো অনাসক্তভাবে কর্ম করে বিপথগামী অজ্ঞান মানুষদের স্বপথে আনবেন। প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ এবং তম এই গুণত্রয়ের বশীভূত না হয়ে এরাই সকল কাজের নিয়ামক এই বোধ হলে জ্ঞানিগণ গুণ ও কর্মে আর আসক্ত হন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে ফল কামনা ত্যাগপূর্বক শোকহীন

হয়ে যুদ্ধ কর, কারণ এরকম মানুষই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। যে ব্যক্তি আমার এই মতের দোষ অনুসন্ধান করে এর অনুসরণ করেন না তার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে জানবে। সাধারণত সকল মানুষই স্বীয় প্রকৃতির অনুকূলে চলেন। জ্ঞানিগণ ও স্ব স্ব স্বভাবানুসারেই কর্ম করেন। এর অন্যথা সম্ভব নয়। কিন্তু হে অর্জুন, তুমি কদাচ রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না কারণ এরা জীবের শ্রেয়লাভের পরিপন্থী। তুমি যুদ্ধকার্যে ব্যবসিতমনা, অতএব যুদ্ধই তোমার স্বধর্ম, এর যথাযথ অনুশীলন করতে চেষ্টা করবে আর জানবে অপরের ধর্ম আপাত ভালরূপে প্রতীয়মান হলেও তা ভয়াবহ। স্বকীয় পন্থার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করতে করতে মৃত্যুও বরণীয়।

অর্জুন এতক্ষণ ভগবানের উপদেশ সকল নিবিষ্ট মনে শুনলেন এবং ভাবলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাক্যই তো যথার্থ। এটা যে আমি না জানতাম তাও নয়, তথাপি যেন কে বলপূর্বক আমাকে অন্যায় কার্যে নিযুক্ত করে। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন— 'জীব কার প্রেরণায় পাপ কার্য করে থাকে?'

ভগবান্ বললেন— 'শ্রেয়ঃ লাভের পরিপন্থী রজগুণজাত কাম এবং ক্রোধকেই মানুষের প্রকৃত শত্রু বলে জানবে। কামনা চরিতার্থ না হলেই ক্রোধের জন্ম হয়। অগ্নিকে যেমন ধূম, দর্পণকে যেমন ময়লা গর্ভকে যেমন চর্ম্ম আবৃত করে রাখে ঠিক তেমনই কাম জ্ঞানকে আবৃত করে থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর পরম শত্রু এই কাম। কাম ইন্দ্রিয়গুলো মন এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই দেহাভিমানী জীবকে আবদ্ধ করে। অতএব হে অর্জুন! তুমি ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশকারী পাপস্বরূপ এই কামকে বিনষ্ট কর। আমাদের এই স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলো শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকে যিনি শ্রেষ্ঠতর তিনি আত্মা। এইরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধির দ্বারা মনকে সমাহিত করে কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।' এই পর্যন্তই তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য।

এই অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ'। গীতার মধ্যে এই অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় গীতার প্রথম দিককার অধ্যায়গুলোর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছেন। এমন কি তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলো না থাকলেও তার গুরুত্ব খর্ব হত না। কিন্তু এই অমূলক ধারণা করা যথার্থই অসমীচীন। তৃতীয় অধ্যায় গুরুত্বের দিক দিয়ে যথেষ্ট এটা নির্বিবাদ, কিন্তু এটাই সর্বস্ব নয়। অর্জুনকে আত্মীয় বধে পরাঙ্মুখ দেখে পূর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে স্বধর্মের স্বরূপ ভগবান ব্যক্ত করেছেন। এটাও প্রতিপাদিত হয়েছে যে নিষ্কাম বা সমবুদ্ধিতে কর্ম করাই অধিক শ্রেয়। স্থিতধীর স্বরূপও বলা হয়েছে। সমবুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা শ্রেয় তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। সমবুদ্ধি

এবং কর্মের মধ্যে সংঘাত হলে যে কর্মই জয়ী হবে তা বলা হয়নি। অর্জুনের এই সংশয় অপনোনের জন্য 'কর্ম তোমাকে করতেই হবে' এই তত্ত্ব বক্ষ্যমান অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হয়েছে। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

'অত্রোপায়ঃ কর্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।
হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্‌গুণত্বেন কীর্তিতঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ১ম ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১০)

অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত করার প্রধান উপায়রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্মযোগ উপদিষ্ট এবং জ্ঞানযোগ ও তার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। অতএব 'কর্মযোগ' এই নাম সার্থক হয়েছে। কর্মযোগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে—শক্তিক্ষয় নিবারণ করা। যোগ হচ্ছে—কর্ম করবার কৌশল। কর্ম বিশেষে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান—অল্পও নয়, অধিকও নয়। ফলকামনা না করলে সেটি হয়। মনে কর, ফলের দিকে যদি মন দিয়ে অকৃতকার্য হল, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তিক্ষয় হল। কর্মযোগ বলছে, শক্তিক্ষয় করো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সারভাগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্মযোগের এই শিক্ষা। যতটুকু শক্তি প্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, ততটুকু করেছ কি না সর্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই, সেটার জন্য মাথা খুঁড়ে হা-হুতাশ করে শক্তিক্ষয় করো না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্বদাই ঐরূপে ক্ষয় হয়। কাজেই কর্ম করবার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেইজন্য কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাও। *('গীতাতত্ত্ব', স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ৬২)*

এই অধ্যায়ের ৩৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে— সকলেই নিজ নিজ প্রবৃত্তির দ্বারা চলতে হতে বাধ্য এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করেন, কিছুতেই এর অন্যথা করা সম্ভব নয়। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় শাস্ত্রে যে কর্তব্য বিষয়ে বিধিনিষেধ রয়েছে তা কি অর্থহীন ? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ শাস্ত্র ভগবদ্‌বাক্য, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উপদেশ, নিশ্চয়ই তাঁরা অর্থহীন বাক্য বলেননি। তা হলে এর মীমাংসা কী ? পরবর্তী ৩৪ নং শ্লোকে যা বলা হয়েছে তা ৩৩ নং শ্লোকের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন। ৩৪ নং শ্লোকের অর্থ হল— 'হে অর্জুন। ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণ এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এই উভয়ের বশীভূত হয়ো না, কারণ এটা কল্যাণের পরিপন্থী।' এখানে আর এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। পূর্ব শ্লোকে ভগবান বললেন যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতির দ্বারা চলতে বাধ্য হবে, এর অন্যথা করা যায় না, যাবে না। এটা স্বতসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হল। তার পরেই আবার বলা হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের

প্রিয় ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তুমি অনুরক্ত হয়ো না এবং অপ্রিয়ের প্রতি তুমি বিরক্ত হয়ো না।' আমরা যে, কোনো বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত হই তা কি আমাদের প্রকৃতির অনুবর্তন নয়? তাই যদি হয় তা হলে শ্লোক দু'টির অর্থ পরস্পর বিরোধী বলেই প্রতিপন্ন হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু ভগবান্ নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধী কথা বলেননি। তা হলে এর সামঞ্জস্য কী? বর্তমানে তাই আলোচিত হচ্ছে।

শাস্ত্রোপদেশের প্রধান কথাই হল অধিকারবাদ। সেই অধিকার নির্ণয় করেন গুরু। গুরু হবেন 'শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ' অর্থাৎ বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ। গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে — 'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)* তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করবেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে গুরু হবেন তত্ত্বদর্শী এবং ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। শিষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান যিনি অবগত হতে পরেন তিনিই যথার্থ গুরু। অতএব শিষ্যের অধিকার বিচার করে গুরু বিধিনিষেধ করে থাকেন। এখানে যে 'রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না' এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা অধিকার বিবেচনা করেই অর্জুনকে ভগবান বলেছেন। ইহা নির্বিচারে সকলের জন্য নয়। অর্থাৎ অনধিকারীর জন্য নয়। প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা দেখতে পাই, অধিকারী নির্ণয় করে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে— অনধিকারীকে শাস্ত্রের উপদেশ করবে না। গীতায় বলা হয়েছে—

'ইদং তে নাতপস্কায় না ভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক)

অর্থাৎ আমার এই উপদেশ তপস্যাহীন ব্যক্তিকে কদাপি বলবে না, অভক্তকেও বলবে না। এটা শ্রবণ করতে যার শ্রদ্ধা নেই তাকেও বলবে না এবং মনুষ্য বুদ্ধিতে যাঁবা আমাকে অবজ্ঞা করে তাদেরকেও বলবে না।

তা হলে এটাই প্রতিপাদিত হচ্ছে যে ৩৪ নং শ্লোকে যে ভগবান রাগদ্বেষের বশীভূত হতে নিষেধ করেছেন তা সর্বসাধারণের জন্য নয়, যিনি অধিকারী তাঁর জন্যই। অতএব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ব্যর্থ নয়। অধিকার নির্ণয় করেই শাস্ত্রার্থ প্রয়োগ করতে হবে। অতএব অধিকারবাদই হল উভয় শ্লোকের সামঞ্জস্যের ভিত্তিভূমি।

এই অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'

অর্থাৎ পরধর্ম উত্তমরূপে সম্পাদিত হলেও তা অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্মই শ্রেয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে— পরধর্ম— যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ তা আমার দ্বারা

সুসম্পন্ন হবে কীভাবে? আর যা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হয় তা আমার পক্ষে পরধর্ম হবে কেন? স্বভাবের যা অনুকূল তাই স্বধর্ম এবং যা প্রতিকূল তাই পরধর্ম। অতএব আমার স্বভাবের যা প্রতিকূল কর্ম আমি কিছুতেই তা সুসম্পন্ন করতে পারব না, এটাই তো যুক্তিসিদ্ধ। তা হলে 'স্বনুষ্ঠিতাৎ' শব্দটির সঠিক অর্থ কী তাই আলোচ্য।

'অনুষ্ঠান' শব্দের অর্থ আয়োজন। এই অর্থে এর প্রয়োগ প্রায়শই দেখা যায়। পূজা-পার্বণাদিতে পূজারী ব্রাহ্মণ ছাড়াও পূজা আয়োজন করার জন্য পৃথক লোক নিযুক্ত হয়। গৃহ-সংমার্জন, আসন সংস্থাপন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি কাজ তারাই করে থাকেন। সাধারণত অব্রাহ্মণ ব্যক্তি এই কাজে নিযুক্ত হন। আয়োজন সম্পাদিত হলে প্রায়ই বলা হয় যে অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই। অর্থাৎ আয়োজন সুসম্পন্ন হয়েছে। তারপরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূজা সম্পন্ন করেন। এটাই তার স্বধর্ম। অমন্ত্রজ্ঞ অব্রাহ্মণ কর্তৃক আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও পূজা করা তার পরধর্ম বলে অকর্তব্য। আয়োজনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বা ব্রাহ্মণ্যের স্বধর্মের কোনো যোগ নেই। অতএব অব্রাহ্মণ আয়োজনকারী পূজা করতে গেলে তার ফল— 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হবেই। তাই বলা হয়েছে তোমার যা স্বধর্ম তা প্রথমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তাই তুমি করে যাও। কর্মমাত্রই চেষ্টা সাপেক্ষ। চেষ্টার অর্থ হল পুনঃপুনঃ করা, ভুল হলে তার সংশোধন করা। এভাবে সংশোধনের ফলে কাজটি অবশেষে সুসম্পন্ন হবে।

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই চরণের অর্থ হল স্বধর্ম পালনে প্রথমে যদি ভুল ত্রুটি করাও হয় তথাপি ভাল কারণ চেষ্টার ফলে অবশেষে তা সুসম্পন্ন হবেই। অর্থাৎ স্বধর্ম বিহিত কর্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন করতে বলাই ভগবানের অভিপ্রায়। কিন্তু পরধর্ম যা স্বভাববিরুদ্ধ তা শতবার চেষ্টার ফলেও সুসম্পন্ন হবে না।

চতুর্থ অধ্যায় - 'জ্ঞানযোগ'

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে তাকে দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সাধারণত মনে হতে পারে যে অর্জুনকে হিংসাত্মক যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত করার জন্য এই কর্মের মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করেছেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। এই অধ্যায়ের সূচনাতেই এই সংশয় নিরসন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বাম্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ।'

অর্থাৎ 'এই যোগ যা তোমাকে বলেছি এবং বলব তা একবারে নূতন নয়।

এটাই আমি সূর্যকে, সৃষ্টির পূর্বে বলেছিলাম। তিনি তা আত্মজ মনুকে বলেছিলেন এবং মনু নিজের পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। কিন্তু সর্ববিধ্বংসী মহাকালের বশে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, বর্তমানে তারই উদ্ধারের জন্য তোমাকে আবার বলছি কারণ তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং পরম সখা। প্রকৃতপক্ষে যা শাশ্বত সত্য তা অনাদিকালের, এর কোনো ক্ষয় নেই। কেউই নিজেকে এর স্রষ্টা বলে দাবি করতে পারেন না। তাই কবি বলেন—

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা
শত শতাব্দীর।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬ সংস্করণ, পৃ. ৪৭৮)

যিনি যথার্থ গুরু তিনিই এই সত্যের প্রকৃত সন্ধান প্রদান করতে পারেন। এই কর্মযোগের পারম্পর্য মহাভারতের শান্তি পর্বে এভাবে বলা হয়েছে—

'ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোক ভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ।।
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপঃ।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৩৪৮ অধ্যায়, ৫১-৫২ শ্লোক)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত কর্মযোগের এই পরম্পরা অর্জুন সুবোধ বালকের মত স্বীকার না করে প্রশ্ন করলেন যে— 'তোমার জন্ম সূর্যের জন্মের অনেক পরে হয়েছে সুতরাং তুমি সৃষ্টির সূচনাতেই কিভাবে তাঁকে এই যোগের উপদেশ দিয়েছিলে?' অর্জুনের এই সংশয় দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'আমি জগতের হিতসাধনের জন্য যতবার জন্মগ্রহণ করেছি তা আমার মনে আছে কিন্তু তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে নেই।' প্রকৃতপক্ষে জীব যে দেহ ধারণ করে তার মূলে থাকে তাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ কিন্তু ভগবানের দেহধারণ এই প্রারব্ধের ফল নয়। তাই তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে সাধনায় মানুষের হয় উত্তরণ কিন্তু ঈশ্বরের হয় অবতরণ। মানুষ তার কর্মফল ভোগ এবং প্রারব্ধের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। এর দ্বারা ভগবানের অবতারবাদ এবং নিষ্কাম কর্ম সাধন দু'টোই সূচিত হচ্ছে। যা হোক শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ অর্জুনের নিকট উদ্‌ঘাটিত করে বললেন যে— 'আমি প্রাণিগণের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় মায়া শক্তির দ্বারা জন্মগ্রহণ করি। যখনই ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় সেই সময়ে আমি দেহধারণ করে সাধুগণের রক্ষা এবং পাপিগণের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করে থাকি। হে অর্জুন! যিনি আমার এই স্বরূপ যথার্থভাবে জানতে পারেন তিনি সংসারের ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করেন। যিনি যেভাবে আমার উপাসনা করেন তিনি সেইভাবেই আমার অনুগ্রহ লাভ করেন। আমি যে পথ অবলম্বন করি মনুষ্যগণ সেই পথেরই অনুসরণ করেন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৭-১১ শ্লোকের ভাবানুবাদ)* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী গীতার মহত্ত্ব এবং ঔদার্যকেই প্রকাশ করেছে। উপাসনা পদ্ধতির তারতম্য থাকলেও যে যার সাধ্যমত যে রকম উপাসনা করেন ঈশ্বর তাঁকে সেভাবেই অনুগ্রহ করেন। শৈবদের নিকটে যিনি শিব, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, মুসলমানের নিকট আল্লা, খ্রীস্টানের নিকট খ্রীষ্ট বা পরিত্রাতা, ত্রিভুবনেশ্বর তিনিই হরি। তিনি অচল অটল গিরি শিখরের ন্যায় বিরাজ করেন। পর্বতারোহনের বিভিন্ন ধর্মরূপ পথগুলি তাতেই এসে মিলিত হয়। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে উপরিউক্ত ধর্মগুলোর উদ্দেশ্য কিন্তু এক রকম নয়, যদিও পরমেশ্বর'কে সকলেই স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম স্বর্গ লাভকেই চরম মনে করেছে, মুসলমানগণ বেহশ্‌ত এর উপরে আর কিছুই দেখেননি, বুদ্ধদেব নির্বাণকেই চরম লাভ বলে মনে করেছেন। কিন্তু হিন্দুগণ চেয়েছেন অমৃতত্ত্ব লাভ করতে, ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করতে, মোক্ষধামে যেতে, সাধনমার্গে যা স্বর্গ বা বেহেশ্‌ত হতে অনেক উর্দ্ধে। এখানেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। যা হোক শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে বলছেন— গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি ঠিকই তথাপি আমি অকর্তা কারণ কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না যেহেতু কর্মফলের প্রতি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার এই স্বরূপ যিনি জানেন তিনিও কর্মের দ্বারা বন্ধ হন না। মুক্তিকামী পূর্বপুরুষগণ আমার এই স্বরূপ জেনে কর্ম করেছেন, তুমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্ম কর। দেখ অর্জুন! কর্ম কি আর অকর্মই বা কি এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের বুদ্ধিও সকল সময় যথার্থ নিরূপণ করতে পারে না। অতএব কর্ম কিভাবে করতে হয় এখন তাই তোমাকে বলছি। এই কর্মের তত্ত্ব খুবই দুর্বিজ্ঞেয়, কাজেই কর্ম এবং অকর্ম দু'টিরই স্বরূপ তোমাকে জানতে হবে। যিনি ফললাভের কামনা বর্জন করে কর্ম করেন প্রকৃতপক্ষে তিনি অকর্তাই হন। আর যিনি কর্ম বর্জন করে বসে থাকেন তিনিও কর্মই করেন। কারণ বসে থাকা, শ্বাস গ্রহণ এবং বর্জন করা ইত্যাদি কাজ সে সব সময়ই করে চলে। অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা কর্মফল দগ্ধ করেছেন এবং কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছেন তিনিই পণ্ডিত। ফল লাভের আশা ত্যাগ করে কর্ম করলে বস্তুত তার কিছুই করা হয় না। এই প্রকার কর্ম কেবলমাত্র কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাই করা হয় বলে কর্তাকে পাপের ভাগী হতে হয় না। যিনি অনায়াসে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সুখে এবং দুঃখে যিনি

সমভাবাপন্ন, কোনো কিছু লাভ বা অলাভে যার চিত্তবৈকল্য হয় না তিনি কর্ম করলেও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি এই সকলের অতীত হয়ে ভগবদ্ প্রীত্যর্থে কর্ম কর। কর্ম, ক্রিয়া, কর্তা সবই যিনি ব্রহ্ম বলে জানেন তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। তুমিও অন্তরে এই ভাবকেই জাগরিত কর। কোনো কোনো যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে উপাসনা করেন। আবার কেউ কেউ ব্রহ্মরূপ যে অগ্নি তাতে জীবাত্মাকে সমর্পণ করেন, আবার কেউ কেউ ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে রাখেন আবার কেউ কেউ যে বিষয়গুলোর সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় সেই বিষয়গুলো গ্রহণ করেও তাতে অনাসক্ত থাকেন। ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য লাভ করবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে তা সকলে গ্রহণ করে থাকেন। তবে ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত সকল কর্মই ব্রহ্মরূপ যজ্ঞে পরিণত হয়। কিন্তু যিনি এই প্রকার কর্ম করেন না তার ইহকাল এবং পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। সকল প্রকার যজ্ঞই কর্মের মাধ্যমে করা হয় কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্য আহূতি দিয়ে যে যজ্ঞ করা হয় তার চাইতে প্রকৃত জ্ঞানলাভরূপ যে যজ্ঞ তাই শ্রেষ্ঠ। কারণ সকল কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। অর্থাৎ অনিত্য এই সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করতে করতে যখন নিজের স্বরূপ অর্থাৎ আমি কে, কোথায় যাব, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি জানবার জন্য আগ্রহ হবে তখনই সেই জ্ঞানে সকল কর্ম বিলীন হয়ে যাবে। হে অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের সেবা করে এই জ্ঞান লাভ কর। এই জ্ঞান লাভের পর তোমার মোহ দূর হবে। তুমি তখন সমস্ত ভূতবর্গকে প্রথমে তোমার আত্মায় এবং পরে আমার মধ্যে দর্শন করবে। তুমি এই জ্ঞানরূপ বৈতরণীর সাহায্যে পাপসিন্ধু অতিক্রম করতে পারবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে তেমনই তোমার জ্ঞান পাপপূর্ণ সকল কর্মকে ভস্মীভূত করবে। এই জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু ত্রিভুবনে নেই বলে জানবে। শ্রদ্ধাশীল এবং গুরুবাক্যে যথার্থ একনিষ্ঠ ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ এই জ্ঞানলাভ করে থাকেন। যিনি গুরুর উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ করেননি বা গুরুর বাক্যে সর্বদা সংশয় পোষণ করেন তিনি সুখ, ইহলোক এবং পরলোক সকল কিছু থেকেই বঞ্চিত হন। ঈশ্বরে যিনি সমস্ত কর্ম সমর্পণ করেছেন সেই আত্মজ্ঞ পুরুষকে কোনো কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না। অতএব হে অর্জুন! তুমি অজ্ঞানজাত যে সংশয় তাহাকে পরিত্যাগ করে কর্মযোগের মাধ্যমে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। এই উপদেশের সঙ্গে জ্ঞানযোগ সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীকণ্ঠের বাণী কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' থেকে— 'দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান,

এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।'

আলোচ্য অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'জ্ঞানযোগ'। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভের কর্মময় এবং জ্ঞানময় দুই পন্থাই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সমবুদ্ধিতে এবং নিষ্কাম হয়ে কর্ম করাও জ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু কর্মের প্রাধান্য তাতে লুপ্ত হয়নি। এই অধ্যায়ে অর্জুনের অজ্ঞানজনিত শোক 'আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন' এই জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন করা হয়েছে। 'জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞান', অর্থাৎ যার মাধ্যমে পরমেশ্বরের স্বরূপ, আত্মা ও দেহের ভিন্নতা ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অবগত হওয়া যায় তাই জ্ঞান। উক্ত বিষযগুলো এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হওয়ায় এটা 'জ্ঞানযোগ' নামে যথার্থ অভিহিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় — 'সন্ন্যাসযোগ'

বাস্তব জীবনে এটা দেখা যায় যে শিক্ষক মহাশয় পাঠকক্ষের প্রতিটি ছাত্রের স্বভাব অন্তরে উপলব্ধি করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন। যারা সকল সময় অনভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করে তাদের সেই কার্য থেকে বিরত হতে এবং সুবোধ বালককে আরও সুবোধ হতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সরলমতি ছাত্রগণ শিক্ষক মহাশয়ের বা গুরুর উপদেশের যথার্থতা উপলব্ধি করতে না পেরে মনে করে যে তার প্রদত্ত সকল উপদেশই যখন কল্যাণকর তখন কোন্‌টি পূর্বে আচরণ করা সঙ্গত বা অধিক মঙ্গালজনক। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনকেও দেখা যায় এই সংশয়ে দোলায়িত হতে। অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে— 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আত্মাতেই যিনি অনুরক্ত, তৃপ্ত তাঁর কোনো কর্মই নেই। পুনরায় চতুর্থ অধ্যায়ে— 'ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৪২ শ্লোক)* ইত্যাদি শ্লোকে বললেন তুমি সকল প্রকার সংশয় দূর করে কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। আগেই বলা হয়েছে যে অর্জুন নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সকল উপদেশ গ্রহণ করেননি। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সকল কিছু গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে সংশয় উদিত হলো যে কর্ম সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ এই দুই পন্থার মধ্যে তাঁর পক্ষে কোন্‌টি অধিক মঙ্গালজনক। এই প্রশ্নকেই পুরোভাগে রেখে পঞ্চম অধ্যায় শুরু হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংশয় অপনোদন করে বললেন—

'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৫ম অধ্যায়, ২ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষমার্গের অনুকূল, কিন্তু এই দু'টির মধ্যে কর্মই শ্রেষ্ঠ। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভগবান্ অধিকারী ভেদে অর্জুনের পক্ষে কর্মকেই শ্রেষ্ঠ বললেন। কারণ ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস কখনোই প্রকৃত পথ হতে পারে না। ভগবান অর্জুনকে বললেন— হে অর্জুন! যিনি অপরকে হিংসা করেন না, যাঁর কোনো কামনা নেই, সর্বত্র সমদর্শী তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। তিনিই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। বালকের ন্যায় যাঁরা অজ্ঞ তাঁরাই কর্ম ও সন্ন্যাসের মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিকে অবলম্বন করলেই মোক্ষ লাভ হয়। যিনি এই দু'টিকেই এক বলে জানেন তিনি যথার্থদর্শী। কর্মযোগ অবলম্বন করে অনাসক্ত চিত্তে যিনি সমবুদ্ধিতে কর্ম করেন তাঁরই মোক্ষ লাভ হয়, পৃথকভাবে সন্ন্যাস পালনের কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়কে ত্যাগ করলেই সন্ন্যাস হয় না, বিষয়ের প্রতি আসক্তিকেই ত্যাগ করতে হয় এবং এটাই প্রকৃত সন্ন্যাস। কেবলমাত্র কর্মযোগের অনুশীলনেই এই সন্ন্যাস লাভ হয়। যিনি জিতেন্দ্রিয়, রাগ এবং দ্বেষ যাঁর নেই, যিনি মনকে বশীভূত করেছেন সকল জীবকে যিনি নিজের আত্মার থেকে অভিন্ন মনে করেন তিনি সমস্ত কর্ম করলেও তার দ্বারা বদ্ধ হন না। জ্ঞানী ব্যক্তি সকল কর্ম করেও নিজেকে অকর্তা মনে করেন। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করায় তিনি পদ্মপত্র জলে থেকেও যেমন নির্লিপ্ত থাকে তেমনই কোনো পাপে লিপ্ত হন না। যিনি প্রকৃত কর্মযোগী তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য আসক্তি ত্যাগ করে শরীর মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে থাকেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই চিত্ত শুদ্ধি গীতাগ্রন্থের একটি মুখ্য উপদেশ। চিত্তশুদ্ধির অর্থ অহংভাবের বিনাশ ঘটান এবং আত্মজ্ঞানের বিকাশ করা। তাই শ্রুতি বলেন—

'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মাণং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।' *('ঈশোপনিষদ', ৬ শ্লোক)*

ভগবান বললেন যে, 'যোগী পুরুষ কর্মফল ত্যাগ করে ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা স্থাপন করলে শান্তি লাভ করেন। আর অযোগী পুরুষ কামনার বশবর্তী হয়ে কর্মফলে আসক্তি প্রকাশ করেন এবং বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রিয়গুলোকে জয় করেছেন

তিনি মনের দ্বারাই সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করে নিজেক অকর্তা মনে করেন। সর্বজীবের নিয়ন্তা ঈশ্বর সকল জীবের কর্মফল প্রাপ্তির একমাত্র নিয়ামক। অর্থাৎ জীবের কোনো স্বাধীনতা নেই। সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি থাকায় জীবের পাপ-পূণ্য কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি সকল দ্বৈতবোধের অতীত। জীবের জ্ঞানালোক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায় তাঁর বুদ্ধির বিভ্রান্তি জন্মে। অজ্ঞান যাঁর দূর হয়েছে তিনি সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাকে প্রকাশিত করেন।' উপনিষদের ঋষি তাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করছেন— 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমি সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবকে প্রত্যক্ষ করি' —

'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণ্ সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।' *('ঈশোপনিষদ', ১৫ শ্লোক)*

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলছেন— 'হে অর্জুন! যাঁদের জ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁদের জন্ম কর্মচক্র ছিন্ন হয় অর্থাৎ আর পূণর্জন্ম হয় না। তখন তাঁরা সর্বত্র সমভাবে দর্শন করেন। বিদ্যা ও বিনয় সংযুক্ত ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে তাঁরা কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করেন না। যাঁরা এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করেন তারাই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কখনও প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় বস্তু লাভে বিমর্ষ হন না। কারণ তাঁর বুদ্ধি স্থির। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলোতে আসক্তি পরিত্যাগ করে যিনি আত্মাতেই প্রকৃত সুখ এবং আনন্দ উপভোগ করেন তিনি ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করে অক্ষয় সুখ লাভ করে থাকেন। অতএব, হে কৌন্তেয়! বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে যে সুখ হয় তা আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং দুঃখপ্রদ। জ্ঞানীপুরুষ কখনও সেই সুখে প্রীতি লাভ করেন না।' প্রসঙ্গক্রমে এখানে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশীপুর তনয় ভক্ত প্রহ্লাদের কথা মনে করা যেতে পারে। তিনি তাঁর সাথী দৈত্যপুত্রদের বলেছেন—

'যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্
তাবন্তোহস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোক শঙ্কবঃ।।'

('বিষ্ণু পুরাণ', ১৭ অধ্যায়, ৬৬ শ্লোক)

অর্থাৎ 'হে দৈত্যপুত্রগণ! যত অধিক ভোগ্য বিষয় সংগৃহীত হয় অন্তঃকরণ ততই দুঃখার্ত হয়ে থাকে। জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে সেই পরিমাণে তাদের হৃদয়ে শোক বীজ উপ্ত হয়।' যা হোক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে— 'এই জন্মে শরীর ত্যাগ করার আগে যিনি কাম এবং ক্রোধ থেকে উৎপন্ন মনোবিকার সহ্য করতে পারেন তিনি যথার্থই যোগী এবং সর্বভূতের

মঙ্গলবিধানকারী। কামক্রোধহীন, সংযত চিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষ এই দেহে এবং দেহান্তরে ব্রহ্মেই বাস করেন। হে অর্জুন! যিনি রূপরসাদি বিষয়সমূহকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন, দু'টি ভ্রুর মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করে নাসিকার অভ্যন্তরস্থ প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুকে স্থির করেছেন এবং ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধকে বর্জনপূর্বক আত্মাতেই মনস্থির করেছেন তিনি সর্বকালেই মুক্ত পুরুষ। সেই পুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ফলভোক্তা, সর্বলোকের নিয়ন্তা ঈশ্বর, সর্ব জীবের মঙ্গলকারী বন্ধু জেনে পরম শান্তি লাভ করেন।' এই পর্যন্ত উপদেশ করে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন।

এই পঞ্চম অধ্যায় 'সন্ন্যাসযোগ' নামে অভিহিত। সম্-নি-অস—ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা 'সন্ন্যাস' পদটি নিস্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল সম্যক্ রূপে ত্যাগ। এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুনের সংশয় দেখা দিয়েছে যে সাংখ্য বা সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ না কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'কর্মযোগো বিশিষ্যতে' বলে কর্মযোগের প্রাধান্য দেখিয়েছেন। সন্ন্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয় কর্মের মাধ্যমেও সেই মোক্ষই লাভ হয়। কর্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা না হলে সন্ন্যাস লাভ হয় না। সুতরাং উভয়ের অভিন্নতা যখন প্রতিপাদিত হল তখন কর্ম ত্যাগ না করে ব্রহ্মে সকল কর্ম সমর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গাত। অর্থাৎ কামনা বাসনা ত্যাগ করে সমবুদ্ধিতে কর্ম করাই সন্ন্যাসের সামিল। এই তত্ত্বই এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হয়েছে। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন—

'নির্বায্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্মসন্ন্যাস যোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুনিমব্রবীৎ।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ১ম ষট্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১১)

অর্থাৎ কর্মযোগ ও সন্ন্যাস যোগের বিষয়ে জিষ্ণুর সংশয় নিবারণপূর্বক তিনি বলছেন — 'ইন্দ্রিয়জয়ী যতিবরই মুক্তি লাভে সমর্থ হন। অতএব তুমি সেইরূপ সন্ন্যাসই পালন কর।' অতএব এটাই দেখা যায় যে এই অধ্যায়ে কামনা বাসনার যথার্থ ত্যাগ করে কর্মপালন করার উপদেশই প্রদত্ত হয়েছে। তাই 'সন্ন্যাসযোগ' নামকরণ সার্থক হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় — 'ধ্যানযোগ'

ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবার কথা উপনিষদে বলা হয়েছে। 'এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ

সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।' উপনিষদের এই আলোকে গীতাতেও কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নির্বগ্নির্ণচাক্রিয়।।'

অর্থাৎ 'যজ্ঞীয় কর্ম এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলে না। যিনি কর্মফলের আশা না করে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই। হে পাণ্ডব! যাঁর মন থেকে ফলকামনা দূর হয়নি তিনি কখনও যোগী হতে পারেন না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই যোগাবস্থা লাভ করা যায়। যখন পুরুষ সকল সংকল্প পরিত্যাগ করে বিষয় তৃষ্ণা বর্জন করেন তখন তাকে 'যোগারূঢ়' বলা হয়। তিনি নিজের চেষ্টার দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করেন। নিজ আত্মাকে তিনি অবসাদগ্রস্ত করেন না, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যাঁর ইন্দ্রিয়গুলো সংযত, আত্মা তাঁর নিকট বন্ধু কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষের আত্মা শত্রুর ন্যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হলে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদিতে চিত্ত অবিচলিত থাকে। এই রূপে যিনি মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর এবং সুবর্ণে সমদর্শী হন তিনিই প্রকৃত যোগী পুরুষ।'

এরপর শ্রীকৃষ্ণ যোগীপুরুষের অনুষ্ঠেয় ধ্যানযোগের প্রণালী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন— 'যোগী পুরুষ সর্বদা নির্জন স্থানে থেকে দেহ ও মনকে সংযত করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকেন। এইভাবে স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মায় যুক্ত করেন। পবিত্র স্থানে উপযুক্ত আসন রচনা করে ইন্দ্রিয় পরবশ না হয়ে একাগ্রমনে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করবেন। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে মনস্থির করার জন্য নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। এইভাবে মনঃ সংযম করে মদ্গতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হবেন। আমার মধ্যে যে নির্বাণ ও শান্তি বিরাজ করে সংযত মন এবং সমাহিত চিত্তযোগী তা প্রাপ্ত হন। আহার, বিহার, নিদ্রা জাগরণ সকল কিছুই যাঁর নিয়মাধীন যোগই তাঁর দুঃখ নাশ করে। চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত্বে এসে নিজ আত্মাতে অবস্থান করে তখন সকল কাম্যবস্তুর প্রতি স্পৃহা লুপ্ত হয়। সেইরূপ পুরুষই প্রকৃত যোগী। বায়ুহীন স্থানে প্রদীপের শিখায় যেমন কোনো কম্পন থাকে না তেমনই আত্ম যোগের অভ্যাসকারী সংযত চিত্ত পুরুষ নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়ে নির্মল আনন্দ লাভ করে, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত পরম সুখ উপলব্ধ হলে

আর আত্মজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে না, যাকে লাভ করলে যোগী অপর কোনো লাভকেই আর অধিক মনে করেন না এবং যাতে অবস্থিত হলে যোগী দুঃখে অবিচলিত থাকেন, হে অর্জুন! তাঁকে দুঃখনাশক যোগ বলে জানবে। সকল অবসাদ বিসর্জন দিয়ে নিষ্ঠার সাথে দৃঢ় বুদ্ধির দ্বারা এই যোগের অভ্যাস করা উচিত। হে অর্জুন! সকল ভোগ্য বস্তুই দুঃখদায়ক হয়, তা মনে রেখে কামনা বর্জন করবে। রজোগুণ দূর হওয়ায় যিনি পাপমুক্ত হয়েছেন সেই স্থিরচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ যোগীপুরুষই উত্তম সুখ লাভ করেন। সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্ত চিত্তপুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় প্রতিষ্ঠিত দেখেন।' এরপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত বৎসল রূপ প্রকাশ করে বলেছেন— 'যিনি আমাকে সর্বত্র এবং সমস্ত জগৎ আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেন তাঁর নিকট আমি কখনো অদৃশ্য হই না এবং তিনিও কখনো আমার দৃষ্টির অন্তরালে যান না। অণু-পরমাণু থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সর্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব আছে, এই বিশ্বাসে সকল প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে যিনি ভজনা করেন তিনি সকল অবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন। হে পার্থ! তিনি আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।' প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করা রূপ যে যোগের কথা ভগবান বললেন সেই বিষয়ে অর্জুনের মন নিঃসংশয় নয়। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন— 'মন চঞ্চল স্বভাব এবং ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভকারী, বায়ুকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে বশীভূত করাও অসম্ভব মনে হয় না কি?' ভগবান বলিলেন— 'নিঃসন্দেহে মন চঞ্চল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকেও বশীভূত করা যায়। অসংযত চিত্ত পুরুষের পক্ষে তা দুস্কর, কিন্তু যিনি যত্ন পরায়ণ হয়ে মনকে স্থির করেছেন তিনি যোগাবস্থা লাভ করতে পারেন।' অর্জুনের তাতেও সন্তোষ না হওয়ায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন— 'যাঁরা যত্নপূর্বক যোগ অভ্যাস করতে করতে তা থেকে ভ্রষ্ট হন দেহান্তে তাদের কি গতি হয়? তাঁরা ছিন্ন মেঘ খণ্ডের মতন বিনষ্ট হয় না কি?' ভগবান অর্জুনের সংশয় অপনোদনের জন্য বললেন— 'ইহলোকে বা পরলোকে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির বিনাশ হয় না। হে তাত! কল্যাণকারী ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহান্তে সেই লোকপ্রাপ্ত হন যা পুণ্যকর্মকারীদের লভ্য। সেই লোকে দীর্ঘকাল বাস করে মনুষ্য লোকে পবিত্র স্বভাব শ্রীসম্পন্ন লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা তিনি জ্ঞানযোগীদের কূলে জাত হন যা মনুষ্য লোকে খুবই দুর্লভ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সহচর তাঁর অন্যতম রসদদার রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর মৃত্যুর পর জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে মথুরবাবুর কি মুক্তি হয়ে গেল? তার উত্তরে তিনি বলেন যে মথুর কোথাও রাজা-টাজা হয়ে জন্মাবে, যোগভ্রষ্টের তাই হয়, গীতাতেও তাই আছে। যা হোক্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন— 'তিনি

পূর্বজন্মে ব্রহ্মবিষয়িনী যে বুদ্ধি লাভ করেছিলেন এই জন্মে তার সিদ্ধির জন্য অধিকতর যত্নবান হন। তিনি সকাম বেদমার্গকে পূর্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা অতিক্রম করে উর্ধ্বগতি লাভে সমর্থ হয়ে থাকেন। কিন্তু যোগভ্রষ্ট যোগী ছাড়া অন্যান্য যোগিগণ বহু প্রযত্নের ফলে নিষ্পাপ হয়ে বহু জন্ম পরে সিদ্ধমনোরথ হন। হে অর্জুন! যোগিগণ তপস্বীর চাইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ, কর্মীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব আমার ইচ্ছা তুমি যোগী হও। অধিকন্তু যোগিগণের মধ্যে যাঁরা সশ্রদ্ধ এবং মদ্গতচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করেন তারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে আমার অভিমত।' এই পর্যন্ত উপদেশের পর ষষ্ঠ অধ্যায় পরিসমাপ্ত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের নাম "ধ্যানযোগ"। পূর্বে চিত্তশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ হলেও ধ্যান ছাড়া কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের মাহাত্ম্য এবং সাধন প্রণালী সবিস্তারে কথিত হয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন—

'চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ১ম ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৪৪)

এই অধ্যায়ের অন্তিম পর্যায়ে ভগবান্ বললেন যে ধ্যানাভ্যাসকারী যোগিগণ ভ্রষ্ট হলেও সন্ন্যাসী ও কর্মী অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ। বিশেষত তিনি যদি কৃষ্ণ ভক্ত হন। অর্থাৎ যোগিগণের মধ্যে আবার ভক্তই শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ 'হে অর্জুন তুমি আমার ভক্ত হও। এই অধ্যায় সম্পর্কে আনন্দগিরি তাঁর টীকায় বলেন— 'তদনেন অধ্যায়েন কর্মযোগস্য সন্ন্যাসহেতোর্মর্য্যাদাং দর্শয়তা সাঙ্গং চ যোগং বিবৃণতা মনোনিগ্রহোপায়োপদেশেন যোগভ্রষ্টস্য আত্যন্তিকনাশ শংকাবকাশং শিথিলয়তা ত্বং পদার্থাভিজ্ঞস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বোক্তা বাক্যার্থজ্ঞানাৎ মুক্তিরিতি সাধিতম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-র আনন্দগিরি টীকা, ৪৭ শ্লোক)* অতএব এই অধ্যায়ের 'ধ্যানযোগ' এই নামকরণ সার্থক হয়েছে, এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায় — 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ'

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে যোগিগণের মধ্যে যিনি একান্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্বভাবতই সংশয় দেখা দেয় যে যাঁকে ভক্তি বিনম্রচিত্তে ভজনা করতে হবে তিনি কিরকম? এই সংশয়কে পুরঃ সর করে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' নামক সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বর তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'হে অর্জুন, আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত এবং আমার শরণাগত

ব্যক্তি কিরূপে আমাকে জানতে পারবে তা শ্রবণ কর, এটা জানলে তোমার আর কিছুই জানবার থাকবে না। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে অষ্টসিদ্ধিলাভের জন্য কেউ কেউ যত্ন করেন। তাঁদের মধ্যে আবার ক্বচিৎ কেউ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারেন। হে পার্থ! আমার এই দৃশ্যরূপা যে প্রকৃতি তার ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ইত্যাদি অষ্টপ্রকার ভেদ আছে। কিন্তু তা আমার অশ্রেষ্ঠা প্রকৃতি, তা থেকে ভিন্ন জীব নামক অন্য এক প্রকৃতি আছে যা অশ্রেষ্ঠা প্রকৃতির থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তাই এই জগৎকে ধারণ করে আছে। সমস্ত ভূতবর্গই আমার এই প্রকৃতিদ্বয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং আমাকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলে জানবে। হে ধনঞ্জয়! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আমার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো কারণ নেই। সুক্ষ্ম সূত্রে মণিগণ যেমন গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতে এই জগৎ আশ্রিত আছে। জলে যে রস, চন্দ্র সূর্যে যে দীপ্তি, সকল বেদ বাক্যের শ্রেষ্ঠ যে প্রণব, আকাশে যে শব্দ, মনুষ্যে যে পৌরুষ তা সমস্তই আমার রূপ বলেই জানবে। পৃথিবীর পূণ্য গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীর তপস্যা সবই আমি। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজও আমার থেকে উৎপন্ন। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! বলবান পুরুষদের কামনা এবং রাগবিহীন যে বল এবং জীবকুলের মধ্যে ধর্মের অনুকূল যে কাম তাও আমি। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক যাবতীয় পদার্থ আমার থেকে উৎপন্ন। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে আবদ্ধ নই বরং তারাই আমার মধ্যে অবস্থিত জানবে। আমার সত্ত্ব, রজঃ এবং তম এই ত্রিবিধ গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। কিন্তু ত্রিগুণাতীত আমার নির্বিকার রূপ সকলে জানতে পারে না। অসুরভাব সম্পন্ন বিবেকহীন নরাধমগণ আমাকে লাভ করতে পারে না কারণ আমার এই মায়া শক্তিকে অতিক্রম করা কঠিন। একমাত্র আমার শরণাগত হলেই এই মায়া অতিক্রম করা যায়। কুকর্মকারী নরাধমদের জ্ঞান মায়ার দ্বাবা মোহগ্রস্ত হওয়ায় অসুরভাবাপন্ন হয়ে তারা আমার শরণাগত হয় না। হে অর্জুন! চার প্রকার পুণ্যাত্মা লোক আমার ভজনা করেন, বিপন্ন, আত্ম-জ্ঞানলাভেচ্ছু, ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী। এই চার প্রকারের মধ্যে সতত আমার ধ্যান নিরত এবং কেবল আমাতেই ভক্তিযুক্ত জ্ঞানী পুরুষই শ্রেষ্ঠ। যদিও এরা সকলেই মহান তবুও আমার প্রতি যাঁর চিত্ত নিবিষ্ট সেই জ্ঞানী পুরুষ আমাকেই শ্রেষ্ঠগতি রূপে গ্রহণ করার ফলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়। বহুজন্মের সাধনার পুণ্যে জ্ঞান লাভ করে — 'চরাচর বিশ্বজগৎ বাসুদেবময়' জেনে প্রিয়ভক্ত আমাকেই ভজনা করে। কিন্তু এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। স্বীয় অভিলাষ অনুসারে যে ভক্ত যে দেবমূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা করে সেই দেবমূর্তির প্রতি সেই ভক্তের অচলা ভক্তি আমি প্রদান করি। আমারই বিধান

অনুসারে সেই ভক্ত সেই দেবতার থেকে তাঁর অভিষ্ট লাভ করে থাকে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই স্থানেই শ্রেষ্ঠত্ব। যখন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগুলো অপরাপর ধর্মকে অবহেলা করে তাঁদের কাফের জ্ঞানে হত্যা করছে, অখ্রীষ্টানদেরকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে স্বমতে আনছে তখনই শাশ্বত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ এই গীতাতেই বলা হয়েছে—

'যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

ভগবান বলছেন যে দেবপূজা সকাম কর্ম। সেই জন্য এর দ্বারা লব্ধ যে ফল তা বিনাশশীল। দেবতার উপাসকগণ কিন্তু দেবতাকেই প্রাপ্ত হন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন। অল্পবুদ্ধি পুরুষেরা আমার অতিন্দ্রীয় অক্ষয় সর্বোত্তম স্বরূপকে না জেনে আমাকে মরণশীল সাধারণ মানুষের মত মনে করে, কারণ আমার প্রকৃত স্বরূপ যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত তা সকলের নিকট প্রকাশিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অব্যয় স্বরূপ না জেনে চেদীরাজ শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা করলে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব বলেছিলেন—

'কৃষ্ণ এবহি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্যহি কৃতে, বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম।।
জয়ংতু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে।।'

('মহাভারত', সভা পর্ব, ৩৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ এই অব্যয় কৃষ্ণ থেকেই সর্বলোক সমুৎপন্ন হয়েছে। এই চরাচর সর্বভূত শ্রীকৃষ্ণ কৃত। এই মূঢ়মতি শিশুপাল কৃষ্ণকে চিনতে পারেনি বলে সর্বদা তাঁকে এমন কুবাক্য বলেছে। এটাই কৃষ্ণের স্বরূপ। ভগবান অর্জুনকে বলছেন— 'ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে প্রকাশিত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুকেই আমি জানি। কিন্তু আমাকে কেউই জানতে পারে না। কারণ দেহধারণ করার সময় সকল জীব ইচ্ছা এবং দ্বেষ থেকে উৎপন্ন লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাত মোহের দ্বারা হতবুদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু যে সকল পূর্ণকর্মকারী পুরুষের পাপ বিনষ্ট হয়েছে তাঁরা এই মোহ থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় ব্রতের সাথে আমার ভজনা করে। আমাকে আশ্রয় করে যাঁরা জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন তাঁরা সেই সর্বাতীত ব্রহ্মকে, সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থাৎ জীবতত্ত্বকে এবং সরহস্য সমস্ত কর্মকে অবগত হন। এই সকল সমাহিত চিত্ত পুরুষগণ মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন।

এই অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ'। এখানে সর্বপ্রকারে ভগবৎশরণাগতির কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত ব্যক্তিগণ কর্মত্যাগ না করে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে পরমপদ লাভে সমর্থ হন তা আগের অধ্যায়গুলোতে বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন এই অধ্যায়ে তা সবিশেষ বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটি প্রধান উপায় রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন — 'ভক্ত, ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়; প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। জগতের মা-কে পেলে ভক্তিও পাবে জ্ঞানও পাবে। ভাবসমাধীতে রূপদর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং নাম, রূপ থাকে না। *(সূত্র : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, মৌসুমী প্রকাশনী, পৃ-১২২)*

আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন —

'কৃষ্ণ ভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানে যোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ২য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ. পৃ. ৩১)

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াসেই লাভ করতে পারেন, এটাই বিজ্ঞানযোগ নামে সপ্তম অধ্যায়ে সম্যকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিশেষ জ্ঞানলাভের পাত্র কে হবে এই অধ্যায়ে তা চিহ্নিত করায় এটা 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' নামে যথার্থ কথিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় — 'অক্ষরব্রহ্মযোগ'

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তাঁর ভক্তগণই সমগ্র অধ্যাত্ম বিষয় সমস্ত কর্মতত্ত্ব এবং সনাতন ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হন। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে চেয়ে যে প্রশ্ন করেছেন তাই অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হয়েছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন — 'হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম, সেই অধ্যাত্ম এবং সেই কর্ম কী? অধিভূত আর অধিদৈবই বা কাকে বলে? এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? মৃত্যুকালে তোমাতে সমাহিত চিত্ত যোগিগণ তোমাকে কি ভাবে জানতে পারেন?' প্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন যে, 'এই জগতের মূল কারণ হল ব্রহ্ম তিনি যখন জীবরূপে অংশত বিরাজ করেন তখন তাকেই বলে অধ্যাত্ম। সর্বজীবের সমৃদ্ধিকারক দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞই কর্ম। হে নরোত্তম! পরিবর্তনশীল পদার্থগুলো অধিভূত

এবং আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভই অধিদৈবত, আর এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। তাই মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই লাভ করেন। যে পুরুষ যে কথা স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন সর্বদা সেই ভাবকে ধ্যান করার ফলে মৃত্যুর পরে তিনি তাই লাভ করেন। অতএব আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধই কর তাহলে অন্তকালে আমাকেই লাভ করবে।' কিভাবে মহাপুরুষ বা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বললেন সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, পরমাণু হতে সূক্ষ্ম, সকলের পালক, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, প্রকৃতিরও পরে স্থিত পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন তিনি মৃত্যুকালে স্থিরচিত্ত এবং ভক্তি ও যোগ বলে যুক্ত হয়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে নিবদ্ধ করে সেই পরম জ্যোতিস্বরূপ পুরুষকে লাভ করেন। হে অর্জুন! বেদজ্ঞগণ যাঁতে প্রবিষ্ট হন, যাঁকে পাবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন সেই অক্ষর বিষ্ণুপদ তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে মনকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করে প্রাণবায়ুকে মস্তকের উপর ধারণ করে আত্মসম্বন্ধীয় সমাধিতে থেকে ওঁ এই একাক্ষর বেদবাক্য উচ্চারণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। হে পার্থ! সর্বদা অনন্য চিত্ত হয়ে যিনি সবসময় আমাকে স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত পুরুষের পক্ষে আমি সহজলভ্য হই। এবং আমাকে পেয়ে সেই মহাত্মাগণ পরম সিদ্ধিরূপ মোক্ষ লাভ করেন। ব্রহ্মলোক হতে আরম্ভ করে সমস্ত লোক পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। একসহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার যে এক দিন তার আগমনে চরাচর সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয় এবং এরকম এক রাত্রি আগত হলে ঐ অব্যক্ত লয় হয়। কিন্তু এই অব্যক্ত হতে শ্রেষ্ঠ এবং তা হতে ভিন্ন আর এক অব্যক্ত সনাতন বস্তু আছেন যিনি সমস্ত ভূতগ্রাম নাশপ্রাপ্ত হলেও বিনষ্ট হন না। হে পার্থ! যাঁতে সমস্ত ভূত গ্রাম অবস্থিত আছে, যাঁর দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ব্যপ্ত হয়ে আছে, আমি সেই পরম পুরুষ, আমি একান্ত ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য অন্যথা নয়। যেখানে প্রয়াণ করে যোগিগণ আর সংসারে পুনরাবর্তন করেন না এবং যেখানে গেলে সংসারে আগমণ করতে হয় তা আমি বলছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয় মাস যেখানে থাকেন ঐ রাস্তায় ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ গমন করে ব্রহ্মকে লাভ করেন। আর যেখানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের ছয় মাস ও মাসাভিমানী দেবতাগণ আছেন ঐ রাস্তায় গমন করে যোগীপুরুষ চন্দ্রের মতো জ্যোতির্ময় লোকপ্রাপ্ত হন এবং সংসারে পুনরাবর্তন করেন। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুই পথ জাগতিক জীবের জন্য নিত্য বর্তমান আছে। শুক্লে গমনকারীর পুনরাগমন হয় না এবং কৃষ্ণে গমনকারী পুনরাবর্তিত হন। অতএব তুমি এটা জেনে যোগযুক্ত হও। যোগী এই অনাবৃত্তি পুনরাবৃত্তির কথা জেনে যজ্ঞ তপস্যা

ও দানে যে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট হয়েছে তা অতিক্রম করে সকলের আদিতে স্থিত পরম বিষ্ণুপদ লাভ করে থাকেন।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অধিভূত অধিযজ্ঞ অধিদৈবত প্রভৃতির উল্লেখ করায় অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন এই সকলের স্বরূপ জানতে চাইলেন। সেই অনুরোধে ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করলেন এই তত্ত্ব যে — 'সকল প্রাণীতে, সকল দেবতাতে সমগ্র অধ্যাত্মে, সকল লোকে এবং সকল যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত আছেন অনাদি অব্যয় এক পরমাত্মা। তিনি অক্ষর এবং জগতের মূলভূতকারণ পরম ব্রহ্ম। এই পরম বিষ্ণুপদ একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় অন্যথায় নয়।' সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে অধিভূত অধিদৈবাদি ভেদজ্ঞান প্রকৃত নয়। এই অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁকে লাভের উপায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়ায় অষ্টম অধ্যায়ের নাম হয়েছে 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ'। অক্ষর অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নেই। অব্যয়, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্মই হলেন অক্ষর পুরুষ। আর ক্ষর হল ক্ষয়শীল এই বিশ্বপ্রপঞ্চ।

নবম অধ্যায় — 'রাজযোগ'

এই অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান অর্জুনকে বললেন যে, যে জ্ঞান তিনি উপদেশ করবে তা অতিশয় গোপনীয়, একমাত্র বিশ্বাসভাজন ও সশ্রদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিই এটা লাভের যোগ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আরও বললেন যে — এটা বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, পবিত্র, ধর্মে প্রবৃত্তিদায়ক এবং অক্ষয় ফলপ্রদ। এই ধর্মে যাঁদের শ্রদ্ধা হয় না তাঁরা আমাকে না পেয়ে মরণধর্মশীল এই সংসারে পরিভ্রমণ করে। আমি অব্যক্ত হলেও আমার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সমস্ত ভূতবর্গ আমাতে অবস্থিত হলেও আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই। আমার ঈশ্বরভাব দেখ, আমার স্বীয় স্বরূপে ভূতসকল বর্তমান নেই কিন্তু তাঁদের উৎপন্ন এবং বর্দ্ধিত আমিই করি। সর্বত্রগামী বেগবান্ বায়ু যেমন আকাশে নিত্য অবস্থিত আছে সেরকম আমাতেই সমস্ত ভূতবর্গ অবস্থিত আছে এটা তুমি নিশ্চিতরূপে জান। কল্পান্তে ভূতসকল আমার মধ্যে বিলীন হয় এবং কল্পারম্ভে আমি তাদের উৎপন্ন করি। আমি স্বীয় শক্তিরূপা প্রকৃতিতে থেকে ভূতসকলকে পরিচালিত করে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করে থাকি। হে ধনঞ্জয়! আমি উদাসীনের মতো থাকি সেই জন্য এই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমারই অভিন্নশক্তি, প্রকৃতি চরাচর জগৎ উৎপন্ন করে থাকে। আমি যে সর্বভূতের মহেশ্বর, তা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জেনে আমাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করে থাকে। মোহদায়িনী আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করার জন্য তাদের আশা, কর্ম, জ্ঞান সমস্তই নিষ্ফল হয়। কিন্তু মহাত্মাগণ দৈবপ্রকৃতিকে আশ্রয় করে, মদ্গতচিত্তে সমস্ত ভূতের

আদি কারণ স্বরূপ আমাকে জেনে আমারই ভজনা করেন। কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করেন, কেউ কেউ অভেদ বুদ্ধিতে, কেউ কেউ ভেদবুদ্ধিতে কেউ বা সর্ব্ব্যাপীরূপে আমার ভজনা করেন। এরপর ভগবান্ অর্জুনের কাছে স্বরূপ ব্যক্ত করে জানালেন যে তিনি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, যজ্ঞীয় ঘৃত, অগ্নি এবং হোমও তিনিই। তিনি এই জগতের পিতা, মাতা, পালনকর্তা, পিতামহ, একমাত্র জ্ঞাতব্য, পবিত্র ওঁকার, ঋগবেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। তিনিই জীবের কর্মফল স্বরূপ, আশ্রয়, সুহৃদ, সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তা এবং অবিনাশী বীজস্বরূপ। সূর্য হয়ে তিনি পৃথিবীকে তাপদান করেন। পৃথিবী হতে জলকে আকর্ষণ করে পুনরায় বর্ষণ করেন। সকল প্রকার জীবের জীবন এবং মৃত্যু সবই তিনি। বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে যারা স্বর্গে গমন করেন তার পুণ্যফল ক্ষীণ হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিকধর্ম আশ্রয় করে কামনাযুক্ত পুরুষগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপ গতিপ্রাপ্ত হন। আর তাঁর সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে থেকে যাঁরা তাঁর উপসনা করেন তাদের এই জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু তিনিই দান করেন। ভগবান বললেন — 'হে কুন্তিতনয়! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্য দেবতার পূজা করে তাঁহারা না জানিয়া আমারই ভজনা করে। আমিই যে সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু তাহা তাঁহারা জানে না বলিয়াই এই সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন। দেব পূজকেরা দেবলোক, পিতৃ পূজকেরা পিতৃলোক, ভূত পূজকেরা ভূতলোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু আমার পূজকেরা লাভ করেন আমাকেই। ভক্তির সাথে যে ব্যক্তি আমাকে, পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি প্রদান করে ঐ সকল সংযত চিত্ত ভক্তের উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি।' প্রসঙ্গত বলা যায় যে গীতা প্রবক্তার সর্বাধিক মহত্ত্ব এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। দেবপূজার জন্য কোনো বিধি বা নিষেধের বেড়াজাল এখানে নেই। অপরকোনো ধর্মগ্রন্থে বা কোনো ধর্মপ্রবক্তার কণ্ঠে এমন সরল, সাম্যজনক স্পষ্টোক্তি প্রকাশিত হয়নি। যা হোক তিনি পুনরায় বলছেন — 'অর্জুন! তুমি যা ভোজন কর, যা হবন কর যা দান কর এবং যা তপস্যা কর তার সকল কিছু আমাকে অর্পণ কর। এভাবে কর্ম করলে কর্মের বন্ধন এবং শুভাশুভ ফলভোগ থেকে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে। আমি সমস্ত ভূতবর্গে সমবুদ্ধি সম্পন্ন আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় বলতে কেউ নেই। পরন্তু ভক্তির সাথে যাঁরা আমাকে ভজনা করেন তাঁরা আমাতে অবস্থানে করেন এবং আমি তাদের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করি। অত্যন্ত দূরাচারিও আমার ভজনা করে সাধু বলিয়া গণ্য হন। আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না এটা তুমি নিশ্চয় জানবে। হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনি সম্ভূত ব্যক্তিও আমার আশ্রয় গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। অতএব তুমিও এই দুঃখময় সংসারে থেকে আমার ভজনে প্রবৃত্ত হও। তুমি আমার ভক্ত হয়ে

আমাতে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ করে মনকে আমার শরণাগত করলে আমাকেই লাভ করবে।'

নবম অধ্যায়ের নাম 'রাজযোগ'। পথের রাজা যেমন রাজপথ যোগের রাজা বা গুহ্যবিদ্যার রাজাও এই রাজযোগ। সমগ্র মহাভারতের কেন্দ্রস্থলে যেমন 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' অবস্থিত তেমনই গীতার মধ্যবিন্দু এই নবম অধ্যায় বা রাজযোগ। গীতায় কর্মফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ত্যাগ শব্দে নিষেধ বুঝায়। এই অধ্যায় সশ্রদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরে আত্মসর্ম্পনের কথা বলা হয়েছে। সেই ঈশ্বর কিরূপ তাও ভগবান্ এই অধ্যায়ে বলেছেন। কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করে জরা মরণশীল অনিত্য সংসারে থেকে জীবনের মাধুর্য যাঁর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় সেই রাজবিদ্যা এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হয়েছে। এই রাজবিদ্যা অতিশয় গুহ্য। কিন্তু ঈশ্বরের পরম ভক্ত তাঁতেই কর্মফল সমর্পণ করে ভগবৎ শরণাগতির দ্বারা তা লাভ করতে পারে। গীতার এই জ্ঞান স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি পাপজন্ম যাঁর তাঁর কাছেও প্রকাশিত হয়। এইখানে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা গীতার শ্রেষ্ঠতা ও সার্বজনীনতা। এই অধ্যায় পাঠের পর গীতা বক্তার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে মনোলোকে উদ্ভাসিত হয়। তাই শ্রীধর স্বামী বললেন —

'নিজ মৈশ্বয্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভূত বৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুত ঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ২য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০২)

অর্থাৎ এই অধ্যায়ে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবলে স্বীয় আশ্চর্য ঐশ্বর্য ও দুর্লভ ভক্তির অপূর্ব বৈভব বিবৃত করলেন। নবম অধ্যায়ের আলোচনায় বিনোবা ভাবে বলেছেন — 'বেদের আলমারিতে আবদ্ধ মোক্ষ ভগবান রাজপথে আনিয়া দিয়াছেন। মোক্ষের কেমন সহজ সরল পথ। যাহার যেরূপ সহজ, যাহা স্বধর্ম-কর্ম, সেবা-কর্ম তাকেই যজ্ঞময় করিয়া দিন না কেন? অন্য যাগযজ্ঞের দরকার কী? আপনার দৈনন্দিন সহজ সেবাকর্মকেই যজ্ঞের রূপ দিন। তাহাই রাজমার্গ।' ***('গীতা প্রবচন', আচার্য বিনোবা ভাবে, ১৯৬১ সংস্করণ, পৃ. ১০৬)***

গীতার নবম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে একটু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তাই এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হচ্ছে —

"মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন — 'হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র

এবং পাপ যোনিসম্ভূত লোকও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। এটাই সরলার্থ। কিন্তু শংকরাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি পাপ জন্মাগন আমাকে আশ্রয় করতঃ পরম গতি লাভ করে। আচার্য কৃত এই অর্থ আপাত শোভন বলে বিবেচিত হয় না। কারণ বৈশ্যকে সকল শাস্ত্রে দ্বিজ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। কৌটিল্য শূদ্রের কার্য নির্ধারণ করে বলেছেন দ্বিজাতি শুশ্রূষা।' দ্বিজাতি বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বুঝায়। তাদের পাপ কর্মা বলার কারণ কী? অধিকন্তু যে নারী বৈদিক ও বৈদিকোত্তর কালে সমাজে একমাত্র শ্রদ্ধার আস্পদ ছিল যাদের সম্বন্ধে মনু বলেছেন—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।'

মহিলাদের পাপযোনি বলে মনে করা মধ্যযুগের সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়। তাই সেই হৃদয়হীন, ভিত্তিহীন, অবৈদান্তিক কুসংস্কারকে বর্তমান যুগধর্ম বিসর্জন দিয়েছে। উপনিষদ কেবল মাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদ করেনি, ভারতীয় অভারতীয়র মধ্যেও সীমারেখা তুলে দিয়েছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকেই-- 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করেছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই মনুষ্যত্ব বোধ সুপ্ত অবস্থায় আছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সুপ্ত মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটিয়ে মানুষকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গীতা তাই সুন্দরভাবে বলেছে যে মানুষের জাতপাত, জন্মকর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সব ঘুচে যায় একমাত্র ভক্তিতে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়েছে যে ভক্তি কখনো নারী-পুরুষ বা উচ্চ-নীচের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। কারণ তারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের পুত্র।

তাদের পাপজন্মা বলা নিঃসন্দেহে অনুচিত। পাপজন্মাগণের সঙ্গে স্ত্রী বৈশ্য শূদ্রের নাম উল্লেখিত হল কেন? এরকম প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক।

তদুত্তরে বলা যেতে পারে যে স্ত্রী জাতি অত্যন্ত দুর্বল এবং ভোগ প্রিয়। বর্তমানে নারী যদিও পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সর্বত্র লাভ করছে তথাপি তার দুর্বলতা বিদূরিত হয়নি। এটা তার প্রকৃতিগত। প্রকৃতির ধর্মই হলো পুরুষকে বিষয় সুখ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ করা এবং বিষয় সুখে মত্ত থেকে ঈশ্বর অনুধ্যান থেকে বিচ্যুত করা। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কর্মফলের ভোগের মানুষের জন্যই জন্মগ্রহণ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অপেক্ষা পূর্বজন্মের পাপাধিক্যবশত বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির আপেক্ষিকভাবে নিকৃষ্টজন্ম লাভ হয়। সেই জন্মোচিত কর্ম ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে করলেই তাঁদের মুক্তি। এই মুক্তি আসতে পারে একমাত্র ভক্তির মধ্য দিয়ে। ভগবান গীতায়

বলেছেন তাঁর ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না। পাপাচরণকারিগণের প্রতিও অসীম করুণাময়ের কারুণ্যেরই নিদর্শণ এই শ্লোকটি।

দশম অধ্যায় — 'বিভূতিযোগ'

এই অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁর বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্যগুলো বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুনের ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণে আগ্রহ দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন যে— 'আমি এই জগতের আদি কারণ কিন্তু তা দেবতারা পর্যন্ত অবগত নন। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত এবং পরমেশ্বররূপে জানেন তিনি মোহমুক্ত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। জীবের অন্তরস্থিতভাবগুলো আমার থেকেই উৎপন্ন। সপ্তঋষি এবং মনুগণ আমার থেকেই জাত এবং জগতের সমস্ত প্রজা তাঁদেরই সৃষ্টি। যিনি আমার এই সব বিভূতি জানেন তিনি অবিচলিত সমাধির দ্বারা আমাতেই যুক্ত হন। আমি সমগ্র জগতের মূল সৃষ্টি। আমার থেকেই সমস্ত সৃষ্টি প্রবর্তিত হচ্ছে। যাঁরা আমাকে ভজনা করে, আমাকে লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয় আমি উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানরূপ মোহ অন্ধকার বিনাশ করি।' শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তিনি যে বিরাট সর্বব্যাপী তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকে কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাবে বা কোন্ কোন্ বস্তুর উপাসনায় তিনি তৃপ্ত হবেন তা জানতে চেয়ে অর্জুন বললেন যে— 'হে ভগবান্ তুমি যে যে বিভূতির দ্বারা এই সমস্ত লোক ব্যপ্ত করে অবস্থান করছ তোমার নিজের সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্ রূপে কীর্ত্তণ কর, কেবলমাত্র তোমার বাক্যামৃত শ্রবণে আমি তৃপ্ত হতে পারছিনা।' তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আমার অনন্ত বিভূতির সবগুলোর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রধান প্রধান বিভূতিগুলো তোমাকে বলছি। সমস্ত ভূতবর্গের হৃদয়স্থিত আত্মা অমিই। তাদের আদি এবং অন্ত কারণও আমি। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্ময়ী পদার্থগুলোর মধ্যে মরিচী এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক এবং পর্বতগুলোর মধ্যে আমি সুমেরু। পুরোহিত প্রধান বৃহস্পতিই আমি. সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জলাশয়গুলোর মধ্যে আমি সাগর' মহর্ষিগণের মধ্যে মহাতেজা ভৃগুই আমি। শব্দগুলোর মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁঙ্কার। যজ্ঞগুলোর মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবর পদার্থের মধ্যে হিমালয় বৃক্ষগুলোর মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল। অশ্বগণের মধ্যে আমি সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত উচ্চশ্রবা নামক অশ্ব, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত. মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা, অস্ত্রগুলোর মধ্যে

বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, সন্তান উৎপাদনের হেতুরূপে আমি কাম এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্তনাগ, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং নিয়ন্তাগণের মধ্যে আমি যম। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে কাল, পশুর মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। আমি বেগবানগণের মধ্যে বায়ু, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে দাশরথি বা পরশুরাম, মৎসগুলোর মধ্যে তিমিঙ্গিল এবং স্রোতস্বতীগুলোর মধ্যে আমি ভাগীরথী। আমি জাগতিক সকল উৎপন্ন বস্তুর সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে আত্মবিদ্যা, বর্ণগুলোর মধ্যে অ-কার, সমাসগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সকল কর্মফলের আমি বিধাতা। আমি সংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি বৃহৎসাম, ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসগুলোর মধ্যে আমি গায়ত্রী, দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ষড় ঋতুর মধ্যে বসন্তই আমি। আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়, বেদজ্ঞ মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব ও কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য। আমি সর্বভূতের বীজস্বরূপ, আমার সত্ত্বা ব্যতীত চর এবং অচর কোনো বস্তুই থাকতে পারে না।' অতএব—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবসম্।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

অর্থাৎ জাগতিক সকল বস্তুর মধ্যে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন তা আমার তেজ এবং প্রভাবের বলে সম্ভূত হয়েছে জানবে। হে অর্জুন! পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আমার বিভূতি জেনে কোনো লাভ নেই বরং এটাই জেনে রাখ যে — 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নংমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।' অর্থাৎ এই বিশ্বজগৎ, আমার শক্তির এক খণ্ডাংশ দ্বারাই ধারণ করে আছি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তিনি বলেছেন যে গীতায় আছে যার মধ্যেই দেখবে ভালো কিছু তা সঙ্গীতেই হোক, লেখাপড়াতেই হোক জানবে তা ঈশ্বরের প্রকাশ।

এই অধ্যায়ের নাম 'বিভূতিযোগ'। অধ্যায়ান্তর্গত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে স্বকীয় বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য ভক্তপ্রবর অর্জুনের ইচ্ছানুসারে বিবৃত করেছেন। সাধারণ মানুষের চঞ্চল চিত্ত সর্বদা ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে বাইরে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সেজন্য যাতে ঈশ্বরের শ্রীচরণ থেকে চিত্ত স্খলিত না হয় সেই কারণে জাগতিক তেজময় পদার্থসকলে ঈশ্বরের উপস্থিতির

সংবাদ বিঘোষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

'ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তের্বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টি বিধানায় বিভূতিদর্শমেহব্রবীৎ।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ২য় ষট্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৪৩)

'এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে বিভূতিযোগ, এ যোগটি অপরিহার্য। ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ-অশুভ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, আলো-আঁধার ভগবানের সকল বিভূতির সহিতই সমানভাবে আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে ইহার মধ্যে একটা উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তু সকলের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশের একটা ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি রহিয়াছে, একটি এমন স্তরবিন্যাসের রহস্য রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে নীচের ছদ্মবেশ সকল হইতে ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া লইয়া যায়।' *('গীতা নিবন্ধ', ঋষি অরবিন্দ, শ্রীঅলিন বরণ রায় অনূদিত, ১৯৭১, পৃ. ৩৫)* এটাই বিভূতিযোগ সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের অভিমত।

একাদশ অধ্যায় — 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ'

দশম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্যগুলো সবিস্তারে শুনেছেন। এতে তাঁর হৃদয়াকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত বিশ্বচরাচর যে পরমেশ্বরের সৃষ্টি, তিনিই যে এর মূখ্য কারণ তা সমস্তই তিনি অবগত হয়েছেন। এই জগৎ, ঈশ্বর তাঁর একাংশের দ্বারা আবৃত করে আছেন। এই সকল ভগবদবাক্য অর্জুন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বিনীতভাবে বললেন— 'হে প্রভো! যদি তুমি মনে কর আমি তোমার বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ তাহলে সেই অক্ষয় রূপ আমাকে দেখাও।' তা শুনে ভগবান সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন যে যা অপরে দেখতে অসমর্থ সেই অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক রূপ তুমি দেখ, কিন্তু এই রূপ তুমি তোমার চর্মচক্ষে দেখতে পারবে না, সেই জন্য তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি। অর্জুন দেখলেন যে সেইরূপ অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, অনেক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য, দিব্যমালা ও বস্ত্রপরিহিত সর্বাঙ্গ সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্ত। সহস্র সূর্য্যের যুগপদ্ প্রভার মতো তাঁর দীপ্তি। অর্জুন এখানে সমগ্র বিশ্বজগৎকে একত্রিত দেখলেন এবং সেরূপের বর্ণনা করতে লাগলেন। 'হে বিশ্বেশ্বর! তোমাব মধ্যে আমি সকল দেবতা ঋষিদের দেখছি, তোমার চোখ, মুখ, বাহু সবই অনন্ত, তুমি অক্ষয়, শাশ্বত ধর্মের তুমি রক্ষক, তুমিই আদি পুরুষ। আদি

অন্ত মধ্যহীন তোমার সূর্য চন্দ্র দুই চক্ষু, মুখ তোমার জ্বলন্ত অগ্নি, এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ত্রিভুবন প্রকম্পিত হচ্ছে। দেবতাগণ তোমার স্তব করছেন, রুদ্র আদিত্যাদি সবাই বিস্মিতনেত্রে তোমাকে দেখছেন। কালানল সদৃশ বিশাল দন্তবিশিষ্ট তোমার মুখ দেখে আমি ভীত হয়েছি। তোমার ঐ ভয়াল মুখগহ্বরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা সকলে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। নদীর স্রোত যেমন সতত সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নির প্রতি ধাবিত হয় তেমনি সকলে তোমার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তুমি তোমার লোলজিহ্বার দ্বারা তা লেহন করছ। হে উগ্ররূপী! তুমি কে? আমাকে যথার্থ বল আমি তোমাকে প্রণিপাত করছি, তুমি প্রসন্ন হও। বর্তমানে তুমি কি কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছ আমি তা জানতে ইচ্ছা করি।' তাঁর উত্তরে ভগবান বললেন যে 'আমি লোকক্ষয়কৃত অনন্ত মহাকাল, লোক সংহারের জন্য এখন প্রবৃত্ত হয়েছি।' ভগবানের এই অমৃত বাক্য শ্রবণ করে অর্জুন তাঁর স্তুতি আরম্ভ করলেন এবং বন্ধুভাবে তাঁর সঙ্গে যদি কোনো কদর্য ব্যবহার করে থাকেন তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। অর্জুন ভয়ঙ্কর সংহারক রূপ দেখে ভীত হয়ে ভগবানের পূর্বদৃষ্ট চতুর্ভূজরূপ পুনরায় প্রদর্শন করতে প্রার্থনা জানালেন। তারপর ভগবান বললেন— 'হে অর্জুন। তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে তা কেউ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ইত্যাদির দ্বারা দর্শন করতে পারেনা। কেবল ভক্তির দ্বারা এইরূপে আমাকে দেখতে এবং অন্তিমে আমাতে প্রবেশ করতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। হে পাণ্ডব! যিনি সকল কর্ম আমারই মনে করে থাকেন, আমাকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য বলে মনে করেন, আমি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুতে যাঁর আসক্তি নেই, সমস্ত প্রাণীবর্গের মধ্যে কারও প্রতি যাঁর শত্রুভাব নেই একমাত্র তিনিই আমাকে লাভ করে থাকেন।'

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে এই একাদশ অধ্যায় অপূর্ব কবিত্ব মমতায় ভাস্বর। অর্জুনের ইচ্ছানুসারে ভগবান এই অধ্যায়ে তাঁর বিশ্বব্যাপী অনন্ত যে রূপ তা প্রদর্শন করেছেন। অর্জুনকে সর্ববিধ্বংসী মহাকালের রূপ দেখিয়ে জানালেন যে যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে, কারণ তিনি যুদ্ধ না করলেও সমবেত যোদ্ধাগণ কেউই জীবিত থাকবেন না। এখানে সংহারক মহাকালরূপে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে গীতা কেবল ধ্বংসের লীলাই প্রচার করেছে। প্রথমত অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে, দ্বিতীয়ত বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রসঙ্গত বলা যায় যে ধ্বংস এবং সৃষ্টি একে অন্যের পরিপূরক। ধ্বংস হয় সৃষ্টির জন্য এবং সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই কবি ভয়ংকর কালবৈশাখীর

আগমনেও হৃষ্ট চিত্তে বলেছেন—

'হোক সে ভীষণ তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ
ওরই মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।।'

('কালবৈশাখী', কবিতা, মোহিতলাল মজুমদার, পাঠ সংকলন, ১৯৭৫, পৃ. ৪২)

ভয়ংকর রূপের পরে অর্জুনের প্রার্থনা অনুসারে শান্ত সমাহিত ভগবানের শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভূজ রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। এবং স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই রূপ দর্শন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দেবগণ সহস্র কোটি যজ্ঞ করেও এর দর্শন পান না। আচার্য শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন—

'দেবৈরপি সুদুর্দশং তপোযজ্ঞাদিকোটিভি
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ২য় ষট্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৬)

ভক্তের অনন্যাভক্তির দ্বারা এই রূপ দর্শন সম্ভব হয়। অতএব বিশ্বব্যাপী ভগবানের যে সংহারক এবং সৃষ্টিকারী উভয়বিধ রূপ অবস্থিত আছে তার উভয়ের প্রদর্শন এই অধ্যায়ে হয়েছে। ভগবানের বিশ্বাত্মকরূপের দর্শন এই অধ্যায়ে প্রকাশিত হওয়ার এটা 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' নামে যথার্থই অভিহিত হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায় — 'ভক্তিযোগ'

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে সংশয়াত্মক এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ ? তদুত্তরে ভগবান বললেন যে যাঁরা একান্ত ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বররূপে আমার উপাসনা করেন সেই সগুণ উপাসকই শ্রেষ্ঠ। সমবুদ্ধিসম্পন্ন যে সকল মানুষ সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অচল, নিত্য অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরাও সগুণ ঈশ্বররূপী আমাকেই লাভ করেন, কিন্তু তাতে অধিক ক্লেশ হয় কারণ দেহধারীর পক্ষে অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করা খুবই কঠিন। যাঁরা ভক্তির সঙ্গে আমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন তাঁদের অতি শীঘ্রই আমি সংসার বন্ধন হতে মুক্তি দেই। মন আমাতে স্থির কর, বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর তা হলে আমাতেই বাস করবে। তা যদি করতে অসমর্থ হও তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা কর, তাতে যদি অসমর্থ হও তা হলে আমার প্রীতিজনক কার্য কর, তাও যদি অসম্ভব বিবেচনা কর তা হলে সর্বকর্ম আমাতে সমর্পণ কর এবং কোনো কিছুর প্রত্যাশা করবে না। কারণ অভ্যাস হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান হতেই কর্মফল ত্যাগের প্রবৃত্তি হয়। হে অর্জুন! যিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রু মিত্রে যাঁর ভেদ

জ্ঞান নেই, যিনি সমস্ত দ্বৈত বোধের অতীত যাঁর প্রিয় বস্তুতে আসক্তি এবং অপ্রিয়তে অনাসক্তি নেই, সর্বদা সন্তুষ্ট চিত্ত, স্থিরমতি, সর্বদা ভক্তিমান তিনিই আমার প্রিয়। পরন্তু যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আমাকে আশ্রয় করে আমার উপাদিষ্ট অমৃততুল্য বাক্যের আস্বাদন ও সতত অনুশীলন করেন সেই সকল ভক্তই আমার সবার্ধিক প্রিয় জানবে।

এই 'ভক্তিযোগের বক্তব্য বিষয় ব্যাপক না হলেও এটা গভীরতায় অনুপম। অর্জুনের প্রশ্ন এবং ভগবানের উত্তর, উভয়ই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই অধ্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের অবতারণা করবার হেতু সম্পর্কে শ্রীধর স্বামী তাঁর সুবোধিনী টীকায় বলেন —

'নির্গুনোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরৎ ইত্যেবং নির্নেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ২য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২০০)

অর্থাৎ 'নিগুর্ণ উপাসনা এবং সগুণ উপাসনার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করবার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হল'। অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'ভক্তিযোগ'। ভগবান এটাই এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে সাধকগণের মধ্যে যাঁরা একান্তভক্তি সহযোগে সর্বকর্ম সমর্পণ করে সমবুদ্ধিতে অবস্থান করেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। অতএব ভক্তি এবং ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হওয়ায় অধ্যায়ের নাম 'ভক্তিযোগ' শোভন হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় — 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ'

এই অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুনের কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান-জ্ঞেয়, প্রকৃতি-পুরুষ ইত্যাদির স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন — 'এই শরীর ক্ষেত্র এবং একে যিনি সম্যক্‌ভাবে জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের এই যে জ্ঞান এটাই যথার্থ জ্ঞান। এই শরীর রূপ ক্ষেত্র ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহংকার বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই চতুবিংশ তত্ত্বযুক্ত। ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিয়া যিনি তাঁকে জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইষ্ট এবং অনিষ্টে সমজ্ঞান, ভগবানে ভক্তি নির্জনে বাসের প্রবৃত্তি, আত্মজ্ঞানে সর্বদা নিষ্ঠা ইত্যাদি হল জ্ঞান, এইসবের অভাবই হল অজ্ঞান। যিনি অনাদি, তিনি পরব্রহ্ম। যাঁর হস্তপদ সর্বত্র, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় গুণের প্রকাশক, যিনি নির্গুণ হয়েও গুণের ভোক্তা যিনি সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান, যিনি সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, যিনি সকল জ্ঞানের পরপারে অক্ষয় জ্যোতিস্বরূপ, তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের দ্বারা

প্রাপ্তব্য।' এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় Sir Edwin Arnold -এর ইংরাজী অনুবাদ—

'He is within all beings – and without –
motionless, yet still moving : not discerned
For subtlety of instant presence, close,
To all, to each; yet measurelessly far,
Not manifold, and yet subsisting still
In all which lives.
the light of lights, he is in the heart of the dark
shining eternally'

('Indian Philosophy', S. Radhakrishnan, 1929, P-540)

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন — প্রকৃতি এবং পুরুষকে আদিরহিত বলে জানবে। কার্যরূপ শরীর এবং করণরূপ ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা যে কর্ম করা হয় প্রকৃতি তার কারণ। এই প্রকৃতির সাথে সংযোগের ফলে পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে। প্রাকৃতিক গুণ সকলের প্রতি আসক্তিই পুরুষের জন্মগ্রহণের কারণ। এই দেহে সকল কার্যের অনুমোদনকারী পরমেশ্বর বিরাজ করেন। তিনি এর শাসন কর্তা, তিনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর। তিনি শরীরে থেকেও নির্লিপ্ত থাকেন, একে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধক দর্শন করে থাকেন। তিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এবং সর্বব্যাপী। তখনই সাধকের ব্রহ্ম লাভ হয় যখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত ভূতবর্গকে এক পরমাত্মাতে অবস্থিত এবং তা থেকেই প্রকাশিত বলে দর্শন করেন। এইভাবে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রাণীগণের প্রকৃতি থেকে মুক্তির উপায় যিনি জ্ঞাননেত্রে অবগত হন তিনিই পরমপদ লাভ করে থাকেন।

ভক্তের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। পুরুষ এবং প্রকৃতি পরব্রহ্মের দুই অভিন্ন শক্তি। প্রকৃতির সাথে পুরুষের সংযোগে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা প্রকৃতি প্রদত্ত তিনগুণের বশীভূত হয়। এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নিচয়ের সাথে প্রকৃতি ও পুরুষ পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই শাশ্বত। এই প্রকৃতি এবং পুরুষের উপরে আছেন সনাতন ত্রিগুণাতীত এক পুরোষোত্তম। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছেন — 'দ্বাদশ অধ্যায়ে সর্বভূতের অদ্বেষ্টা ইত্যাদি শ্লোক থেকে আরম্ভ করে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর জ্ঞান নিষ্ঠা ও আচরণ প্রভৃতি বলা হয়েছে। কিরূপে তাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যথোক্ত ধর্মাচরণ হেতু ভগবানের প্রিয় হইবেন? তা নির্ণয় করার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হল।' ***('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ৩য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২)*** শ্রীধর

স্বামীও তাঁর সুরোধিনী টীকায় বলেছেন —

'ভক্তানাসহ যুর্দ্ধতা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেহথ তৎ সিদ্ধে তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ৩য় ষট্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২)

অর্থাৎ সংসার সাগর থেকে ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য এই অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হয়েছে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হওয়ায় এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে অধ্যায়টির নাম 'ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ' সার্থক হয়েছে।

চর্তুদশ অধ্যায় — 'গুণত্রয়বিভাগযোগ'

চতুর্দশ অধ্যায়ের শুভ সূচনাতেই ভগবান বললেন — 'হে অর্জুন! জ্ঞানের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে পুনরায় বলিতেছি। এই জ্ঞান আশ্রয় করে জীব আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। আমার প্রকৃতিরূপা অভিন্ন শক্তিতে আমি জীবরূপ গর্ভ সঞ্চার করায় সমগ্র ভূতবর্গের উৎপত্তি হয়। সমস্ত যোনিতে যে সকল মূর্তি উৎপন্ন হয় প্রকৃতি তাঁহার মাতৃস্বরূপা এবং আমি বীজদাতা পিতাস্বরূপ। হে পাণ্ডব! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ কেবল সুখ দিয়ে পুরুষকে সুখ এবং জ্ঞানের সাথে সংসারে আবদ্ধ করে। রজঃ গুণ রাগ স্বরূপ, তা তৃষ্ণা ও আসঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়। এই রজঃ গুণ পুরুষকে কর্মে আসক্ত করে বন্ধন জন্মায়। তমোগুণ হল অজ্ঞানজাত, সকল জীবের তা মোহ উৎপাদন করে। ইহা প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবকে সুখে, রজঃগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত্ত করে প্রমাদে পরিণত করে। যখন এই দেহ থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ন্যায়, সত্য, ধৈর্য প্রভৃতি গুণ প্রকাশিত হয় তখনই বুঝতে হবে যে তাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে। রজঃ গুণ বৃদ্ধির সময়ে লোভ, কর্মারম্ভ, প্রবৃত্তি, অশান্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ এই সমস্ত তমোগুণ বৃদ্ধির সময়ে প্রকটিত হয়। এই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে ব্রহ্মলোকে, রজঃ গুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে সংসারে এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশু জন্ম লাভ হয়। সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজস কর্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ দেহান্তে উর্দ্ধলোক, রজঃ গুণপ্রধান ব্যক্তি দেহান্তে মধ্যলোক এবং তমোগুণ প্রধান নিকৃষ্টকর্মকারী পুরুষ অধোগতি লাভ করেন। দ্রষ্টা পুরুষ যখন গুণকেই সকল কর্মের কর্তা বলে মনে করেন এবং গুণাতীত আত্মার তত্ত্ব অবগত হন তখন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। দেহের সাথে উৎপন্ন এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেই জীব ব্রহ্মানন্দ লাভ করে থাকে।' অনন্তর অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন যে, 'যারা এই

তিনগুণকে অতিক্রম করেছেন তাদের লক্ষণ কী? তাঁদের আচরণ কী প্রকার? কি উপায়েই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়?' তদুত্তরে ভগবান পুনরায় বললেন যে — 'যাঁর দ্বেষ নেই, কোনো গুণের যিনি অধীন নন, যিনি গুণের দ্বারা বিচলিত না হয়ে উদাসীনের ন্যায় থাকেন, সুখ দুঃখে যিনি সমভাবাপন্ন, সর্বদা যিনি নিশ্চলভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, মৃৎপিণ্ড, সুবর্ণ এবং প্রস্তর যাঁর কাছে সমান, প্রিয় এবং অপ্রিয় যাঁর তুল্য, স্বীয় নিন্দা বা স্তুতিতে, মানে বা অপমানে যাঁর কোনো বিরূপ ক্রিয়া হয় না, শত্রু এবং মিত্রে যিনি ভেদ করেন না, যিনি কোনো বস্তুলাভের জন্য উদ্যমশীল হন না তাঁকেই ত্রিগুণাতীত বলে জানবে। যিনি ঐকান্তিক ভক্তির সাথে আমার সেবা করে থাকেন তিনি এই গুণত্রয় অতিক্রম করে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের যোগ্য হন, যেহেতু আমাতেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে চরাচর নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হয়। এই প্রকৃতি তাঁরই অভিন্ন শক্তি, তিনিই এই প্রকৃতিতে জীবের উৎপাদন করেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে প্রকৃতির সাথে পুরুষের সংযোগের ফলে যে জীব উৎপন্ন হয় তাঁরা প্রকৃতি নির্দিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বশবর্তী হয়ে পরে। অতএব প্রকৃতি সঞ্জাত এই গুণত্রয়ের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়ে তা হতে জীব কিভাবে মুক্ত হতে পারে তা এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হয়েছে, শ্রীধর স্বামী বলেছেন—

'পুং প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গাতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ৩য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২)

অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ যে বিভিন্ন তা নিবারণ করে তাদের অভিন্নতা প্রতিপাদন পূর্বক গুণগুলোর প্রভাবে সংসারে যে বৈচিত্র্য ঘটে তা ভগবান এই অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অতএব 'গুণত্রয়বিভাগযোগ' এই নামকরণ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে সুপ্রযুক্তই হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় — 'পুরুষোত্তমযোগ'

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়গুলোতে ভগবান যে জ্ঞানের বীজ বপন করেছেন তাই বিস্তৃত করে এই 'পুরুষোত্তমযোগে' বলছেন যে, 'এই সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মত এর মূল উর্দ্ধদিকে, শাখা নিম্ন দিকে, এটা অনাদি, বেদ চারটি হল এর পত্র।' সংসার সৃষ্টির মূল যে পরব্রহ্ম তিনি উর্দ্ধদিকে অবস্থিত বলে বলা হল সংসার বৃক্ষর মূল উর্দ্ধে, এই বৃক্ষের শাখাগুলো গুণত্রয়ের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং বিষয়রূপ পল্লব দ্বারা

সুশোভিত হয়ে উর্দ্ধ অধঃভাবে বিস্তৃত রয়েছে। এইরূপে সংসারকে উপলব্ধি করতে পারা যায় কেবল বৈরাগ্যের দ্বারা। এইভাবে সংসার বন্ধন ছিন্ন করে অক্ষয় বিষ্ণুপদ অন্বেষণ করা কর্তব্য। 'যা থেকে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি নিঃসৃত হচ্ছে আমি সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করছি' এই বুদ্ধিতে ব্রহ্মপদ অন্বেষণ করতে হবে। যাঁদের মান অপমান বোধ, মোহ এবং সংসারাসক্তি দূর হয়েছে, অধ্যাত্মজ্ঞানে যাঁরা নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সুখ দুঃখাদি রহিত সেই ব্যক্তিগণই অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করে থাকেন। যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠধাম। সূর্য চন্দ্র বা অগ্নি কেউই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। আমারই সনাতন অংশ জীব প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে। চক্ষু কর্ণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে জীব বিষয় সকল উপভোগ করে। এই জীবকে কেবলমাত্র বিবেকিগণ দেখতে পান। অশ্রদ্ধচিত্ত অবিবেকী পুরুষ একে শত চেষ্টা সত্ত্বেও দর্শন করতে পারে না। হে অর্জুন! সূর্য চন্দ্রে যে তেজ অবস্থিত, যে তেজ অখিল জগৎ সংসারকে প্রকাশ করছে তা আমারই বলে জানবে। আমিই আপন শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে ভূতবর্গকে ধারণ করছি। আমি বৈশ্বানর নামক জঠরাগ্নি হয়ে জীবদেহে আশ্রয় করে প্রাণ অপানের সাথে মিলিত হয়ে চর্ব্য চোষ্যাদি চতুর্বিধ অন্নের পরিপাক করে থাকি। আমি সর্বজীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ঠ আছি। সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য পরমেশ্বর আমি এবং আমিই বেদান্তের প্রণয়ন কর্তা। এই লোকে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই পুরুষ আছেন। সমস্তভূতগ্রাম ক্ষর নাম খ্যাত। এই ক্ষর স্বভাববিশিষ্ট দেহে থেকেও যিনি নির্বিকার তিনি অক্ষর নামে পরিচিত। এই দুটি থেকে ভিন্ন পরমাত্মা নামক একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি বিকার রহিত এবং তিনিই ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে পালন করেন। যেহেতু আমি ক্ষর স্বভাববিশিষ্ট জগৎকে অতিক্রম করে আছি এবং অক্ষর স্বভাব জীবের থেকে আমি উত্তম সেই জন্য বেদে এবং লোকে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। যিনি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানেন তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়ে আমার ভজনা করেন। হে নিস্পাপ ভারত! এই প্রকারে সর্বাপেক্ষা অধিক গুহ্য শাস্ত্র আমি বললাম। এটা যিনি অবগত হয়েছেন তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান এবং তাঁর জ্ঞাতব্য বা কর্তব্য বলে কিছুই নেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনিত্য অসার দুঃখোৎপাদক এই সংসার রূপ মহীরূহকে ছেদন করে অচিন্ত্য অব্যয় পুরুষোত্তমরূপ পরমপদের যথার্থ উপদেশ দিলেন। এই পুরুষোত্তম প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ বলেন — 'পরমতম হইতেছেন পুরুষোত্তম, তিনি সকল অভিব্যক্তির উর্দ্ধে শাশ্বত সত্তা, তিনি অনন্ত — দেশ কাল

নিমিত্তের কিংবা তাঁহার নিজ অসংখ্য লক্ষণের কোনো একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বাতীত পরমাত্মা, সব কিছু তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, সবই হইতেছে তাঁহার রূপ, তাঁহার আত্ম-বিভূতি।' *('গীতা নিবন্ধ', ঋষি অরবিন্দ, শ্রীঅনিল বরণ রায় অনূদিত, ১৯৭১, পৃ. ৫৮৮)* বৈরাগ্যের উদয় না হলে তাঁকে লাভ করা সম্ভব নয়। যে পুরুষোত্তম সকল জ্ঞানের আধার স্বরূপ, যিনি জ্ঞাতব্য, যিনি জ্ঞেয়, তাঁর স্বরূপ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়ায় তা 'পুরুষোত্তমযোগ' নামে যথার্থ কীর্তিত হয়েছে। শ্রীধর স্বামী তাঁর সুবোধিনী টীকায় বলেন —

'সংসার শাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে প্রভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, ৩য় ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৪)

অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সংসাররূপ মায়াবৃক্ষ ছিন্ন করে পুরুষোত্তমযোগ নামক পরমপদ ব্যক্ত করেন।

ষোড়শ অধ্যায় — 'দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ'

এই অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ এবং আসুরী সম্পদের মধ্যে কোনটি অবলম্বন করা শ্রেয় তা ভগবান কর্তৃক অর্জুনকে উপদিষ্ট হয়েছে। প্রথমেই দৈবীগুণগুলি চেনার জন্য তিনি বললেন — 'যিনি দৈবভাব অবলম্বন করে জন্মগ্রহণ করেন তাঁতে ষড়বিংশগুণ বর্তমান থাকে। সেই গুণগুলি হল ভয়হীনতা চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, দান, ইন্দ্রিয়দমন, যজ্ঞ, বেদ অধ্যায়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরের দোষানুসন্ধান না করা, জীবে দয়া, লোভ ত্যাগ করা, মৃদুতা. অন্যায় কর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুচিতা, বিদ্বেষ শূন্যতা এবং নিজেকে মাননীয় জ্ঞান না করা' আসুরীভাব প্রাপ্ত হয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করে তাঁদের দম্ভ, দর্প, অভিযান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি গুণাধীন হতে হয়। দৈবী সম্পদ মোক্ষের এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের অনুকূল। হে অর্জুন! তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, অতএব তোমার শোক করবার কোনো কারণ নেই। অসুর স্বভাব পুরুষগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কোনো ভেদজ্ঞান নাই। তাহাদের শৌচ আচার বা সত্য বলে কিছু নেই। তারা জগৎকে মিথ্যা, ঈশ্বরবিহীন বলিয়া থাকে। কেবল স্ত্রী পুরুষ সংযোগেই জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ কামমূলক এটাই তাঁদের বিশ্বাস। এই রূপ অজ্ঞানবশতঃ অহিতকারী নির্বোধেরা জগতের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা ক্রমবর্ধমান কামনাগুলোর আশ্রয় করিয়া মদমত্ত হয়ে কুকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাঁরা কামভোগকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করে। শত শত আশারূপ

পাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ এই ব্যক্তিগণ কামনা সম্ভোগের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। আজ আমি এটা পেয়েছি, অন্য ইপ্সিত বিষয় পেতে হবে, এটা আমার আছে, অন্যধনগুলো আমার হবে। এই শত্রুকে বিনাশ করেছি, অপর শত্রু বিনাশ করব, আমি সকলের ঈশ্বর, আমি ভোগী, স্নিগ্ধ, বলবান, সুখি, ধনী। আমি যজ্ঞ করব, দান করব এইরূপ অজ্ঞান জাত মোহজালের দ্বারা আবৃত এবং কাম্যভোগ বিষয়ে আসক্ত চিত্ত হয়ে তারা অশুচি নরকে পতিত হয়। আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, অবিনীত, ধনগর্বিত, মদমত্ত এই সকল পুরুষ দম্ভের দ্বারা অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করে থাকে। এইসব পুরুষ আপন ও পরদেহেস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে দ্বেষ করে সজ্জনদের নিন্দা করিয়া থাকে। আমি নরাধম পুরুষগণকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করে থাকি। হে কৌন্তেয়! এই মূঢ়গণ বার বার আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয়ে আমাকে লাভ করতে না পেরে আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাম ক্রোধ এবং লোভ এরা নরকের তিনটি দ্বার এবং আত্মার অকল্যাণকারী। অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করবে। এই তিনটি থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ মঙ্গালময় কার্যের অনুষ্ঠান করে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে থাকেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করে আপন ইচ্ছামত কার্য করে সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। তাঁর স্বর্গ এবং সদগতি লাভও হয় না। অতএব কর্তব্যা-কর্তব্য নিরূপন বিষয়ে শাস্ত্রকেই প্রামাণ্য জানা উচিৎ। কোনো কাজ করতে হলে সেই বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধান জেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।'

এই অধ্যায়ে দৈবভাব এবং আসুরী ভাবধারী যে দুইশ্রেণীর পুরুষ আছেন তাঁদের বিষয়ে বলা হয়েছে। দৈবভাবকে অবলম্বন করে ভগবানের শ্রীচরণে অনন্যা ভক্তি নিবেদনপূর্বক পরম ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে অসুর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈশ্বরে অভক্তি প্রদর্শন করে পুনঃ পুনঃ নিকৃষ্টতম জন্ম পরিগ্রহ করে। তাই ভগবান অর্জুনকে দৈবীভাব অবলম্বন করে যে কোনো প্রকার কার্য নিরূপনের জন্য শাস্ত্রকেই প্রামান্য বলে গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। এই অধ্যায়ে দৈব এবং আসুরী সম্পত্তির বিভাগ প্রদর্শন করে এটা ভগবান প্রতিপাদন করলেন যে কেবল সাত্ত্বিক ব্যক্তিরই তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকার আছে। সুতরাং অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যায়ের নাম 'দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ' সুসঙ্গাতই হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায় — 'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ'

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছিলেন যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধান সমূহকেই সবসময় শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে পালন করা কর্তব্য। সেই সূত্র ধরে অর্জুন এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রশ্ন করলেন — 'হে কৃষ্ণ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত

হয়ে দেবদেবীগণের পূজা করেন তাঁদের নিষ্ঠা কি প্রকার? ইহা সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী নিষ্ঠা?' অতঃপর ভগবান ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রে যে বিষয়গুলোর উপদেশ দেওয়া হয় তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন 'পূজা, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও ঈশ্বরনাম সংকীর্তনই হইল উপদেশের বিষয়। হে অর্জুন! দেহধারী জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। তারা স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ী সৃষ্ট হয়। পুরুষের শ্রদ্ধা স্বভাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত সে ব্যক্তি তেমনই হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের, রাজস ব্যক্তিগণ যক্ষ রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ প্রেত ও ভূতগণের পূজা করেন। দম্ভ, অহংকার, কাম, আসক্তি ও বলযুক্ত বিচারবিহীন যেসব মানুষ শরীরের ইন্দ্রিয়গুলোকে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ আমাকে ক্লেশ দিয়ে অশাস্ত্র বিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যায় নিরত হয় তাদের অসুর বলে জানবে। আয়ু-উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধনকারী রসাল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর আহার্য বস্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় হয়। তিক্ত, লবণাক্ত, অত্যন্ত গরম, ঝাল প্রদাহকারী, দুঃখ-শোক ও রোগ উৎপাদনকারী আহার্য বস্তু রাজসিক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে সকল খাদ্য অনেকদিন আগে পাক্‌করা, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র তা তামস প্রকৃতির লোকের অতিশয় প্রীতি জন্মায়। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে অবশ্য কর্তব্য বোধে শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় তাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ফললাভের জন্য এবং নিজের মহত্ত্ব প্রচারের জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাকে রাজস যজ্ঞ বলে। অশাস্ত্রীয়, অনুদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানিগণের পূজা, শৌচাচার, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসাকে শারীরিক তপস্যা বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়, হিতজনক বাক্য এবং স্বাধ্যায়কে বাক্যময় তপস্যা বলা হয়। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌন, চিত্তসংযম ও চিত্তশুদ্ধি এই সকলকে মানস তপস্যা বলে। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন একাগ্রচিত্ত মনুষ্যগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত এই তিনপ্রকার তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। মান মর্যাদা ও পূজা পাবার জন্য যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে অনিত্য এবং অল্পফলপ্রদ সেই তপস্যাই রাজস তপস্যা। অবিবেকবশত বা অন্যের বিনাশের জন্য নিজেকে পীড়া দিয়ে যে তপস্যা তাকে তামস তপস্যা বলে। প্রত্যুপকারের আশা না করে উত্তম পাত্রে, উত্তম কালে দান করা কর্তব্য। এই দানই সাত্ত্বিক দান। কিছু পাবার আশা করে দুঃখিত চিত্তে যে দান করা হয় তাহাকে রাজস দান বলে। দেশকাল পাত্রের বিচার না করে অধম পাত্রকে সৎকার ছাড়া অবজ্ঞাপূর্বক যে দান, তাহাকে তামস দান। ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটি নাম দ্বারা ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে থাকেন। বিধাতা এই তিনটি নামের

দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। অতএব ‘ওম্’ এই শব্দ উচ্চারণ করে ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শাস্ত্র কথিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সর্বদা প্রবর্তিত করেন। ‘তৎ’ শব্দ উচ্চারণ করে মোক্ষকামী পুরুষেরা ফলকামনা ত্যাগ করে নানাপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকর্মের অনুষ্ঠান করেন। হে পার্থ! সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে সাধুভাবে ‘সৎ’ শব্দ উচ্চারিত হয়। যজ্ঞ, তপস্যা ও দান কার্যে যে নিষ্ঠা তাও সৎ শব্দের দ্বারা আখ্যাত হয়। অশ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ, দান, তপস্যা অথবা অন্য যে কোনো কর্মই ‘অসৎ’ শব্দবাচ্য। এই সকল কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কখনও শুভ ফল প্রদান করে না।’

এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধার প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের যজ্ঞ, দান তপস্যা ইত্যাদি পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্তিমে তার মূল বক্তব্য পরিস্ফূট করে ভগবান বলেছেন যে স্বভাব অনুযায়ী পুরুষ এই তিন প্রকার শ্রদ্ধার অধীন হয়। সুতরাং পুরুষের শ্রদ্ধা সহকারে সকল কর্ম সম্পাদন করা উচিৎ। অশ্রদ্ধা যুক্ত চিত্তে কৃত দান, যজ্ঞ ও তপস্যা সবকিছুই নিষ্ফল হয়। ঋষি অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন — “আমাদের শ্রদ্ধা হইতেছে ত্রিবিধ, আমাদের প্রকৃতির প্রধান গুণ অনুযায়ী তাহা বিভিন্ন প্রকার হয়। কোনো মানুষের সত্তার মূল উপাদান, তাঁহার ধাতুগত প্রকৃতি, তাহার স্বভাবজাত শক্তি যেরূপ, তদনুযায়ী তাহার শ্রদ্ধার রূপ রং ও গুণ নির্ধারিত হয়। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা। আর তাহার পরেই আসিতেছে একটি বিশিষ্ট ছত্র, তাহাতে গীতা বলিতেছে যে, এই পুরুষ, এই যে মানুষের অন্তরাত্মা, ইনি যেন শ্রদ্ধার দ্বারাই গর্বিত। শ্রদ্ধা অর্থাৎ একটা কিছু হইবার সংকল্প, নিজের উপর জীবনের উপর একটা বিশ্বাস, আর তাঁহার ঐ সংকল্প, শ্রদ্ধা বা সত্তাগত বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহাই এবং তাহাই তিনি, ‘শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যশ্রদ্ধঃ স এব সঃ’।” *(‘গীতা নিবন্ধ’, ঋষি অরবিন্দ, শ্রীঅলিন বরণ রায় অনুদিত, ১৯৭১, পৃ. ৪৮৪)* সুতরাং বিষয় বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে অধ্যায়টির নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলা যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায় — ‘মোক্ষযোগ’

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এতদুভয়ের তত্ত্ব পৃথক পৃথকভাবে জানতে চাইলেন। তদুত্তরে ভগবান বললেন যে কাম্য কর্ম সকলের পরিত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলেন কিন্তু জ্ঞানিগণ কর্মের ফলত্যাগকেই যথার্থ ত্যাগ বলেছেন। কেউ কেউ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করার পক্ষপাতি কেউ বা কর্মের ফল ত্যাগ করার পক্ষপতি। তাঁদের মতে দান, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি চিত্তশুদ্ধিকারক বলে পরিত্যজ্য নয়। ত্রিবিধ শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে ত্যাগও বিভিন্ন

প্রকার হয়। আসক্তি এবং ফলকামনা পরিবর্জন পূর্বক যে কর্ম তাই উত্তম ত্যাগ। মোহ বশতঃ শাস্ত্র বিহিত কর্মের পরিত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে। 'কর্ম করলে দুঃখ হয়' এই বিচার করে শারীরিক ক্লেশের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করাকে রাজস ত্যাগ বলে। ফলকামনা পরিত্যাগ করে কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে শাস্ত্র বিহিত কর্মকরাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত সংশয়রহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ত্যাগী পুরুষ দুঃখজনক কর্মকে দ্বেষ করেন না বা সুখদায়ক কর্মেও আসক্ত হন না। দেহধারী পুরুষের সর্বতোভাবে কর্মত্যাগ কখনও সম্ভব নয়। হে অর্জুন! সমস্ত কর্মের সিদ্ধির জন্য সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার কারণের কথা বলা হয়েছে। তারা হল শরীর, কর্তা, বিভিন্ন প্রকার করণ, নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং পঞ্চম হল দৈব। আমি কর্তা এই অহংকার ভাব যাঁর নেই, যাঁর বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না সেই ব্যক্তি এই সমস্ত লোককে হনন করলেও এই বিনাশ কার্যের জন্য আবদ্ধ হন না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা — এই তিনটি কর্মপ্রবৃত্তির মূল। করণ, কর্ম, কর্তা এই তিনটি কর্মের আশ্রয়। চিত্তে যে বিষয়ের প্রকাশ বা অনুভূতি হয় তাই জ্ঞান, এই জ্ঞানের দ্বারা যা জানা যায় তাই জ্ঞেয়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা। কর্ম জ্ঞান ও কর্তা প্রত্যেকটি তিন গুণযুক্ত। যে জ্ঞানের দ্বারা পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতের মধ্যে অভেদ জ্ঞান হয় তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ভাবে জানাই রাজসিক জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞান ঠিক এর বিপরীত। যে জ্ঞান কোনো কিছুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে না, তুচ্ছ কর্মকেও কঠিন বলে মনে হয় তাই তামসিক জ্ঞান। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য পুরুষ কর্তৃক শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম অনাসক্ত ও রাগদ্বেষ বিবর্জিতভাবে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। আর সকাম পুরুষের দ্বারা অহংকারের সাথে যে কাজ করা হয় তাকে বলে রাজস কর্ম। কর্মের শুভাশুভ পরিণাম ফল বিবেচনা না করে শক্তি, অর্থক্ষয়, প্রাণী হিংসা এবং স্বীয় সামর্থের বিচার না করে মোহবশত যে কাজ করা হয় তাই তামস কর্ম। কর্মফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমান রহিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন যে কর্তা তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়। বিষয়াসক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, শোকাদিযুক্ত কর্তাকে রাজস কর্তা বলে। বিবেকহীন, কপটাচারী, পরস্বাপহারী অলস ব্যক্তিকে তামস কর্তা বলে। হে পার্থ! প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য-অকার্য, ভয়-অভয়, বন্ধন-মোক্ষ প্রভৃতি যে বুদ্ধির দ্বারা অবগত হওয়া যায় সেই বুদ্ধিকেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। ধর্ম-অধর্ম, কার্য-অকার্য যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় তাকে রাজসিক বুদ্ধি বলে। তার তমোগুণাশ্রিত যে বুদ্ধি ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে তাকে তামসী বুদ্ধি বলে। হে অর্জুন! ঐকান্তিক যোগাভ্যাসের দ্বারা লব্ধ, যে ধৃতি দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ

করা যায় তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে। যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম অর্থ কামের ধারণা হয় এবং তার প্রতি আসক্তি জন্মে তাকেই রাজসিক ধৃতি বলে। আর যে দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতিবশত নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততা পরিত্যাগ করে না তাকে তামসিক ধৃতি বলে। বুদ্ধি, আত্মাকে বিষয় করে স্থিত হলে তাতে যে সুখ হয় তাকে সাত্ত্বিক বলে। বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে আপাত মনোরম সুখ লাভ হয় তাকে রাজস সুখ বলে। আর যে সুখ নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদজাত এবং যে সুখ আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে সেই সুখকে তামস সুখ বলে। পৃথিবীতে অথবা স্বর্গস্থিত দেবগণের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী নেই যিনি প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হতে মুক্ত। হে ফাল্গুনী! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণের কর্মসকল তাদের স্ব স্ব প্রকৃতিজাত গুণানুসারে হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল শম, সম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অনাসক্তি প্রভৃতি। আর পরাক্রমশীলতা, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধের অপরাম্মুখতা, দান এবং প্রভুভাব ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত ধর্ম। কৃষিকর্ম, গবাদি পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যের ধর্ম এবং সেবারূপ কর্ম শূদ্রের প্রকৃতি ধর্ম। মানুষ স্বীয় স্বভাবানুসারে কর্ম করে সিদ্ধি লাভ করে। স্বভাবজাত এই কর্ম ত্রুটি যুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপন স্বাভাবিক জাতিগত কর্ম দোষমুক্ত হলেও তা ত্যাগ করা অনুচিৎ, কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই দোষযুক্ত। মনুষ্যমধ্যে যিনি আমার এই উপদেশ বলবেন তিনি আমার অধিক প্রিয়কার্যকারী। আমার এবং তোমার মধ্যে এই ধর্মসম্বন্ধীয় কথোপকথন যিনি অধ্যায়ন করবেন জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তাঁর আমাকেই পূজা করা হবে। শ্রদ্ধাবান এবং দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে যিনি এই সংবাদ শ্রবণ করবেন তিনি পাপমুক্ত হয়ে পূণ্যকর্মাদের শুভলোক প্রাপ্ত হবে। হে পার্থ! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ কী? তোমার অজ্ঞানজাত মোহ বিনস্ট হয়েছে কী? তখন অর্জুন বললেন—'হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ নস্ট হয়েছে। আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হওয়ায় আমি স্বস্থ হয়েছি। আমি তোমার বাক্য পালন করব।' বলাবাহুল্য যে অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথোপকথন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন। অর্জুন এই কথা বলে শান্ত হলে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে লাগলেন যে মহাত্মা বাসুদেব এবং পার্থের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভূত সংবাদ আমি এরকমই শুনেছি। ব্যাসদেবের কৃপায় আমি এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শুনেছি। হে রাজন! আমি তাঁদের সেই পুণ্যময় সংবাদ স্মরণ করে বার বার পুলকিত হচ্ছি। শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভূত রূপ স্মরণ করে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়েছি। আমার শরীরে পুলক জন্ম হচ্ছে।

যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধারী অর্জুন বর্তমান আছেন, সেই পক্ষেই সম্পদ, বিজয় ও ঐশ্বর্যের অভ্যুদয় এবং স্থায়ী নীতি বর্তমান থাকে। এটাই আমার নিশ্চিত মত।

গীতার অষ্টাদশ তথা অন্তিম অধ্যায়ের নাম 'মোক্ষযোগ'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আলোচনার অন্তে এটাই উপলব্ধ হয় যে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধির পর ঈশ্বরের শ্রীচরণে অনন্যা ভক্তিসহ আত্মসমর্পণই হল গীতার শিক্ষা। এই অন্তিম অধ্যায়ে 'মোক্ষযোগ'-এ সেই পথই আরও দৃঢ় করা হয়েছে। ভগবান আহ্বান করেছেন অর্জুনের মতো সকল মোক্ষপদপ্রার্থীকে—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যামি মা শুচঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৬ শ্লোক)

'মোক্ষ্যয়িষ্যামি' তিনি ভক্তগণকে মুক্ত করবেন। মোক্ষ বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থকেই বুঝায়। এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বাগ্মীপ্রবর সঞ্জয় বললেন যে, যে পক্ষে মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্থের ন্যায় ধনুর্ধর আছেন 'তত্র শ্রীবিজয়োর্ভূতি ধ্রুবানীতি মর্তির্মম।' সেখানে শ্রী, বিজয়, ভূতি এবং ধ্রুবানীতি বিরাজ করে। 'যুজ্যতে অনেন ইতি যোগঃ' মোক্ষের সাথে যার মাধ্যমে যুক্ত হওয়া যায় তাই 'মোক্ষযোগ'। মোক্ষের সুগম পথ প্রদর্শিত হওয়ায় অধ্যায়টির নামকরণ 'মোক্ষযোগ' সুপ্রযুক্তই হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে একটি আপাত প্রতীয়মান অসঙ্গতি দেখা যায়। 'গীতা সমস্যা' এই নামে আগেই এদের অভিহিত করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

'সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তুমাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্।।'

অর্থাৎ আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় ও অপ্রিয় নেই। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন তারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও তাদের মধ্যে বাস করি। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় বললেন—

'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম।।'

অর্থাৎ তুমি সর্বদা আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য তোমার হিতকর সর্বাপেক্ষা গুহ্য আমার উৎকৃষ্ট বাক্য আবার বলছি।

নবম অধ্যায়ে বললেন 'আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই' এবং অষ্টাদশ

অধ্যায়ে অর্জুনকে বললেন 'তুমি আমার অতিশয় প্রিয়'। সুতরাং বাক্য দুটি পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু গীতার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থপূর্ণ শ্লোক থাকা কি সম্ভব? এই বিষয়ের আলোচনা কোনো ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার করেননি। কিন্তু গীতা যা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী তাতে বিরুদ্ধ বাক্য থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুখে দুঃখে নিস্পৃহ, হর্ষশোকে সমভাবাপন্ন। তিনি সকল কার্যের কর্তা হলেও কোন কার্যেই তিনি লিপ্ত নয়। সর্বভূতে সমদর্শী হয়েও অর্জুনকে বলছেন তুমি অতিশয় প্রিয়। এই প্রিয় হবার জন্য অর্জুনের প্রচেষ্টা সর্বাধিক। বস্তুত এই বাক্যটিকে অর্জুনের দিক দিয়েই বিচার করতে হবে। তিনি তাঁর শৌর্য, বীর্য, বিনয় এবং ভগবদ্ শরণাগতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয়েছেন। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, কিন্তু তা সকলকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করে না। যে তার নিকটস্থ হয় তাকেই অগ্নি দহন করে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তদ্রুপ, তিনি সমদর্শী, কিন্তু যিনি তাঁর অতীব নিকটবর্তী হন তাকেই প্রিয় বলে, ভক্ত বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত জীবমাত্রই ঈশ্বরের প্রিয়। অর্জুন নিখিল মানবের প্রতিনিধি। তাই তিনি প্রিয়তম আধার। তাকে উপলক্ষ্য করেই সর্বজীবের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। সেই জন্য কার্য তথা লীলার্থে অর্জুনরূপী প্রিয়কেই অতিশয় প্রিয় বলেছিলেন জাগতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য জাগতিক দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে শ্লোক দুটির মধ্যে আর অসঙ্গতি থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ

কর্ম প্রসঙ্গ

অচিরস্থায়ী এই সংসারে সকল বস্তুই কোনো না কোনো আধারে অবস্থান করে। এই আধার সেই বস্তুগুলির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণই হয়ে থাকে। জলযান জলেই ভাসে, স্থলে তার পক্ষে সন্তরণ সম্ভব নয়। বাষ্পীয় শকট নির্দিষ্ট পথে গমনাগমন করে, অন্যত্র যাওয়া তার বিধি নয়। এক্ষেত্রে যেমন আধার অর্থাৎ জল-স্থলাদি দেখে জলযান বা স্থলযান সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা করা যেতে পারে তেমনি যুদ্ধক্ষেত্ররূপ আধারে যে উপদেশ উপদিষ্ট হয়েছিল তার প্রকৃতি কিরকম সেই বিষয়ক একটি ধারণা অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে। এই গীতা গভীর অরণ্যের মধ্যে যোগ সাধনায় নিরত কোনো ভক্ত শিষ্যকে তাঁর গুরু উপদেশ করেননি। বা সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ দিগ্‌ভ্রান্ত কোনো গৃহস্থকে উপদিষ্ট হয়নি। এটা জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র এক বীর যোদ্ধাকে তাঁরই এক সুনিপুণ সারথি কর্মে অনুপ্রণিত করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং সারথি কর্তৃক প্রদত্ত এই উপদেশের গতিপ্রকৃতি কিরূপ হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। গীতা গ্রন্থের আরম্ভে যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যুদ্ধ করা এবং না করা বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করলে তাঁকে যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহিত করে 'যুদ্ধ করা রূপ কর্ম' বিষয়ক উপদেশ সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন। উপদেশ সমাপ্ত হলে অর্জুন বললেন যে 'আত্মীয় বধজনিত যে মোহ বা সংশয় অমার মনে উত্থিত হয়েছিল তা অপগত হয়েছে, আমি তোমার উপদেশানুসারে ঘোর যুদ্ধরূপ কর্মই করব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৭৩ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অর্জুন গীতার অন্তিমে বলেছেন যে 'নষ্টো মোহঃ' এবং 'করিষ্যে বচনং তব'। কিন্তু মহাভারতে অভিমন্যুর বধের পরে দেখা যায় অর্জুন শোকে কাতর হয়েছেন। সুতরাং মোহ বলতে এখানে কর্তব্য করা এবং না করারূপ মোহই অর্জুনের অভিপ্রেত। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র গীতা গ্রন্থখানি অর্জুনকে কর্মে প্রোৎসাহিত

করবার অভিপ্রায়ে বলা হয়েছে। অতএব কর্মের প্রাধান্য এতে থাকবেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গীতায় কেবল কর্মের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়নি। এতে আছে জ্ঞান এবং ভক্তি। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তিমূলক শ্লোক অনেক পরিমাণে দেখা যায়। অতএব স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে গীতা তা হলে কাকে প্রাধান্য দিয়েছে, কর্ম, জ্ঞান না ভক্তিকে?

৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসার একেবারেই কমে যায়। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে। কাল প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম যখন তার গৌরব হারিয়ে ফেলতে শুরু করল তখন পুনরায় অভ্যুদয় হল সনাতন বৈদিক ধর্মের। এই সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূলে ব্যবহার করতে থাকে। সেই সময় প্রধান্য লাভ করে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধদ্বৈতবাদ। তাঁরা গীতার মধ্যে নিজেদের সম্প্রদায়ের অনুকূল যে জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে তাকেই গীতার মূল শিক্ষা বলে প্রচার করেছেন। গীতার উপর এই সকল ভাষ্যকারগণের কৃত ভাষ্য বা টীকার মধ্যে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। অবশ্য শঙ্করভাষ্যের আনন্দগিরি কৃত টীকায় দ্বিতীয় সর্গের ১০ম শ্লোকে বলা হয়েছে যে— 'যে বৃত্তিকার ব্রহ্মসূত্রের এক বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি গীতারও একটি বৃত্তি বা দীপ্তি লিখিয়াছেন, তার সারমর্ম হল যে শুধু জ্ঞান বা শুধু কর্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না, তাদের সম্মিলিত সাধনাতেই অভীষ্ঠ লাভ হয়।' কিন্তু আচার্য শঙ্কর ভিন্ন মত পোষণ করেন। মনকে শুদ্ধ করার একমাত্র উপায় হিসাবে কর্মকে প্রাধান্য দিলেও প্রজ্ঞা বা জ্ঞানলাভের পর সেই কর্মের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় বলে তিনি মনে করেন। কর্ম ও জ্ঞানকে তিনি আলোক ও অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে কর্ম কেবলমাত্র অবিদ্যাগ্রস্তের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিধানের উপায় স্বরূপ। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কে তিনি অস্বীকার করে বলেন— 'তস্মাদ্ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানাদ্ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম সমুচ্চয়াৎ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* তিনি কর্মকে মোক্ষ প্রাপ্তির একটি উপায় রূপেই স্বীকার করেছেন। 'কর্মনিষ্ঠয়া জ্ঞান নিষ্ঠাপ্রাপ্তি হেতুত্বেন পুরুষার্থ হেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেন'। *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* তিনি মনে করেন যে মোক্ষ লাভের পর সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠান বর্জন করা উচিত। শঙ্করাচার্যের এই মতকে আরও পরিস্ফুট করেন টীকাকার আনন্দগিরি, শ্রীধর স্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী। মারাঠী সন্ত তুকারাম এবং জ্ঞানেশ্বর যদিও কর্মকে মোক্ষলাভের চরম পথ মনে করেন তথাপি শঙ্করের মতকে তাঁরা প্রাধান্য দেন। আচার্য রামানুজ মনে করেন যে গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উল্লেখ থাকলেও ভক্তিই সেখানে প্রাধান্য

লাভ করেছে। মধ্বাচার্য্য ভক্তিকেই গীতার প্রধান আলোচ্য বিষয় মনে করেছেন। নিম্বার্কাচার্য্যের মতে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর পরস্পর অভিন্ন কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীব জগতের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। এই ঈশ্বরলাভ ভক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মের উপর ভক্তিই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বল্লভাচার্য বললেন যে মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না। ঈশ্বর তাকে কৃপা করেন যিনি তাকে ভক্তি করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন আচার্যগণ কেউ কেউ ভক্তি কেউবা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবল নিম্বার্ক সম্প্রদায় এই তিনটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের মনীষী যাঁরা গীতাচর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী রঙ্গানাথানন্দ প্রমুখ বিদগ্ধজনের নাম উল্লেখ্য। এছাড়া বহু পণ্ডিত আছেন যাঁরা তাঁদের সাধনা ও জ্ঞানের দ্বারা গীতাকে ভারতবর্ষে এবং বর্হিভারতে নতুন নতুন ভাবে প্রচার করছেন। কিন্তু তারা কেউই নিজ সম্প্রদায় বর্হিভূত কোনো মত প্রকাশ করেননি। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতা রহস্যে বলেছেন— 'যাহার দ্বারা লোকব্যবহারও সূচারুরূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞানমূলক ভক্তি প্রধান ও নিষ্কাম কর্মমূলক ধর্ম যাহা আমরণ পালন করিতে হইবে, সেই ধর্ম বিষয়ে ভগবান্ গীতায় উপদেশ দিয়াছেন।' *('গীতা রহস্য', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪০৬)* কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করলেও গীতার মূল প্রতিপাদ্য যে কর্ম তা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। গীতাকে কর্মযোগশাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেও তাতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক কিছু শ্লোক। যার দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি ঈশ্বরলাভের স্বতন্ত্র নিষ্ঠা হিসাবে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং স্বভাবতই সংশয় দৈখা যায় যে গীতার ছয় ছয় অধ্যায় করে প্রথমে কর্ম পরে জ্ঞান এবং অনন্তর ভক্তির উপদেশ দিয়েছেন? বহু ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার গীতাকে তিনটি পৃথক ষট্‌কে ভাগ করেছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয়। কারণ গীতার উপদেশ কর্মে প্রেরণা দেবার অভিপ্রায়ে বলা হলেও দেখা যায় যে জ্ঞান এবং ভক্তিবাদীদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ষট্‌কেও কর্ম করবার স্পষ্ট ইঙ্গিত ভগবান দিয়েছেন। তাঁদের মতে প্রথম ছয় অধ্যায়ই কর্মের উপদেশ রয়েছে। কিন্তু গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কের অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান স্পষ্ট করে বলেছেন 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরিষ্কার ভাষায় যুদ্ধের প্রেরণা দিলেন

এবং বললেন সকল সময় যেন তাকে স্মরণ করে এই যুদ্ধ করা হয়। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনরায় আহ্বান জানালেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে। ষষ্ঠ হতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এই দ্বিতীয় ষট্‌ককে জ্ঞান প্রচারের মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে নবম অধ্যায়ে ভগবান ভক্তির বিষয়ে বলেছেন। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)* অর্থাৎ হে কুন্তীপুত্র! তুমি নিশ্চয় জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ঠ হয় না। প্রথম যে ছয়টি অধ্যায়কে কর্মোপদেশে পরিপূর্ণ বলে কেউ কেউ মনে করেন সেখানে জ্ঞানের প্রশস্তি মহিমা প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে 'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি, 'জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মানি ভস্মস্যাৎ কুরুতে তথা', 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪ অধ্যায়. ৩৬, ৩৭, ৩৮ শ্লোকাংশ)* ইত্যাদি শ্লোকাংশগুলি তার পরিচয় বহন করে। অতএব স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে গীতাতে কর্ম জ্ঞান এবং ভক্তির বিষয় বিস্তর উপদেশ ভগবান দিয়েছেন। কিন্তু আগে কর্মের উপদেশ পরে জ্ঞানোপদেশ এবং অন্তে ভক্তি এইরূপ কোনো পূর্বকল্পনা করে ভগবান অর্জুনের রথে আরোহন করেননি। অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে হতোদ্যম দেখে তিনি যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হবার জন্য অর্জুনকে কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে এখানে কেউ কেউ ভগবানের সংহারক প্রকৃতির উল্লেখ করে কৃষ্ণ চরিত্রে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীব হাতে অবতীর্ণ হবার পূর্বে কিন্তু ভগবান অর্জুনকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে একবারও উপদেশ দেননি। তিনি তখনই উপদেশ দিলেন যখন যুদ্ধ করতে এসে অর্জুন মোহবশত যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এতেও সংশয় থাকে যে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে 'তুমি যুদ্ধই কর, এটাই তোমার অবশ্যকর্তব্য' ইত্যাদি বললেই চলত, তার জন্য প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি বর্ণনা এবং ঈশ্বরে অব্যভিচারী ভক্তির কথা বলবার কী প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন এই যে গীতায় কর্ম বলতে নিষ্কাম কর্মকেও বোঝান হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্ম সাধন করতে করতে আত্ম এবং অনাত্ম বিষয়ক জ্ঞান হলে সমস্ত কর্মই তখন নিষ্কাম হয়ে পড়ে। বারবার অনিত্য এই সংসারে গমনাগমন করতে করতে যখন এর থেকে মুক্তির উপায় জানার জন্য অদম্য আগ্রহ হবে তখনই সেই জ্ঞানে সকল কর্ম পরিসমাপ্তি লাভ করবে। তাই বলা হয়েছে — 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)* কর্ম থেকে এভাবে আসল জ্ঞান প্রসঙ্গ। এই জ্ঞান হল ভক্তি মন্দিরের প্রথম সোপান। 'ভক্তি' জ্ঞানপূর্বিকা। জ্ঞান না থাকলে ভক্তি আসতে পারে না। দেবীমুর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বরূপ জ্ঞান অন্তরে উপলব্ধি করলে তবেই তাঁর প্রতি ভক্তি আসে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি

শ্রদ্ধা বা ভক্তি আসে তখনই যখন তাঁর সদাচার সদ্‌বাক্য প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ পূর্ব পরিকল্পিত না হলেও এরা অপ্রসাঙ্গিক নয়। এদের বিস্তৃত উপদেশের প্রয়োজন মোহগ্রস্ত অর্জুনের ক্ষেত্রে ভগবান অপরিহার্য মনে করেছিলেন। সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই আলোচ্য অধ্যায়ে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথগালোচনা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যথাসাধ্য প্রয়াস করা হবে।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে সমস্ত গীতা গ্রন্থটি এক আরম্ভ কর্ম বীর অর্জুনকে ভগবান উপদেশ করেছেন এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই এতে কর্মই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু ভগবান যে কর্মের উপদেশ দিয়েছেন তা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে কর্মে প্ররোচিত করছে কেন? বস্তুত গীতায় ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মের ত্রিবিধ দোষ আছে। তা হল কর্মে আসক্তি, ফলাকাঙ্খা এবং কর্মে কর্তৃত্ব বোধ। এই তিনের উর্দ্ধে থেকে যে কর্ম করা হবে তাই গীতার মতে কর্ম বলে মান্য। অর্জুনকে ভগবান এই কর্মেরই উপদেশ দিয়েছেন। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পর ভগবান অর্জুনকে বলেছেন 'ময়ৈবৈতে নিহতা পুর্বমেব নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)* অর্থাৎ কুরুপক্ষীয় বীরেরা আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছেন, তুমি এখন তাদের বধের নিমিত্ত হও। অর্থাৎ কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত হও। এটাই নিস্কাম কর্ম। কিন্তু সাংখ্যে (গীতায় যা জ্ঞান নামে পরিচিত) পরিষ্কারভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে কর্ম ত্যাগ করার। তাঁদের মত অনেকটা এই প্রকার যে 'কর্মনা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৪০ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)* অর্থাৎ জীবের কর্মই হল নিগড় এবং একমাত্র জ্ঞানেই তার মোচন হয়। সুতরাং সকল প্রকার কর্মই পরিত্যাজ্য। সাংখ্যাবাদীদের মতে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ এবং কাম্য এই চার প্রকার কর্ম আছে। এদের মধ্যে সন্ধ্যাতর্পণাদি কর্ম প্রাত্যহিক। এটা না করলে পাপ স্পর্শ করতে পারে বলে তা করা উচিত। নৈমিত্তিক কর্ম নিমিত্ত উপস্থিত হলেই করতে হবে। অবশিষ্ট কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম। কাম্য কর্ম করলে পাপ হতে পারে এই বোধে তাও পরিত্যাজ্য। এইভাবে এই কর্মগুলির যে পরিণাম সেই বিষয়ে চিন্তা করে কোন্‌টি করা উচিত এবং অনুচিত তা বুঝে যে কেউই মোক্ষ লাভ করতে সমর্থ হয়। এই বুদ্ধিতে কর্ম করলে তা কর্ম না করারই সামিল হয় এবং এই অবস্থাকেই 'কর্মমুক্তি' বা 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' বলা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— 'তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নেই। তোমার প্রকৃতি তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই

বলছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা—কি না, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা, জপ-তপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারী কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না।' *('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', মৌসুমী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১২)*

কিন্তু মীমাংসকদের এই যুক্তি বেদান্ত সূত্রে স্বীকৃত হয়নি। গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে—

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

অর্থাৎ কর্ম না করলেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্তি হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করলেই যে সিদ্ধি লাভ হবে তাও নয়। অর্থাৎ 'কর্মের দ্বারা কর্ম হইতে মুক্ত হইবার আশা অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়া পার করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ।' *('গীতা রহস্য', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৩৫)* কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না সত্য কিন্তু কর্মত্যাগও সিদ্ধিলাভের পক্ষে সহায়ক নয়। কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে প্রধান সহায়ক। এই কথাই ভগবান অর্জুনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গীতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্খলিত গাণ্ডীব অর্জুনকে ভগবান প্রথমেই ভর্ৎসনা করলেন তাঁর মোহ দেখে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বলেই যে তিনি সর্বদা যুদ্ধ পক্ষপাতি ছিলেন তা নয়। তবে অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান বা অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাও একপ্রকার অন্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৪৪২)

ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দের যে কর্তা তাঁকে ভালভাবে না জানলে কর্মের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট হবে না মনে করে ভগবান প্রথমে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান অর্জুনকে

প্রদান করেন। আত্মার স্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি বলার পর বললেন—

'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)

'স্বীয় ক্ষাত্রধর্মের কথা স্মরণ করে তোমার এরকম বিকম্পিত হওয়া উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ ব্যতিত অন্য শুভ কর্ম কিছু নেই।' এখানেই শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রথম কথা বললেন। ক্ষত্রিয় রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করবেন। অন্যথায় তাঁর রাজা নাম বৃথা। অর্জুন ক্ষত্রিয় বীর সুতরাং যুদ্ধই তাঁর অবশ্য কর্তব্য। মধুসূদন সরস্বতী তাঁর টীকায় পরাশর সংহিতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি এই বক্তব্যের সমর্থনে উত্থাপিত করেছেন—

'ক্ষত্রিয়ো হি প্রজারক্ষন্ শস্ত্রপানিঃ প্রদণ্ডবান্।
নির্জিতা পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্মেন পালয়েৎ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, প্রথম ষট্‌ক, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৬৩)

ক্ষত্রিয় অস্ত্র ধারণ করে প্রজা রক্ষা করবেন এবং পরসৈন্য পরাজিত করে স্বধর্মানুসারে পৃথিবী পালন করবেন। শুধুমাত্র শাস্ত্রেই নয়, এর সমর্থন মহাভারতাশ্রিত কাব্য নাটকেও পাওয়া যায়। ভাস বিরচিত 'পঞ্চরাত্রম্' নাটকে মহাবীর কর্ণের কণ্ঠে এটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

'বাণাধীনা ক্ষত্রিয়ানাং সমৃদ্ধি পুত্রাপ্রেক্ষী বঞ্চতে সন্নিধাতা।
বিপ্রোৎসঙ্গো বিত্তমার্বজ্য সর্বং রাজ্ঞা দেয়ং চাপমাত্রং সুতেভ্যঃ।।'

('পঞ্চরাত্রম্' ভাস বিরচিত, ১ম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে রাজা দিলীপের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন— 'সেনা তাঁর ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদের মত ছিল শাস্ত্রে তাঁর অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং ধনুকে আরোপিত জ্যা এই দুটি জিনিসেই প্রয়োজন সিদ্ধ হত'—

'সেনা পরিচ্ছদ তস্য দ্বয়মেবার্থ সাধনম্।
শাস্ত্রে স্বকুন্টিতা বুদ্ধি মৌর্বী ধনুষিচাততা।।'

('রঘুবংশম্', কালিদাস, ১ম অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

কেবল ক্ষত্রিয়ই যে কর্মে প্রবৃত্ত থাকবেন তাই নয়। মহাভারতে ব্যাসদেব শুককে বলেছেন যে ব্রাহ্মণদের প্রাচীনতম প্রথা ছিল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করা এবং সংসারে কর্মে প্রবৃত্ত থাকা।

'এষা পূর্বতরা বৃত্তি ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
মানবানেব কর্মানি কুর্বন্ সর্বত্র সিদ্ধ্যতি।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৩৭-তম অধ্যায়, ১ শ্লোক)

কর্ম অবশ্যই করতে হবে তবে তাতে আসক্তি পরিত্যাগ কর্তব্য। উপনিষদ বলেন—

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।'

('ঈশোপনিষদ্', ২য় মন্ত্র)

অর্থাৎ অনাসক্তভাবে কর্ম করে জগতে শত বৎসর বাঁচতে ইচ্ছা কর। এভাবে কর্ম করলে তুমি কর্মে লিপ্ত হবে না। এছাড়া অন্য উপায় নেই। প্রজা রক্ষা কাজ রাজার উপরে সমর্পিত থাকে। রাজা বা ক্ষত্রিয় নিজ দেহ পাত করেও তাঁর রাজধর্ম রক্ষা করবেন। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ ইআছে। ক্ষত্রিয় রাজপুত জাতি নারীর সম্ভ্রম এবং দুর্গতের রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিদেশি শক্তিকে প্রতিহত করেছে বার বার। সেই কারণে ইতিহাসে আজও তাঁরা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাজা মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ আজও শৈলশ্বরের মন্দির থেকে প্রতিধ্বনিত হয় এইভাবে— 'আমি যেই হই আমাদিগের আত্ম পরিচয় দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোনোপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।' *('দুর্গেশনন্দিনী', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ২য় ভাগ, পৃ. ৪)* কেবলমাত্র ইতিহাসেই নয় পুরাণাদিতেও কর্ম করে তার দ্বারা মুক্তি লাভ করেছেন এরকম বহু নৃপতির কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে— 'কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যা (কর্ম) দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্য জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।' *('বিষ্ণুপুরাণ', ৬ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)* গীতা যুদ্ধরূপ ঘোর কর্মের ভূমিতে অবতীর্ণ হলেও এটা মানব সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। যুদ্ধের কথা বলা হলেও তা তোমার অবশ্য কর্তব্য এইরকম বিধি না দিয়ে এই প্রথাবলম্বন করা সর্ববিধ মঙ্গলজনক এইভাবে বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই কথাকেই আরও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন— 'তস্মাৎ যুদ্ধ স্বেত্বনুবাদমাত্রং বিধিঃ, ন হ্যত্র যুদ্ধ কর্তব্যতা বিধীয়তে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)* কেবলমাত্র হিংসার বশীভূত হয়ে কর্ম করবার নির্দেশ গীতায় দেওয়া হয়নি। যে দণ্ড বা শাস্তি অপরকে দেওয়া হবে তা যদি নিজের দণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাহলে তাই হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষাই পূর্ণতা লাভ করেছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনিতে—

'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সমান আঘাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৩৭৯)

এই বুদ্ধিতেই ক্ষত্রিয়ের রাজ্য শাসন পূর্ণতা লাভ করে। সকল কাজই যিনি আত্ম বুদ্ধিতে করেন, সর্বত্র যিনি আত্মাকে দর্শন করেন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের হাতের ক্রীড়নক মনে করে কর্ম করেন। তিনি জানেন—

'নাচয় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে
নাচাহ তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।'

('নবীনচন্দ্র রচনাবলী', ১ম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১)

গীতায় তাই ভগবান অর্জুনকে কেবল কর্মের নিমিত্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন। সমস্ত কর্মই তাঁর, আমি উপলক্ষ মাত্র এই বোধে কর্ম করলে সে নির্লিপ্তই থাকে। ঈশোপনিষদ সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মের নিবাসস্থল জ্ঞান করে কর্ম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে উপদেশ করেছে। কেননা সেই প্রকার কর্ম আমাদেরকে লিপ্ত করতে পারে না। 'যস্তুক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ'। মহাভারতের এই মহাবাক্য আমাদের কর্ম করবার জন্য আদেশ করে—

'বিবেকী সর্বদা মুক্তঃ কুর্বতো নাস্তি কতৃর্তা
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণ জনকৌ যথা।'

('কঠোপনিষদ', ২য় অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

বিবেকী ব্যক্তি সর্বদাই মুক্ত। তিনি কর্ম করলেও তার কর্তৃত্বাভিমান নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জনকের মতো অলিপ্তভাবেই থাকেন। রাজর্ষি জনক ছিলেন এমন ব্যক্তি যাঁর কর্মে কোনো আসক্তি ছিল না। মহাভারত থেকে আমারা এই শিক্ষাই লাভ করি—

'অনন্তং বট মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৭ম অধ্যায়, ১ শ্লোক)

অর্থাৎ আমার অনন্ত ঐশ্বর্য থাকতেও কিছু আমার নয়, সমগ্র মিথিলা যদি দগ্ধ হয়ে যায় তা হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হবে না। এটাই সেই কর্মযোগীর মহাবাক্য যিনি সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মের আবাস জ্ঞান করেন এবং সকল কাজকেই তাঁর কাজ মনে করেন।

অর্জুন সংশয়ে পতিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জ্ঞানের পথ এবং কর্মের পথ এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। ভগবান জানালেন উভয়পক্ষই মোক্ষলাভের অনুকূল।

তবে— 'জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩ শ্লোক)* সাংখ্যমার্গাবলম্বী বা জ্ঞানপন্থীদের নিকট জ্ঞান যোগ এবং কর্মযোগমার্গীর নিকট কর্মযোগই প্রশস্ত। গীতায় এই কর্মই এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কর্ম এবং জ্ঞান পৃথক হলেও উভয় পথই মোক্ষের দ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা যে কেবল গীতাতেই বলা হয়েছে তা নয় বেদও এই তত্ত্বকে প্রতিপাদন করেছে—

'দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠাতাঃ
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তৌ চ সুভাষিতঃ।।

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৪১-তম অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

অর্থাৎ 'দুই ধরনের জীবনেরই সমর্থন বেদে পাওয়া যায়, কর্মের পথ ও ত্যাগের পথ।' এই তত্ত্বই আবার উপনিষদে এইভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে—

'নিত্যোহনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ।।'

('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক)

'যিনি পৃথিবী প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য, ব্রহ্মাদি চেতন বিজ্ঞাতৃগণের মধ্যে চেতয়িতা এবং এক হয়েও যিনি বহু জীবের কামনা বিধান করেন, সেই আদিদেব ব্রহ্ম সাংখ্যমার্গে এবং যোগমার্গে উপলব্ধ হন। সেই ব্রহ্মকে জানলে মানুষ সকল বন্ধন হতে মুক্ত হয়।' জ্ঞান এবং কর্মভেদে এই দুই প্রকার নিষ্ঠা অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থাদিতেও স্থান পেয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের একটি মূল্যবান শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তা হল—

'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তণাশস্য যোগঃ জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগো বৃত্তি নিরোধো হি জ্ঞানাং সম্যগবেক্ষনম্।' *('যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ')*

'হে রাঘব! চিত্ত নাশের দুই পথ যোগ এবং জ্ঞান। চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধই যোগ ও প্রত্যক্ষ দর্শনই জ্ঞান' তা হলে পন্থা দুইটি আছে এবং তা সকল শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। কার পক্ষে কোন্ পন্থাবলম্বন করা অধিক মঙ্গলপ্রদ হবে? এক্ষেত্রে অধিকারীর প্রসঙ্গ দেখা দেয়। বস্তুত সব কাজেই সবার অধিকার জন্মায় না। বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। একজন নভচর যেভাবে মহাশূন্যে কালাতিবাহন করেন তা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কার কোন কাজে অধিকার তা গুরু স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারেন। বিদ্যালয় গৃহে কোনো ছাত্র কতটুকু জ্ঞান ধারণ করতে পারে তা বুঝে শিক্ষক মহাশয় সেই অবধি বা সেই প্রকার জ্ঞান বা

বিদ্যা তাকে দিয়ে থাকেন। কর্মে ব্যবসিত মনা অর্জুনকে খুব স্বাভাবিক কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের অধিকারী মনে করলেন এবং কর্মোপদেশ দিলেন। কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে সমতা বা সম্বন্ধ আছে তা পরিস্কার না হলে অর্জুনের পক্ষে কোনো বিশেষ পথ অবলম্বন করা সম্ভব নয় তাই ভগবান জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে তারপর কর্মসাগরে তরী ভাসালেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারছিলেন যে অর্জুনের প্রকৃতিই কর্মানুসারী সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও অর্জুনের প্রকৃতি তাকে কর্মে নিয়োজিত করবে। প্রাচীনকালে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় গুরুই নিরূপণ করে নিতেন যে কোন্ ছাত্রের কোন্ বিদ্যায় অধিকার। এর প্রমাণ ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণে রয়েছে— 'বিদ্যয়া সার্দ্ধং মৃয়েতে ন বিদ্যামুষরে বপেৎ।' *('ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', সন্তদাস বাবাজী, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১১৪)* বিদ্যার সাথে ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হবেন তথাপি উষর ভূমিতে বিদ্যাবপন করবেন না। অর্থাৎ অনধিকারী পাত্রে বিদ্যা দান করবেন না। মনু এই বাক্যের সমর্থন করেছেন এইভাবে—

'বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তবং ব্রাহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ।'

('মনুসংহিতা', ২য় অধ্যায়, ১১৩ শ্লোক)

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তন হলেও শিক্ষা প্রদানের এই নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তবে পূর্ব সমাজে জিজ্ঞাসুর ধারণা শক্তির উপর গুরুর দৃষ্টি রাখতে হত কারণ শিষ্য নিজেকে গুরুর পাদপদে সমর্পণ করতেন। এই অধিকারী ভেদের কথা স্মরণ করে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে এবং অধিকারীভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্মসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার গোলযোগের মূল পর্যন্ত একেবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোনো দেশের ধর্মপ্রণালীতে অধিকারী ভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ৮)* অর্জুন— 'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭ খণ্ডাংশ)* বলে গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন সেই পথ যে পথে তিনি মঙ্গল লাভ করতে পারবেন, 'যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২ শ্লোক)* শিষ্য শরণাগত হয়েছে দেখে ভগবান বললেন যে কর্ম তোমাকে করতেই হবে। কারণ কর্ম ছাড়া হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কখনও নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি হয় না আবার কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারা কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে

না। এই শ্রুতিতে দেখি অন্য কথা সন্ন্যাসিগণ পরমাত্মাকে জানবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন। '... এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।' *('বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ৪র্থ অধ্যায়, ৪ স্কন্দ, ২২ শ্লোক)* এই কথা স্মরণ করে গীতার গুরু উপদেশ করলেন চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানশূন্য কর্মসন্ন্যাস কখনও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ তাঁর নিজ নিজ প্রবৃত্তিজাত রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যে একবার দেহধারণ করেছে তাঁর কর্ম হতে নিস্তার নেই। মুক্ত পুরুষকে কর্মহীন বলা হয় এই অর্থে যে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন আর কর্মের দ্বারা সাধিত হয় না। তিনি কর্মবিমুখ হয়ে নিস্ক্রিয়তার মধ্যে পরম শান্তিতে বিরাজ করেন। ঠিক ঈশ্বর যেভাবে সকল কাজের মধ্যে থেকেও নির্লিপ্ত থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কর্মত্যাগ করা কতো সহজ কিন্তু নিতান্ত শ্বাসক্রিয়ারূপ যে কর্ম তা সহজে বন্ধ করা যায় না। এ পথ কারও কাম্য হতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরস্থ এই ভাব তাঁর কাব্য কুসুমে এই ভাবে বিকশিত হয়েছে —

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৪৩৭)

কবি চাইছেন —

'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৪৩৭)

এই কথাইতো গীতায় ভগবান বারবার অর্জুনকে বুঝাতে চাইছেন যে যাঁরা ভণ্ড ও মিথ্যাচারী তাঁরাই ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে কর্মত্যাগের ভান করেন কিন্তু তাঁদের মন ধাবিত হতে থাকে বিষয়ের দিকে সেই খ্যাপার মতন যে আজও নদীর কূলে কূলে পরশপাথর খুঁজে ফেরে। কিন্তু এটাতো মানুষের চরম চাওয়া বা পরম পাওয়া হতে পারে না। মানুষের উচ্ছেদ করতে হবে এই চাওয়া ও পাওয়ার মূলকে। কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

'বিপদে মোর রক্ষা কর এ নহে মোহ প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৫০২)

অতএব সকল কাজের উৎস যে বাসনা তাকেই ত্যাগ করলে প্রকৃত সংযম হবে তার জন্য 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করবার প্রয়োজন নেই। যিনি মন দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন করতে পারেন এবং অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে কর্মে

নিয়োজিত করতে পারেন তিনিই তো শ্রেষ্ঠ। এই কর্মের মূল প্রোথিত আছে পরমেশ্বরে। তাই ভগবান বললেন—

'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ১৫ শ্লোক)

কর্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হতে অর্থাৎ প্রকৃতি হতে এবং ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ পরমেশ্বর হতে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব কর্মের মূল রয়েছে পরমেশ্বরে। সকল কর্মের স্রষ্টা বা কর্তা তিনি অথচ কর্তৃত্বহীনতা ও নিষ্কামতাহেতু তিনি কিছুরই কর্তা নন এমনটি প্রতীত হয়। সমগ্র জগৎ সেই পরমেশ্বরের কর্মশালা। কবি কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে—

'বিশ্বপিতার মহাকারবার এই দীন দুনিয়াটা
মানুষই তাহার মহামূলধন কর্ম তাহার খাটা।'

('কাব্যমঞ্জুষা', 'চাষার ঘরে' কবিতা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১৪)

আবার সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে অনবরত কর্মযজ্ঞ সাধন করে চলছে। পৃথিবী ক্ষণকালের জন্যও তার আবর্তন কর্ম থেকে বিরত হয়নি। প্রতিদিন সূর্য চন্দ্র যথা সময়ে উদিত হয়ে কর্তব্যের নিষ্ঠা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। ইংরাজী সাহিত্যে কবি তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—

'One lesson, Nature, let me learn of thee
One lesson, that in every wind is blown,
One lesson of two duties serv'd in one,
Though the loud world proclaim their enmity

Still do thy sleepless ministers move on,
Their glorious tasks in silence perfecting,
Still working, blaming still our vein turmoil
Labourers that shall not fail, when man is gone.'

('Quiet Work' Matthew Arnold, English Prose and Verse Selections, P-156)

প্রকৃতি তার অতন্দ্র প্রহরীদের সাথে সর্বত্র সমভাবে কাজ করে চলছে। চন্দ্র সূর্য কারও আদেশের অপেক্ষা না করে যথা নিয়মে প্রত্যহ তাদের কাজ করে চলেছে। সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে কর্মত্যাগ করে নির্জনে বা দেবালয়ে তপস্যা করার প্রয়োজন নেই। তাঁর সাযুজ্য লাভ করতে হলে যেতে হবে সেখানে যেখানে চাষা মাটি ভেঙে চাষ করছে, পাথর ভেঙে পথ তৈরি করছে তাই কবি

আহ্বান করেছেন—

'রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৫১০)

দেবতা সর্বত্র ব্যপ্ত। উপনিষদের ভাষায় 'একো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী'। তিনি মন্দিরেও যেমন আছেন তেমনই বিশ্বভূবনেও আছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, যে আমি তোমাকে এখন যোগের উপদেশ দিচ্ছি। তুমি বুদ্ধির দ্বারা একে গ্রহণ করতে পারলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। অতঃপর বললেন—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক)* অর্থাৎ এই যোগ ধর্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও তা মহাভয় হতে তোমাকে পরিত্রাণ করবে। কিন্তু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে 'কর্ম কর' বললেই মনে হয় যে, যে কর্ম করার জন্য ভগবান আদেশ করেছেন তা কেমন কর্ম। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাধারণত নিজের বা স্বীয় পরিবারের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, যাতে স্বার্থবুদ্ধি আছে এইরকম কর্মই করে। আর যে কর্মে মঙ্গল নেই সেই কর্ম পরিহার করে। অর্থাৎ কাজ দেখেই তার অন্তিম ফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তা সন্তোষজনক হলে কর্মে লিপ্ত হয় নয়তো বা কর্ম পরিত্যাগ করে। গীতায় কিন্তু এরকম শিক্ষা দেওয়া হয়নি। সব কর্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করার নির্দেশ গীতায় দেওয়া হয়েছে। কর্মফল বিধান করবেন ঈশ্বর। কর্ম সৎ কি অসৎ, শুভ কি অশুভ তার বিচারক কর্মানুষ্ঠানকারীকে না হতে উপদেশ করা হয়েছে। গীতার মূল শিক্ষাই হচ্ছে কর্মযোগ। ঈশ্বর তাই বললেন—

'কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার আছে কর্মফলে কখনো নয়। কর্মফল লাভ যেন তোমার উদ্দেশ্য না হয় আবার কর্ম পরিত্যাগেও যেন কখনও ইচ্ছা না জন্মে।' এই অনাসক্তি যোগ যা গীতায় প্রতিপাদিত হয়েছে তার ভূমিকা বাস্তবিক জীবনে অনবদ্য। যে কোনো কর্ম অনাসক্ত চিত্তে করলে অর্থাৎ ফললাভের আশা না করে করলে তাই পূর্ণতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধ করলে কারা মরবেন বা না মরবেন সেই চিন্তায় অর্জুন বিষণ্ণ হয়েছেন সুতরাং তাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে তাদের জীবন এবং মরণ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সকল কর্ম তুমি

ঈশ্বরে সমর্পণ কর। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হও। মনের এই সমভাবকে বলা হয় প্রকৃত যোগ— 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক)* যিনি ফল লাভের আশায় কর্ম করেন তিনি পিতৃলোক প্রাপ্ত হন এবং সমবুদ্ধিতে যিনি প্রজ্ঞার সাধনা করেন তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হন। আচার্য শঙ্কর বলেন— 'দ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানুষং দৈব চ, তত্র মানুষং বিত্তং কর্মরূপং পিতৃলোক প্রাপ্তি সাধনম্, বিদ্যা চ দৈবং বিত্তং দেবলোক প্রাপ্তি সাধনম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* অনাসক্ত কর্মের মাধ্যমেই আমরা লাভ করতে পারি মুক্তি। অনাসক্ত কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ফলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। বিশ্বকবির ভাষায়— 'কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে যখন নিজের দিকে বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যে কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ঙ্কর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন, অলস, সেই রুদ্ধ যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা, স্বার্থপর, জগৎ সংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফল কে সে যে চিরদিনের মত আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই, এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়। তার কেবল পরিশ্রমই সার। অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরার্থের দিকে নিয়ে যাওয়া মুক্তির কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে কোনো কর্মই করি তা ছোটো হোক আর বড়োই হোক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রীড়ার সঙ্গে তাকে যোগ যুক্ত করে দেখলে সে কর্ম আমাদের আর আবদ্ধ করতে পারে না। সেই কর্ম সত্য কর্ম মঙ্গল কর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে ওঠে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ৯২)* সুতরাং কর্মফলে কোনোরকম আকাঙ্ক্ষা না করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হয়ে কার্য করবার জন্য অর্জুন উপদিষ্ট হলেন। যিনি সমবুদ্ধিতে অবস্থান করেন অর্থাৎ যিনি স্থিতধী তিনি শুভ এবং অশুভ উভয়ই বর্জন করতে সক্ষম হন। হে অর্জুন! 'তস্মাদ যোগায় যুজস্য যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৫০ শ্লোক)* তুমি যোগযুক্ত হবার

চেষ্টা কর, কর্মের এই যে বিশেষ কৌশল, এই স্থিতধী হয়ে থাকা এটাকেই যোগ বলা হয়। অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করবার এই যে উপদেশ ভগবান্ গীতায় দিলেন তার সমর্থন মহাভারতের অন্যত্রও দেখা যায়। শান্তিপর্বে শুকের এক প্রশ্নে দেখা যায়—

'যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছন্তি কর্মণা।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৪১-তম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কর্ম কর' এবং 'কর্ম বর্জন কর' এই দুই বেদের আজ্ঞা, তাহলে জ্ঞানের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয় আর কর্মের দ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয়? এর উত্তম মহাভারতে দুইভাবেই প্রদত্ত হয়েছে। শান্তিপর্বে আছে—

'কর্মণা বধ্যতে জন্তুবিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।'

('মহাভারত'. শান্তি পর্ব, ২৪১-তম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

জীব কর্মদ্বারা বন্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় সেই কারণে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কর্মকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কর্মে বন্ধন হয় না হয় কর্মে আসক্তি প্রকাশ করলে। গীতায় তাই বলা হয়েছে— 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়. ৪৮ শ্লোক) হে ধনঞ্জয়!* আসক্তি পরিত্যাগ করে সফলতা ও বিফলতাকে সমান জ্ঞান করে যোগস্থ হয়ে কার্য করে যাও। তাই মহাভারতেও দেখা যায়— 'তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।' *('মহাভারত', অশ্বমেধ পর্ব, ৫১ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)* সেই জন্য যে সব ব্যক্তিরা পারদর্শী বিদ্বান হন তাদের কখনও কর্মসমূহে আসক্তি থাকে না। কর্মের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগেই কর্ম নিষ্কাম হয়। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে—

'তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যাজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মানিমান্ সর্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ।'

('মহাভারত', বন পর্ব, ২য় অধ্যায়, ১ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কর্মানুষ্ঠান কর' এবং 'কর্ম পরিহার কর' এই উভয়ই বেদের রচনা। সুতরাং শ্রেয়োলাভেচ্ছু কর্মাধিকারী পুরুষ পূর্বোক্ত কর্মাত্মক ধর্মসকল অভিমান শূন্য হয়ে পালন করবে। এই স্থলেও এটাই প্রতিপাদ্য যে কর্মে যাঁর অধিকার আছে সেই ব্যক্তি অভিমান শূন্য হয়ে কর্ম করবেন। কর্ম পরিত্যাগ করে কেউ কখনও মুক্তি লাভ করতে পারেননি। পরন্তু কর্মফল লাভের ঐকান্তিক বাসনা পরিত্যাগ করে জনকাদি পূন্যাত্মাগণ মোক্ষ লাভ করেছেন। তাই কামনা পরিত্যাগ করে প্রথম স্থিতপ্রজ্ঞ হতে

হবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাই বলেছেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমগচ্ছতি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭১ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করে নিস্পৃহ এবং অহংকার শূন্যভাবে কর্ম করেন তিনিই শান্তি লাভ করেন। এটা গীতায় প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলোর মধ্যে মুখ্য। কর্ম ত্যাগ নয়, এই ত্যাগ এমনই ত্যাগ যাতে মানুষে পরম প্রাপ্তি ঘটে। ত্যাগের দ্বারা লাভ করার এই অভিনব পন্থা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা অত্যন্ত বিরল। উপনিষদ বলে— 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।' *('ঈশোপনিষদ', ১ম মন্ত্র)* বিশ্বকবির লেখনীতে এই ভাব রূপ পরিগ্রহ করছে এইভাবে— 'ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায় কিন্তু ঘোড়া কি বলতে পারে 'গাড়িটা আমার'? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাৎ কী? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ির চালায় গাড়ির উপর কর্তৃত্ব তারই। যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এই জন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে, নইলে কর্মের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হইনে। অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ২০)* এইরূপ অবস্থা লাভ করবার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নরকের দ্বারা স্বরূপ যে শত্রুগুলো আমাদের মধ্যে সর্বদা বিরাজ করে তাদের মূল উচ্ছেদ করতে হবে। তাঁরা সকল সময় চাইবে মানুষকে তাঁর লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট করতে। সেই কারণে বনে বসে সাধনা করলে কামনা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটবে। যোগী পুরুষের তা অভিপ্রেত হতে পারে না। যেখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই সেখানে সাহস প্রদর্শন করতে সকলেই পারে কিন্তু—

'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।'

('কুমার সম্ভব', কালিদাস, ১ম সর্গ, ৫১ শ্লোক)

অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমকারী ভোগ্য বিষয় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তারাই প্রকৃত ধীর। তাই ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজের বশে রেখে স্বকর্ম সম্পাদন করতে হবে। সুখাদ্য আহারও কতর্ব্য আবার অপেক্ষাকৃত কুখাদ্য ভক্ষণও

অকর্তব্য নয়। কুচিত্রকে সুচিত্রের মতন দেখাই কতর্ব্য। বক্তব্য এটাই যে ভালর প্রতি আকর্ষণ এবং মন্দর প্রতি বিকর্ষণ বোধ পরিহার করা। এই কথাই অন্তরে অনুধাবন পূর্বক গীতার প্রবক্তা বলেছিলেন—

'সুখ দুঃখ সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)

অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখে, লাভে এবং অলাভে সমান স্থান করে যুদ্ধ করলে কোন প্রকার পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটাই ভগবদবাক্যের আশয়। এরকম সমত্ব ভাব লাভ করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন আত্মনিষ্ঠ হওয়া। অর্থাৎ আত্মাতেই তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হয়ে অবস্থান করা। এইরকম ব্যক্তির কর্তব্য বা অকর্তব্য বলে কিছুই থাকে না। এ পর্যন্ত ভগবান অর্জুনকে কেবলই উপদেশ দিয়ে এসেছেন যে এটা কর, এইরকম হও ইত্যাদি। কিন্তু এরপর শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশকে উর্দ্ধভূমি থেকে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করবার জন্য উপদেশের বাস্তবতা দেখালেন। উপদেশ তখনই সফল হবে যখন সেই উপদেশ কেউ বাস্তবে পালন করবে বা অনুসরণ করবে। অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী অনুসরণ করেন তা হলে অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করবে। গীতায় একেই বলা হয়েছে— 'লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।' অর্থাৎ জগৎকে রক্ষার জন্যও তোমার কাজ করা উচিত। জগৎ রক্ষা তখনই হবে যখন সাধারণ লোক মহৎ লোকের কাজগুলো দেখে নিজেরা সেরকম কর্মে আত্মনিয়োগ করবেন। কারণ—

'যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

অর্জুনকে পথ প্রদর্শক হতে ভগবান উপদেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন অনুপ্রেরণা পাবেন কাকে দেখে? এমন কাউকেও অর্জুনের সামনে প্রতিষ্ঠাপিত করা প্রয়োজন যাকে দেখে অর্জুন নিরাসক্তভাবে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারবেন। এই প্রয়োজনের অনুরোধেই গীতা উদ্গাতা অর্জুনের সামনে নিজেকে পথ প্রদর্শক হিসাবে উপস্থিত করে বললেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবং চ কর্মণি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

'হে পৃথার তনয়! ত্রিভুবনে আমার এমন কোনো কর্তব্য নেই যা না করলে

নয়, এমন কিছু পাবার নেই যা আমার অধিগত হয়নি তবুও আমি কর্মে প্রবৃত্ত হই।' সাধারণ মানুষের মনে সংশয় আছে যে গীতার উপদেশ বাস্তব জীবনে অর্থহীন। উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ঈশ্বরই হবেন তবে তাঁর এই পরিবর্তনশীল সংসারে কর্ম করবার প্রয়োজন কী? এই সংশয়ের উত্তর আলোচ্য শ্লোকে সূচারুরূপে ব্যক্ত হয়েছে। যাঁর পাবার আর কিছুই নেই যিনি সব পেয়েও কর্ম করে চলেন তাঁর কর্ম করবার পশ্চাতে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য যা লোকশিক্ষার নামান্তর। তিনি অবধারণ করেছেন যে তিনি যদি অবিশ্রাম কর্ম সম্পাদন না করেন তা হলে লোকে তাঁকে সর্বথা অনুসরণ করবে। ফলে কর্ম প্রবাহ ছিন্ন হওয়ায় জগৎ উৎসন্ন হবে এবং তিনিই হবেন লোক ধ্বংসের কারণ। এখানে ভগবান নেমে এসেছেন সকল মানুষের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সর্বপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন— 'দিব্য জীবন এবং সাংসারিক জীবন পরস্পর বিরোধী নয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. রাধাকৃষ্ণণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩৪)* দিব্যজীবনকে অনুসরণ করে রোগ, শোক, জন্ম, জরাগ্রস্ত সাংসারিক মানুষ অনাসক্ত কর্মের মধ্য দিয়ে সেই দিব্য জীবনে উৎক্রমণ ঘটাতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর নিরলস কর্মের দ্বারা লোক শিক্ষা দেবেন। এটা গীতার এক প্রধান বক্তব্য। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন— 'নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালোবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।' *('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', মৌসুমী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১২)* এই লোকশিক্ষার প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষকতা কর্মে নিয়োজিত হবার জন্য বললেন— 'কর্মে আসক্ত, অভিনিবিষ্ট হয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন কর্ম করে অনাসক্ত হয়, জ্ঞানিগণও তেমনি লোকশিক্ষার্থে নানা প্রকার শুভ কর্ম করেন।' তাদের এই কর্ম দেখে সাধারণ লোক কর্মে প্রবৃত্ত হবেন। কারণ—

'তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো মুনির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃস পন্থা।'

('মহাভারত', বনপর্ব, ২১৩-তম অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

মহাভারতে এই কথাইতো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এরপর উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অহংবোধ পরিত্যাগ করে নিরলসভাবে কর্ম করে যেতে বললেন। প্রাকৃতিক গুণসকল যে কার্য করায় মোহগ্রস্ত লোক তাকেই 'আমার কাজ' বা 'আমি করি' বলে কর্মে কর্তৃক প্রদর্শন করেন. কিন্তু এটা তারা ভুলে যান যে—

'সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ।

পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা

স্বকর্মসূত্র-গ্রথিতো হি লোকঃ।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব)*

তাই যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে পথ দেখাবেন এবং সে কর্ম অবশ্যই ত্রিবিধ দোষ মুক্ত হবে। অর্থাৎ এই কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তাতে আসক্তি থাকবে না এবং সর্বোপরি সেই কর্ম হবে কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এইরকম কর্মের মধ্যে দিয়ে অর্জুনকে বললেন যে তাঁর কর্মধারা এবং উপদেশ অনুসরণ করতে। কিন্তু তাঁর মনে হয়ত সংশয় ছিল যে অর্জুন তা পারবে কিনা, তাই তিনি শরণাগত বীরকে এক মহত্তম শিক্ষা দিয়ে বললেন—

'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)

অর্থাৎ সমস্ত কর্ম আমার মধ্যে সমর্পণ করে সমগ্র চেতনাকে আত্মাতে নিবদ্ধ করে অহং জ্ঞান বর্জন পূর্বক জ্বরমুক্তভাবে নিষ্কাম কর্ম সাধন কর। ভগবান অর্জুনকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি হল মানুষের চরম শত্রু। এদের সংযত করতে হবে, ইন্দ্রিয়গুলোকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রেখে। কামনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। কাম্য বস্তুর লাভের সঙ্গে সঙ্গে কামনা বাড়তে থাকে। সংহিতাকার মনু বলেছেন—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।' *('মনুসংহিতা', ২য় অধ্যায়)*

সুতরাং হে অর্জুন! তোমার প্রতি এটাই আমার নির্দেশ যে— 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ৩ শ্লোক)* অর্থাৎ তুমি কামরূপ অজেয় শত্রুকে জয় কর। আগেই বলা হয়েছে যে ভগবান নিজে অর্জুনের কাছে আত্মপ্রকাশ করে তাঁকে পথ দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের আবির্ভাবের কারণ ঘোষণা করে তারপর বললেন যে, 'আমাকে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে পূরাকালে প্রাচীন ঋষিগণ যা করেছিলেন তুমিও সেভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হও।' ভগবান বলেছেন যে কর্মের গতি দুর্বোধ্য— 'গহনা কর্মাণো গতিঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)* কোনটা কর্ম এবং কোনটা অকর্ম তাও সকল সময়ে যথার্থভাবে নিরূপণ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবে নিরাসক্তভাবে কর্ম করাই সর্বথা শ্রেয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম ও সন্ন্যাসের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিপাদন করে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিমে সিদ্ধান্ত করেছেন— 'তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)* অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন জানতে চেয়েছেন— 'কিং

কর্ম পুরুষোত্তম' কর্ম কী? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন—

'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ যে সৃজনী শক্তির দ্বারা ভূতসকল উৎপন্ন হয় তাকেই কর্ম বলে। অতএব যে বিশ্বজাগতিক কর্মে ভগবান অর্জুনকে প্রেরণা দিচ্ছেন সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সমগ্র ভূতবর্গ শক্তি কর্তৃক সম্ভূত হয়েছে। তবে কর্ম করতে বাধা কোথায়? তাই সমগ্র গীতায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কর্মে প্রেরণা দেবার মূল মন্ত্র। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)* অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর। জয় পরাজয়ের চিন্তা বিসর্জন দাও।

'তস্মাৎ তমুত্তিষ্ট যশোলভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্য সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)

তুমি ওঠ এবং জয়লাভ কর শত্রু জয় করে রাজসম্পদ ভোগ কর। তাঁরা আমার দ্বারা আগেই নিহত হয়েছে। তুমি শুধু তাদের নিধনের নিমিত্ত মাত্র হও। তোমার কর্তব্য কর্মে যদি কখনও সংশয় দেখা দেয় তাহলে তুমি শাস্ত্রীয় বিধানের উপর নির্ভর করবে। শাস্ত্রের বিধান কীরূপ তা জেনে সংসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত— 'জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৬শ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)* অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চূড়ান্ত মত ব্যক্ত করেছেন—

'এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গাং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

অর্থাৎ যে কর্মের কথা বলা হল তাদের মধ্যে ফলের প্রত্যাশা না করে নিরাসক্তভাবে করতে হবে। হে পার্থ এটাই আমার চরম ও দৃঢ় মত। ঋষি অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন— 'ভগবান গুরুরূপে অর্জুনকে এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়েই তপস্বী জীবনের পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে লইয়া যাইতে পারতেন। অথবা এখনই তাঁহার তামসিক বিরাগকে পবিত্র করিয়া সাত্ত্বিক সন্ন্যাসের অসাধারণ উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু, বাস্তবিক তিনি এই দুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামসিক বিরাগ এবং সন্ন্যাসের প্রতি ঝোঁককে নিন্দা করিলেন এবং অর্জুনকে কর্ম করিতে এমনকি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার শিষ্যকে আর এক সন্ন্যাস, আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয়া দিলেন। অর্জুনের যে সমস্যা তাঁহার ইহাই প্রকৃত মীমাংসা। এই রূপেই বিশ্বশক্তির উপর আত্মপ্রাধান্য

লাভ করিবে অথচ সংসারে স্বাধীন ও শান্তভাবে কর্মও করিতে পারিবে। বাহ্য সন্ন্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ ত্যাগ-কামনা, বাসনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষা।' *('গীতা নিবন্ধ', শ্রীঅরবিন্দ, অনিলবরণ রায় সম্পাদিত, ১৯৭১, পৃ. ৪৭)*

জ্ঞান প্রসঙ্গ

আলোচ্য অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে গীতায় প্রচারিত ধর্মমতকে বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুকূলে বিবৃত করছেন। গীতায় কর্মের প্রাধান্য থাকলেও জ্ঞান সেখানে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্ম তাঁর মতে জ্ঞান লাভের এক সোপান মাত্র। সুতরাং পরবর্তী কালে তাঁর সম্প্রদায় তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অভিমতকেই দৃঢ় করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও 'জ্ঞান লাভ করার পর আর কোনো কর্ম থাকে না' তাঁর এই মত সকলের কাছে সমাদর লাভ করেনি। সমগ্র গীতাগ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই জ্ঞান ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে। কর্ম এবং জ্ঞান এই দুইটিই স্বতন্ত্র নিষ্ঠা হিসাবে গীতায় স্বীকৃত হয়েছে—

'লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাংখ্য বলতে বা সাংখ্যমার্গ বলতে গীতায় জ্ঞান এবং জ্ঞান পক্ষপাতিগণকে বোঝানো হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই মনে হতে পারে দুটি নিষ্ঠার কথা যখন বলা হল এবং তাঁরা স্বতন্ত্র তাহলে উভয়ের আলোচনার প্রয়োজন কী? কর্মযোগী অর্জুনের জন্য কর্মইতো প্রশস্ত, জ্ঞানে তাঁর তৃষ্ণা নিবৃত্ত হবে কী? শঙ্করাচার্যের মতে এই জ্ঞান লাভ হল পরে আর কর্ম করবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে— 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৩ পরার্দ্ধ)* হে পার্থ! সকল কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। অতএব বিরোধ থাকলেও এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক গীতাসমন্বয় প্রদর্শনকালে আলোচিত হবে। বর্তমানে এটাই উল্লেখ্য যে জ্ঞান এবং কর্ম পরস্পর বিরোধী নয়।

অর্জুন প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত উপদেশ গ্রহণ করে প্রশ্ন করলেন বা জানতে চাইলেন জ্ঞান ও জ্ঞেয় কী? বস্তুত তিনি জ্ঞান লাভের উপায় কী, জ্ঞান লাভ করে কার কী হতে পারে সকলই শুনেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান বলতে ঠিক কী বোঝায় বা একজন যথার্থ জ্ঞানীর মধ্যে কী কী গুণ থাকে এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে

বলেন— 'এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৩শ অধ্যায়, ১ পরার্দ্ধ)* এর উত্তরে ভগবান জ্ঞানের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন— 'নম্রতা, সাধুতা, অহিংসা, ধৈর্য, সরলতা, গুরুসেবা, শুচিতা, স্থৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বৈরাগ্য, নিরহংকার, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, দুঃখ ইত্যাদির দোষানুধাবন, অনাসক্তি, পুত্র, দারা গৃহাদিতে অতিরিক্ত মায়া না থাকা, ইষ্ট ও অনিষ্টে সর্বদা সদ্ভাব, আমাতে ঐকান্তিক ও অচলা ভক্তি, নির্জন স্থানে বাস ও জনতা সমাগমে বিতৃষ্ণা, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য সম্বন্ধে অর্ন্তদৃষ্টি ইহাদেরই জ্ঞান বলা হয় ইহা ছাড়া বাকি সবই অজ্ঞান।' শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে কুড়িটি বিষয়কে জ্ঞানের সংজ্ঞা দেবার জন্য নির্ণয় করলেন। একজন প্রকৃত জ্ঞানী হবেন তখনই যখন তিনি উপরের গুণগুলোর অধিকারী হবেন। কিন্তু সেই জন্য কেউ যদি এই গুণগুলোকে অধিগত করার জন্য সচেষ্ট হন তা হলে ফলকামনা যুক্ত কর্ম করার জন্য কর্মযোগ মার্গ হতে ভ্রষ্ট হবেন। ভগবান অর্জুনকে কেবলমাত্র জ্ঞানীর স্বরূপ বোঝাবার জন্য এরকম বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য লাভ করেন, পরমাত্মাকে জানতে চেষ্টা করেন তবে তিনি বিনা আয়াসেই উপরিউক্ত গুণগুলো লাভ করে প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য হবেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলেছেন— যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকতে মুক্তি নাই। গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে। আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে। তাই ওদের কত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে আমি, আর 'ম্যায়' মানেও আমি। 'আমি' 'আমি' করে বলে কত কর্ম ভোগ। শেষে নাড়ী ভুড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে তুঁহু তুঁহু বলে, অর্থাৎ তুমি তুমি। তুমি তুমি বলার পর তবে নিস্তার। আর ভুগতে হয় না। হে ঈশ্বর তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান।' *('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২৪৬)* এই জ্ঞান লাভ করার জন্যই চাই ধ্যান, ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে সমর্পণ করা। এই কথা ভগবান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'ধ্যানযোগে' প্রতিপাদিত করেছেন। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য তাকে 'সর্ব সকল্প সন্ন্যাসী' হতে হবে। সকল প্রকার উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম যা করার আগে নির্দিষ্ট কোনো সঙ্কল্প নিয়ে করতে হয় তাই পরিহার্য। সঙ্কল্প ত্যাগের কথা বলা হয়েছে কারণ সঙ্কল্প থেকেই জন্মায় কামনা, বাসনা। মনু তাই বলেছেন—

'সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভাবাঃ।'

('মনুসংহিতা', ২য় অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

যজ্ঞাদিকর্ম, পূজা, জপ, তপ ইত্যাদির আরম্ভেও থাকে সঙ্কল্প। সুতরাং তাও কর্মযোগীর পক্ষে শ্রেয় নয়। মহাভারতকার বলেন—

'কাম, জানামি তে মূলম্ সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ৭৭শ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

অর্থাৎ হে কামনা! আমি তোমার মূল জানি, তুমি সংকল্প বা চিন্তা হতে উদ্ভূত। আমি তোমার চিন্তা ত্যাগ করলেই তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। আত্মাই আমাদের কাছে বন্ধু এবং আত্মাই আমাদের কাছে শত্রু। যে আত্মাকে আত্মদ্বারা জয় করতে পারে আত্মাই তার বন্ধু। যে আত্মাকে নিজ আয়ত্তে আনতে পারেনি আত্মা তাঁর কাছে শত্রু। বিশ্বাত্মার সাথে জীবজন্তুর কোনো প্রভেদ নেই। জীবাত্মা সকল প্রকার প্রাপ্তির আশা বর্জন করে নিরাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন করবে। বিভিন্ন ঘটে বা পটে যেমন ঘটাকাশ বা পটাকাশ থাকে এবং বিনষ্টির পর এই ঘটাকাশ বা পটাকাশ অনন্ত আকাশের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে। তেমনই প্রত্যেক জীবের অন্তরস্থিত জীবাত্মা আপন নিরাসক্ত কাজ এবং স্বোপার্জিত পুণ্য বলে ঘটরূপ শরীর থেকে বিশ্বাত্মার মধ্যে উৎক্রমণ করে। আত্মকে জয় করার পরে পরমাত্মা তাতে সমাহিত হন এবং এইরূপ ব্যক্তি তখন সুখ, দুঃখ, শীত-উষ্ণ, মান-অপমান প্রভৃতির দ্বারা বিচলিত হন না। অতঃপর ভগবান আত্মজয়ের জন্য যা করণীয় তার উপদেশ করেছেন। শুচি আসনে নির্জন স্থানে বসে ঈশ্বর সাধনা করতে হবে, অন্যথায় বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয় সংযোগবশত মন বিচলিত হতে পারে। এভাবে যাঁর আত্মা যোগ দ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তিনি আত্মকে সর্বভূতে এবং ভূতবর্গকে আত্মার মধ্যে দেখতে পান। তখন তিনি— 'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)* অর্থাৎ চিরন্তনের সংস্পর্শে এসে অনন্ত আনন্দোপভোগ করেন। এরূপ আত্মদর্শনের পর ভগবান বললেন— 'যে আমাকে সর্বত্র দর্শন করে এবং আমার মধ্যে সকলকে দর্শন করে তাঁহার কাছ থেকে আমি দূরে যাই না সেও আমার সান্নিধ্যে থাকে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এখানে সাধারণের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে যে আত্মদর্শন, জীবাত্মা, বিশ্বাত্মা ইত্যাদির কথা বলতে বলতে বক্তা স্বয়ং বলছেন— 'যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং সবকিছুই আমার মধ্যে দেখতে পান'— তাহলে যিনি উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেকে সর্বব্যাপী বলে প্রচার করছেন তাঁর স্বরূপ কী? এর উত্তর রয়েছে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে। সেখানে ভগবান এই কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে 'এই যোগ যা তোমাকে বলছি তা নূতন নয়, এটা আমি আগে সূর্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য

তার তনয় মনুকে বলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এভাবে সেই যোগ রাজর্ষিগণ জ্ঞাত হয়ে কর্ম করেছেন। কালপ্রভাবে সেই যোগ লুপ্ত হওয়ায় পুনরায় তোমাকে বলছি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ১০২ শ্লোক)* ভগবানের এই বাক্যের সমর্থন মহাভারতের অন্যত্রও পাওয়া যায়—

'এবমেষ মহান্ ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাস বিধি কল্পিতঃ।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ৩৪৬-তম অধ্যায়, ১০ শ্লোক)

অর্থাৎ হে মহারাজ! এই ধর্মই তোমাকে আগে হরিগীতা অর্থাৎ ভগবদ্গীতাতে সমাস বিধি সহ বলেছি। সূর্য, মনু, ইক্ষ্বাকুক্রমে এই জ্ঞান যে সকলে লাভ করেছেন এর সমর্থনও মহাভারতে আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

'ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ।।
ইক্ষ্বাকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ৩৪৮-তম অধ্যায়, ৫১, ৫২ শ্লোক)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই ভাগবত ধর্ম যা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে উপদেশ করেছেন তা নূতন নয়, এটা পুরাতন লুপ্ত যোগ। বস্তুতপক্ষে ধর্ম প্রবৃক্তাগণ কেউই মৌলিকতার দাবী করেন না। যে ধর্ম আগেও ছিল সেই ধর্মকে তাঁরা নব নব রূপে বিস্তার করেছিলেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যা জ্ঞান, যা সত্য তার কোনো স্রষ্টা নেই। সত্য অনন্তকাল ধরে সত্যই থাকে। তার ক্ষয় হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ সত্য মিথ্যাকে পৃথক করতে না পেরে মোহগ্রস্ত হয়। কবি বলেন—

'সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহু যত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরের বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।'

('রবীন্দ্র রচনাবলী', ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, পৃ. ৩৪৭)

সর্ব সাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গালের জন্য ধর্ম প্রবৃক্তাগণ সেই ফিরে আসা জ্ঞান ও সত্যধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 'সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন, তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখিলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে

পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ১৫৯)* এই আনন্দ বিধানকারী রূপেই ঈশ্বরের অবতরণ। আগেই উল্লেখ হয়েছে যে অর্জুন অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য। ভগবান কোনো কথাই তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচরে বলতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণের সকল উপদেশই অর্জুন স্বকীয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে তাকে গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনি এই ধর্ম বা যোগ সূর্যকে বলেছেন কিন্তু সূর্যের জন্মের বহু পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। সুতরাং এটা কি প্রকারে সম্ভব? অর্জুনের সংশয়োত্থিত এই অসম্ভাব্যতা নিরাকরণের জন্য ভগবান বললেন যে আমার বা তোমার এই প্রথম জন্ম নয়। বলাবাহুল্য যে, এখানে জন্ম অর্থাৎ শরীর গ্রহণই বিবক্ষিত। ভগবান বললেন যে, 'এই জন্মের পূর্বে তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম। কিন্তু তোমার তাহা স্মরণ নাই কিন্তু আমার আছে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৫ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* ধর্ম প্রবৃত্তাগণের মুখে এই প্রকার কথা অন্যত্রও শোনা যায়। বুদ্ধদেবের বহু জন্মের কাহিনি সর্বজন বিদিত। ভগবান বুদ্ধের আগের জীবনের ছোটো ছোটো উপদেশমূলক গল্পকে বৌদ্ধগণ জাতক নামে অভিহিত করে থাকেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু স্পষ্টই বলেছেন যে তিনি আব্রাহামের আগেও ছিলেন— 'Jesus said in to them, Verilly. verilly. I say unto you. Before Abraham was I am.' *(Bible, New Testament, 'জন্', ৮ম অনুচ্ছেদ, ৫৪ সংখ্যা)* সুতরাং ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণের জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকৃত হয়। ভারতীয় সনাতন ধর্মের অধিকাংশ সম্প্রদায় জীবের জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করে থাকেন কিন্তু সাধারণ জীব আগের জন্মের বৃত্তান্ত পরজন্মে স্মরণ করতে পারে না। কেবলমাত্র আগের জন্মের পুণ্য ফলে কেউ কেউ স্মরণ করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর যখন দেহ ধারণ করেন তখন তিনি আগের জন্মের সকল বিষয় নিখুঁতভাবে ধারণ করতে পারেন। এই কথা অর্জুনকে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে তিনি স্বীয় প্রকৃতিতে থেকে স্বীয় মায়া দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করে থাকেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বললেন অবতারবাদের সেই চরম তত্ত্ব—

> 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

অর্থাৎ যখন ধর্মের বিলয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন ভগবান নিজেই নিজের মায়াশক্তির সাহায্যে অবতীর্ণ হন। তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করেন, দুষ্টদের বিনাশ সাধন করেন এবং ধর্মের পুনঃস্থাপন করেন। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কেবল পারলৌকিক ধর্ম নয়, কিন্তু চার বর্ণের ধর্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও এতে মুখ্যরূপে সমাবেশ হয়। প্রত্যেক মানবের অন্তরে এই ভগবান অবতার রূপে প্রকট

আছেন। মানুষ যেদিন তাঁকে জানতে পারে তখনই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ জ্ঞান হয়। নর অর্থাৎ জীবাত্মা ঠিক সেই দিন অবধারণ করতে পারে যে সে নারায়ণ অর্থাৎ বিশ্বাত্মার অংশ তখনই চরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। ভগবান মিত্ররূপে আমাদেব অন্তরে সর্বদা বিরাজ করেন। আমাদের হৃদয় রথের তিনিই সারথি— 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬১ শ্লোক)* 'মানুষের মধ্যে হৃষীকেশ অন্তর্যামীরূপে চিরদিনের জন্যই অবতার—এই অন্তর্যামি ভগবান যখন মানব শরীর, মানব-মন-বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন, পথ দেখান, চালিত করেন তখন তিনি বাহ্য জগতে অবতার রূপে প্রকট হন।' *('গীতা নিবন্ধ', শ্রীঅরবিন্দ, অনিলবরণ রায় সম্পাদিত, ১৯৭১, পৃ. ৯)* এটাই অবতরণের মূল কথা। ঈশ্বরের মনুষ্য শরীর গ্রহণ ভাগবত এইভাবে ব্যক্ত করেছে—

'যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ।।'

('মহাভারত', নবম পর্ব, ২৪শ অধ্যায়, ৫৬ শ্লোক)

যখনই ধর্মের ক্ষয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই সর্ব শক্তিমান হরি নিজেকে সৃজন করেন। যদিও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, অজর, অমর, তথাপি মানুষের অজ্ঞতা। মানুষের স্বার্থপরতাকে বিনাশ করার জন্য মনুষ্য শরীর ধারণ করেন। বিষ্ণু পুরাণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে দেখতে পাওয়া যায়— 'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরমব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।' কিন্তু সাংসারিক সুখ ভোগাচ্ছন্ন মানুষের মনে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে ভগবানের মনুষ্য দেহ ধারণ করার প্রয়োজন কী? তিনি অলক্ষ্যে থেকেই তো সব কাজ সম্পাদন করতে পারেন বা মানুষের অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করতে পারেন। ভগবান এইরূপ করতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দেহ ধারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পিতা যখন পুত্রকে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দান করেন তখন যদি তিনি পিতৃত্বের মর্যাদা লঘু করে সন্তানের সাথে একাত্মতা অনুভব করে শিক্ষা দিতে পাবেন তাহলে সেই শিক্ষাতেই সন্তান পূর্ণতা লাভ করতে পারে। সন্তানের মনে পিতার সম্বন্ধে যে একটি মহৎ ভাব বা মহাভয় থাকে পিতা যদি তা দূর করে দেবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে কঠিন শিক্ষা গ্রহণ করেও সন্তান অপার আনন্দ লাভ করতে পারে। বাস্তব জগতে যদি কখনো কেউ অপেক্ষাকৃত অধস্তন কাকেও কোনো প্রকার শিক্ষা প্রদান করতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাকেও নেমে আসতে হয় সেই কর্মভূমিতে যেখানে তিনি সকলের সাথে মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসটিকে। যদিও তা উপন্যাস তাহলেও বাস্তবের নিখুঁত চিত্র

তাতে অঙ্কিত থাকায় প্রসঙ্গানুসারে উল্লেখিত হল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশের চরম দুর্দশা হয়েছিল কেবলমাত্র 'লোক সংগ্রহ' করতে গিয়ে। তাই বিশ্বেশ্বরী তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন— 'বাইরে থেকে এসে ছুটে গিয়ে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত, সে কাজ এমন কঠিন, আগে যে মিলতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে মন্দতে এক হতে না পারলে কিছুতেই ভাল করা যায় না।' *('শরৎ রচনাবলী', শতবার্ষিক সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২)* ঈশ্বরও অনুরূপভাবে আবির্ভূত হন মানুষের মধ্যে মনুষ্য শরীর গ্রহণ করে। বিষ্ণু জগতের মঙ্গল বিধায়িনী শক্তি তাই অধিকাংশ স্থানে বিষ্ণুর অংশেই অবতার জন্ম গ্রহণ করেন। এর আর এক প্রয়োজন হল প্রতীক উপাসনা প্রচলন করা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বত্রগামী। 'আমার তোমার সকলের মধ্যেই তিনি আছেন এবং আমি তুমি সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থান করছি'—এই জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান যতদিন মানুষ লাভ করতে না পারে ততদিন ঈশ্বর যে স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর সেই প্রতীকের উপাসনা করে মুক্তি লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারা যায়। ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

'অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্।।'

('ভাগবত', ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

অর্থাৎ 'সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে যতদিন আপনার মধ্যে অবস্থিত বলে অনুভব করতে না পারবে ততদিন মানব আপনার আশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান করে প্রতীকাদিতে আমার উপাসনা করবে।' মানুষের সাথে সমভূমিতে ঈশ্বর এসেছেন এবং আমাদের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে সুখ, দুঃখে সকল কর্মে তিনি নিয়োজিত আছেন, এই ভাব থেকেই মানুষ ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট হবে। তিনি নিজে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন যে, এরকম কর, এটাই সর্বাধিক মঙ্গলজনক। প্রাচীন সাহিত্যের এক সুপরিচিত কাহিনিতে গুরুদেব শিষ্য তনয়কে মিষ্টান্ন খাবার লোভ ত্যাগ করতে বলেছিলেন নিজে অভ্যাসপূর্বক সেই লোভ আগে ত্যাগ করে। বঙ্গসাহিত্যের কবিশেখর কালিদাস রায় তাকে এরকম ভাষায় ব্যক্ত করেন—

'নিজে লোভ ত্যজি দিনু উপদেশ লোভ করিবারে জয়,
আপনি আচরি ধর্ম অপরে ধর্ম শিখাতে হয়।।'

('গাথা মঞ্জরী', কালিদাস রায়, পৃ. ৪৪২)

বস্তুতপক্ষে 'প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ।' *('বাণী*

ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১১) ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণের এটাই সুফল। ভগবান লোকহিতার্থে অধর্মের বিনাশের জন্য স্বীয় মায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এটা গীতায় সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী কারণে জন্ম মরণশীল এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে? এর উত্তরও ভগবান গীতায় অর্জুনকে বলেছেন। সগুণ ব্রহ্মের লীলাভূমি হল এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্বাত্মা বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে। জীবাত্মা সাংসারিক বিভিন্ন বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয় কিন্তু বিশ্বাত্মা থাকেন মোহ হতে মুক্ত। এই জীবাত্মা যখন নিজের স্বরূপ এবং বিশ্বাত্মার স্বরূপ অবগত হন তখনই তিনি মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম মরণচক্র ছিন্ন হয়। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অচিন্তনীয়। এটা অবিনশ্বর, কেউই তার বিনাশ করতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন— 'যিনি আমাদের আত্মার আত্মা তাকে নিত্য মুক্ত আনন্দময় ও নির্বিকার পরব্রহ্ম বলিয়া জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল, ইহার মধ্যে মৃত্যুর চির অবসান, দুঃখের চির নিবৃত্তি এবং অমৃতের আবির্ভাব। বহুর মধ্যে এক, পরিণামশীল জগতের মধ্যে এক অপরিণাম সত্তা তাঁহাকে যিনি নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন, শুধু তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপর কেউ নয়।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯)* দেহধারী জীবের শরীরে যেমন শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য আছে ঠিক তেমনই আছে আত্মার এই দেহান্তর। এর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সে অজ, নিত্য সনাতন। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতনতর বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীরকে পরিত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। একে অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করা যায় না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না এবং বাতাস একে শুষ্ক করতে পারে না। 'হিতোপদেশ' যেমন উপদেশ দিয়েছে— 'পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।' *('সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', ১৩শ খণ্ড, ১৯৮২, পৃ. ৩২৬)* অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সংসারে মৃত কোনো ব্যক্তি না জন্ম গ্রহণ করে। গীতায় তদপেক্ষা সহজতর রূপে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং যাঁর মৃত্যু হয়েছে তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে তোমার আত্মীয়গণের মৃত্যুও যখন সুনিশ্চিত তখন সেই বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত। বিশ্বকবির

লেখনীতে এই ভাব সুন্দর রূপ পেয়েছে—

'জানিনা কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া
ভালোমন্দ শেষ করি যায় জীর্ণ জন্ম তরী
কোথায় ভাসিয়া।'

সেই কারণে কবি উপদেশ দিয়েছেন —

'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্ব দেখা তারে সর্ব দৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ২২৪)

প্রকৃতপক্ষে গীতায় সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশই দিয়েছেন— প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই —

'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)

হে ভারত! প্রত্যেক্যের দেহে যিনি বাস করেন তিনি নিত্য ও অবধ্যঃ সেই জন্য কোনো জীবের জন্য তোমার শোক করা অনুচিত। বিশ্বের প্রতিটি জীবের মধ্যে সেই পরম পুরুষ বিরাজ করছেন। সর্বভূতে তাঁকে দেখাই হল আত্মদর্শন। তখন আর নিজের বলে কিছু থাকে না, অহংভাবের অবলুপ্তি ঘটে। সমগ্র বিশ্বরূপ রাজ্যই তাঁর 'তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।' *('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৩৮৭)* সমুদ্রের বুকে অসংখ্য সফেন লহরী প্রতিনিয়ত উঠছে এবং বিলীন হচ্ছে। বস্তুত তারা সমুদ্র হতে পৃথক নয়। তথাপি তাদের পৃথক বলে বোধ হয়। জীবের অন্তরস্থ আত্মাও সেই বিশ্বাত্মার স্বরূপ। তরঙ্গের মত জীব নামরূপের অধীন। এই নামারূপের শরীর তরঙ্গের মতো সেই পরমাত্মার সঙ্গেই মিলিত হয়। এই ভাব অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখার উপদেশ ভগবান দিয়েছেন— 'নিমিত্তিমাত্রং তব সব্যসাচিন্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)* বলে। কিন্তু যে কোনো শুভ কর্মেই বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই আত্মদর্শনের পথে প্রধান অন্তরায় হল আমাদের ষড়রিপু। ভগবান তাই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন— "হে কৌন্তেয়, কামরূপ অনলে জ্ঞান সর্বদা আবৃত থাকে. তাই তা জ্ঞানীদের চিরশত্রু। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে সমাসীন হয়ে কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে দেহীকে বিমোহিত করে। সে জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশকারী। সুতরাং এই বিষয়ে ভগবানের চূড়ান্ত আদেশ— 'জহি শত্রুং মহাবাহো কাম রূপং দূরাসদম্'।" *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য়*

অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক) যাকে সহজে আয়ত্ত করা যায় না, সেই কামরূপ শত্রুকে জয় কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে রথে সমাসীন হলেও তিনি যে সাধারণ মানুষ নন তার কিছুটা আভাস অর্জুনকে দিয়েছেন, তাঁর শুভ আবির্ভাবের কারণ ইত্যাদির বিস্তৃত উপদেশ করে। অর্জুন যখন তাকে বিষ্ণুর অবতার এবং সর্বজীবের পরিত্রাতা হিসাবে যথার্থত অবধারণ করলেন ঠিক তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বকীয় স্বরূপ আরও বিস্তৃতরূপে অর্জুনের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে প্রকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট ভেদে তাঁর দুই প্রকার প্রকৃতি আছে। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আটটি হল নিকৃষ্ট প্রকৃতি। এদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আত্মারূপ যে প্রকৃতি তাই জগতের ধারক। তা হতেই সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং তাতেই সমগ্র জগতের বিলয়। তাই পরমাত্মারূপ ঈশ্বরের এই প্রকৃতিকে ভাগবত প্রণাম জানিয়েছেন—

'ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূল প্রকৃতয়ে নমঃ।।'

('ভাগবত', ৮ম স্কন্ধ, ৩ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক)

অর্থাৎ 'হে পরমাত্মা! তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের প্রভু, সাথী, মহাত্মা আত্মা ও সতত প্রজননশীল প্রকৃতির উৎস।' সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলছেন যে তিনিই সব, তাঁর অপেক্ষা উচ্চতর বা মহত্তর কিছু নেই। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে তেমনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূত্ররূপ ঈশ্বরে সংশ্লিষ্ট। যা কিছু উচ্চ, যা কিছু মহত্তম, সবই তিনি। তিনি বেদসমূহের মধ্যে 'ওঁ'-কার, নরে পৌরুষ, সর্বভূতে জীবন বা সনাতন বীজ। কিন্তু ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে সমগ্র জগৎ তাঁকে জানতে পারে না। এই মায়ার পাশ তাদেরই ছিন্ন হবে— 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)* কেবলমাত্র তাঁকে যাঁরা আশ্রয় করবে। সাধারণত চতুর্বিধ মানুষ তাকে আশ্রয় করে, সন্তপ্ত, জ্ঞানপিপাসু অর্থার্থী এবং তত্ত্বজ্ঞানী। এদের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ— 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)* জ্ঞানী তাঁর আত্মস্বরূপ। বহু জন্মের পুণ্যফলে বহু সাধনায় জ্ঞানী ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন এবং উপলব্ধি করতে পারেন যে 'বাসুদেবই সব'। কিন্তু এরকম মহাত্মা খুব দুর্লভ। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই সব, তাকে জানলেই এই সংসার সমুদ্র হতে মুক্তি লাভ সম্ভব। যাঁরা তাঁর আশ্রয় নিয়ে জরা মরণ থেকে মুক্তি লাভ করতে চায় তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন। এই ব্রহ্মকে জানাই তো প্রকৃত জ্ঞান। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন ব্রহ্ম অবিনাশী এবং তিনিই সর্বেশ্বর। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা যা অভিব্যক্ত হয়, যা যা কৃত হয় তার সমুদয়ের কর্তা

ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি বিষয় ও বিষয়ীর সমগ্র দ্বৈতবোধের অতীত এক নির্বিকার সত্তা। মুমূর্ষু অন্তিম সময়ে যা চিন্তা করে, যেভাবে ভাবিত হয় সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। 'শেষ মুহূর্তে মন যাতে নিবদ্ধ থাকে আত্মা সেখানেই যায়। আমরা যা ভাবি তাই হই। আমাদের অতীত চিন্তা দ্বারা বর্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার বর্তমান জীবনের চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম নির্ধারিত হবে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১৮)* এই অভিমত ব্যক্ত করেন আচার্য ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে এই কথাই কবিতায় ব্যক্ত করেন।

'অদৃষ্টেরে শুধালেন, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ২৯৩)

অনিত্য এই সংসারে আবর্তন করা এবং দুঃখ ভোগ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সেই কারণে এই জন্ম কর্ম চক্র থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকেই মুক্তি বলা হয়ে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন তাঁকে প্রাপ্ত হলে মহাত্মারা দুঃখের আধার অনিত্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। কেননা তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করেছেন। সেই মহাত্মা জ্ঞানী পুরুষ আবার জন্মগ্রহণ করতে পারেন অধর্মের পাপ-পঙ্ক থেকে সাধুদের জ্ঞানের স্বচ্ছ সলিলে তুলে আনবার জন্য। 'যখনই দেখিবে কোনো মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্র স্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছেন জানিও তিনি আমারই তেজঃ সম্ভূত। আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছি।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪)*

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

সুতরাং যাঁর তেজপ্রভাবে মুক্তাত্মা জ্ঞানী পুরুষ পুনরায় কর্তব্য কর্মে লোক সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হন তাঁকে লাভ করার প্রয়াসই তো মোক্ষ লাভের চরম পথ। ভগবান বলেছেন— 'আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জুন' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)* অর্থাৎ 'হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে অধস্তন লোকে বসবাসকারিগণ সবাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খ্রীষ্টধর্মে স্বর্গলাভকেই চরম লাভ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর উর্দ্ধে কিছু তাঁরা অন্বেষণ করেননি। মুসলমান ধর্মে বেহেশতে

গমন করাকেই মহত্তম আদর্শ বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে আছে স্বর্গ বা বেহেশত্ অপেক্ষা উর্দ্ধতন আর এক লোক যাঁর নাম ব্রহ্মলোক এবং এই ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য লাভ করবার উপদেশই গীতায় দেওয়া হয়েছে। এই জরা মরণশীল সমগ্র ভূতগণের মধ্যে থেকেও ঈশ্বর সকলকে জানেন কিন্তু তাকে কেউই জানে না। দিনের শুরুতে জাগতিক বস্তু সকল অব্যক্ত থেকে প্রকাশিত হয় এবং রাত্রির আগমনে তারা পুনরায় অব্যক্তে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এই অব্যক্তের অতীত এক সনাতন অব্যক্ত সত্তা আছেন যিনি সর্বভূত বিনষ্ট হলেও কখনও বিনষ্ট হন না। তিনিই অবিনশ্বর তিনিই পরমাগতি। তাঁকে প্রাপ্ত হলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবান বললেন— 'হে অর্জুন! এটাই আমার পরম ধাম।' যাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকার রাত্রিতে পথভ্রষ্ট হন তাঁরা পিতৃলোকের পথে গমন করে পূর্নজন্ম লাভ করেন। আর যাঁরা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল দিনে বাস করে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন তাঁরাই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রতম জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বললেন— 'আমি অপ্রকট মূর্ত্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত করে আছি। সর্বভূত আমাতেই বিরাজমান, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নেই।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* সর্বত্র গমনশীল বায়ু যেমন আকাশে সর্বদা বিরাজ করে তেমনই ভূত সকল তাতে বিরাজমান। কল্পান্তে ভূত সকল ঈশ্বরের নিজস্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়। তিনি স্বকীয় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কিন্তু সাধারণ মনুষ্য তা পারে না কারণ তাঁরা প্রকৃতির বশ এবং নিতান্তভাবে অসহায়। সেই জন্য ঈশ্বর নিজ প্রকৃতিতে বিলীন ভূত সকলকে আত্ম বশীভূত প্রকৃতির সাহায্যে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করে থাকেন। মর্তলোকে যে প্রতিমা পূজা করা হয় তাকে ঈশ্বরলাভের উপায় হিসাবে মনে করাই উচিত, কদাচ সেই মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা যুক্তি সঙ্গত নয়। সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান এই জ্ঞান না হওয়ার দরুণ সাধারণ মানুষ প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়।

ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

'অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা অবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞয়া মাং মর্ত্যঃ কুরুতে অর্চা বিড়ম্বনম্।।'

('ভাগবত', ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

আমি সমগ্র বিশ্ব চরাচরে আত্মরূপে বিরাজমান, তবু আমার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে মরলোক মূর্ত্তি পূজায় লিপ্ত হয়। ভগবান তিন প্রকার সাধকের উল্লেখ করে বলেন যে— 'কেউ কেউ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আমার উপাসনা করেন কারণ তাঁহারা আমাকে, পৃথক, বহুধা এবং সর্বতোমুখীরূপে জানেন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম*

অধ্যায়, ১৫ শ্লোক, ভাবানুবাদ) ঈশ্বর সকলের উৎস, এবং সমগ্র সৃষ্টি তার থেকে উৎসারিত। এভাবে যাঁরা ঈশ্বরের ভজনা করেন, ঈশ্বর অনুকম্পাবশত তাঁদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বিনষ্ট করে থাকেন। অর্জুনের মন মোহগ্রস্ত, তাই তাঁর জিজ্ঞাস্য হল সব কিছুতেই যদি ঈশ্বর থাকেন তাহলে ধ্যানের সময় বা উপাসনার সময় মনে মনে তাঁর কোন মূর্তিকে কল্পনা করব? ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তাঁর দিব্য বিভূতির অন্ত নেই। তথাপি তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বিভূতিগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, 'যেখানে যা কিছু দেখবে মহিমাময় তেজী এবং অনন্ত শ্রীযুক্ত তা আমারই অনন্ত মহিমার অংশ। অথবা সকল বিভূতির বিষয় জানবার প্রয়োজন নেই। এটা সংক্ষেপে জেনে রাখো যে আমি আমার এক ভগ্নাংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি?' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১০ম অধ্যায়, ৪২ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* ঋগ্বেদে এর সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রটি এই—

'পাদো অস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি।'

('ঋগ্বেদ', ১০ম অধ্যায়, ৯০-৩ শ্লোক)

এর পরে ভগবান পুনরায় চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে জ্ঞান প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। তিনি বলেছিলেন যে 'হে পার্থ! সর্বোত্তম যে জ্ঞান তোমাকে আমি বলব তা জেনে মুণিগণ এই জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে আমার সদৃশ আকৃতি প্রাপ্ত হন।' গীতার এই উপদেশের সাথে বাইবেলের নিম্নোক্ত বাক্যটির সাদৃশ্য দেখা যায়— 'Beye there for perfect, even as your father which is in heaven is perfect.' *(Bible, New Testament, 'সেন্ট ম্যাথু', ৫ম অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক)* অর্থাৎ 'তুমি পরিপূর্ণাঙ্গ হও, যেমন তোমার স্বর্গস্থ পিতা পরিপূর্ণ।' যা হোক, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান জানালেন যে মহৎ ব্রহ্মরূপ প্রকৃতিতে পিতারূপে ঈশ্বর বীজ নিক্ষেপ করেন ফলে সৃষ্টি হয় পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচর। উপরি উক্ত যে সমস্ত কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন তা সম্যক অবধারণ করা, ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর আবির্ভাবের কারণ জীবাত্মা বিশ্বত্মার সম্বন্ধ প্রভৃতি যিনি জানতে পারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং এদের জানাই প্রকৃত জ্ঞান। বিনীত প্রণিপাত প্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের নিকট হতে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। কেবলমাত্র পুস্তক মুখস্ত করলেই সেই জ্ঞান হবে না, উপযুক্ত গুরুর কাছে পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাকে অধিগত করতে হবে। নতুবা জ্ঞান লাভ অসম্পূর্ণ থাকবে। মহাভারতকার

বলেন—

'যস্য নাস্তি নিজা প্রজা কেবলং তু বহুশ্রুতাঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসমিব।।'

('মহাভারত', সভাপর্ব, ৫৫-তম অধ্যায়, ১ শ্লোক)

অর্থাৎ রন্ধন যন্ত্র হাতা যেমন রন্ধনকৃত ব্যঞ্জনের আস্বাদ পায় না তদ্রুপ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হন। 'হিতোপদেশ' থেকেও অনুরূপ ভাবজনক শ্লোক পাওয়া যায়—

'যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি।।'

('সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার', ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৬)

এই প্রজ্ঞার দ্বারাই জ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত হয়। জীবাত্মা প্রজ্ঞা লাভ করলেই তার মুক্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'হে পাণ্ডব! একবার তাঁকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানলে তোমার কখনো মোহ হবে না, তখন সর্বভূতই আত্মার মধ্যে ও পরে আমার মধ্যে দেখতে পাবে। কেবলমাত্র জ্ঞান তরণীর সাহায্যে তুমি সংসার সমুদ্রকে অতিক্রম করতে পারবে। বলাবাহুল্য যে জ্ঞান বলিতে এইখানে ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানই বোঝায়।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মাৎ কুরুতে তথা।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক)* অর্থাৎ 'জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্ম করে দেয়।' মহাভারতের অন্যত্র বলা হয়েছে—

'বীজান্যনুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২২১-তম অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

অর্থাৎ দগ্ধ বীজ যেরকম অঙ্কুরিত হয় না, তেমনই জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশ দগ্ধ হলে তা আত্মাকে পুনঃপ্রাপ্ত হয় না। উপনিষদে জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে বহু জায়গায়, কিন্তু সেইগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, সংযোগবিহীন। কিন্তু গীতায় যে জ্ঞানের মাহাত্ম্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট প্রকাশ করেছেন তা সুসংবদ্ধ, পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। গীতায় বলা হয়েছে— 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)* জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নেই। আর উপনিষদ বলেন— 'য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি।' *('বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১০ শ্লোক)* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে— 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।' *('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ', ৫ম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক)* অর্থাৎ তাকে জানলে সকল বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়।

আরও বলেন—

'তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।।'

('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্', ৩য় অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

কেবলমাত্র তাঁকে জেনেই মৃত্যু সাগর অতিক্রম করা যায়, এটা ছাড়া কোন পথ নেই। এই জানার পর করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে—

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃর্ত্যোর্মামৃতং গময়।'

('বৃহদারণ্যকোপনিষদ', ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)

মৈত্রেয়ী উপনিষদে একটি মন্ত্রে এই জ্ঞানের গভীরতার কথা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এক ব্যক্তি বন্ধুদের সাথে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যা বন্দনা করেন। একদিন তিনি তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, জলে নামছেন না দেখে বন্ধুরা তাকে আহ্বান জানালে তিনি বললেন যে আমার অশৌচ হয়েছে। কী অশৌচ জানতে চাইলে বললেন—

'মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয় সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে।
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে।।'

অর্থাৎ আমার মোহরূপা মাতার মৃত্যু হয়েছে এবং জ্ঞানময় পুত্রের জন্ম হয়েছে। এই দুই অশৌচ একসাথে পরায় আমি কীভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করব? আমার হৃদয়রূপ আকাশে চিৎরূপ আদিত্য সব সময় উঠে আছে সে অস্তও যায় না উদিতও হয় না। সুতরাং আমি সন্ধ্যা উপাসনা করব কীভাবে?

কিন্তু প্রশ্ন হল যে এই জ্ঞান লাভের উপায় কী? গীতায় এই জ্ঞান লাভের দু-প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে, এক বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করা, দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধার দ্বারা জ্ঞান লাভ করা। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এরকম 'শ্রদ্ধাধান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)* শ্রদ্ধাবান জ্ঞানবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়গুলি যাদের সংযত তারাই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র হিসাবে ভগবান কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছেন। শ্রদ্ধাব্যতীত কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। যাঁর কাছ থেকে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা হবে তাঁর প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে তার উপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা কখনও জ্ঞানপ্রার্থী সফলতা লাভ করতে পারে না। গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা এবং

শিষ্যের প্রতি গুরুর বাৎসল্য স্নেহ অপরিহার্য। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে শ্রদ্ধা বলতে গীতায় অন্ধ বিশ্বাসকে বোঝানো হয়নি। কারণ শিষ্য অর্জুনকে বার বার দেখা যায় কোনো সংশয় হলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে সংশয় অপনোদন করেছেন। এভাবে সমগ্র গীতায় কেবল সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে মোট অষ্টাবিংশ (২৮) বার অর্জুন নিজের সংশয় ভঞ্জনের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শুরুতে 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ...' ইত্যাদি শ্লোকটিতে অর্জুনের কতকগুলো জিজ্ঞাসা একসাথে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু গীতার সব সংস্করণে এই শ্লোকটি না থাকার জন্য অর্জুনের অষ্টাবিংশবার প্রশ্নের কথাই মাত্র এখানে উল্লিখিত হল। এভাবে সংশয় দূর করে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে গুরুর কাছ থেকে উপদেশ শ্রবণ করেও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

'অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৩শ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে পরোপদেশ শ্রবণ করলেও এই জ্ঞান লাভ হতে পারে। আচার্য শঙ্কর বলেন— 'শ্রুতিপরায়ণাঃ, কেবল পরোপদেশ প্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতাঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ১৩শ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)* অতএব বোঝা যাচ্ছে যে শ্রদ্ধা এবং জ্ঞান এই দুই পথেই ব্রহ্মৈক্য জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু যদি কারও স্বীয় জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা এই দু'টির কোনোটিই না থাকে তাহলে সেই সংশয়াত্মা ব্যক্তির বিনাশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব যোগসাধনার দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম বর্জন করেছিলেন, যথার্থ জ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় দূর হয়েছে এবং আত্মাকে যিনি নিজ বশে রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাকে কোনো কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না। এটাই চরমতম সত্য এবং এই সত্যই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে উচ্চারিত হয়েছিল। কবি এই সত্যকেই উপলব্ধি করে বলেছেন— 'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ২৫৯)* আর ভারতবর্ষেরই এক বীরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে— 'হে ভারত! তোমার মনের অজ্ঞতাজনিত সংশয়কে জ্ঞানের তরবারি দিয়ে ছেদন করে কর্মযোগ অবলম্বন কর।' উপনিষদ যেমন উপদেশ দিয়েছেন— 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।' *('ঈশোপনিষদ', ১১শ মন্ত্র)* অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্মরূপ অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে দৈবজ্ঞানরূপ বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। অর্জুনকেও এখানে জ্ঞানের সাহায্যে কর্মে প্রবৃত্ত হতে বলা

হয়েছে। মানুষের দৈবী এবং আসুরী দুই প্রকার প্রকৃতি আছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রকৃতির তা স্পষ্ট করার জন্য ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— 'জ্ঞান ও যোগে বিশেষরূপে অবস্থিত দৈবী প্রকৃতির মানুষের লক্ষণ—জ্ঞান-যোগ, ব্যবস্থিতি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৬শ অধ্যায়, ১ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* সুতরাং এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে কেবলমাত্র কর্মযোগ নয় পরমগতি লাভ করবার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য।

ভক্তি প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী প্রকরণে এটা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে যে জ্ঞান বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায়, এবং এই জ্ঞান লাভ করলে কী উন্নতি হয়। এটাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে— 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)* অর্থাৎ জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্রতর কিছুই নেই। এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান এমনই—

'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

যাঁকে লাভ করলে মনে হয় যে এর অপেক্ষা বড় পাওয়া আর কিছুই নেই। সেখানে পৌঁছলে অত্যন্ত গুরুতর দুঃখও বিচলিত করতে পারে না। গীতায় যে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে তার পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ যিনি অজর, অমর ও অব্যক্ত। নবম অধ্যায়ে অত্যন্ত গুহ্যতম ভক্তিরূপ রাজমার্গের বর্ণনা শুরু করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভূতি এবং বিশ্বরূপের বর্ণনা করেছেন দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে। কিন্তু বর্তমানে সমস্যা এই যে গীতায় কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ রূপ দুটো নিষ্ঠাই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩ শ্লোক)* ইত্যাদি বাক্যের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে কিন্তু ভক্তির প্রসঙ্গ কোনোখানে আলোচিত হয়নি। কিন্তু নবম অধ্যায় থেকে দেখা যায় যে, ভক্তি প্রসঙ্গ ক্রমে ক্রমে উদিত হচ্ছে। যতই মোক্ষযোগ বা মোক্ষমার্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে ততই ভক্তির শৃঙ্খল মানবচিত্তকে ঈশ্বরের চরণে সুদৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত করছে। অতএব যে ভক্তি গীতার প্রারম্ভে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত হয়েও দ্বিতীয় ষট্‌কের পরার্দ্ধ থেকে গীতার অন্তিম পর্যন্ত একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে তা ধীরে ধীরে কিভাবে গীতার মধ্যে এবং ভক্তির অন্তরে

অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে গীতায় কর্মযোগ সাধন করবার জন্য জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিশেষত নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনাই যাতে অর্জুনের একমাত্র প্রচেষ্টা হয় সেদিকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে নির্বোধ লোক তাঁর উৎকৃষ্ঠ প্রকৃতি যুক্ত অব্যয় অব্যক্ত পরমভাবকে না জেনে তাঁতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। 'নিরাকারকে আকার আরোপ করি নিজেদের ত্রুটির জন্য। চরম সত্তার ধ্যান থেকে বিমুখ হয়ে আমরা কল্পনা প্রসূত আকারের দিকে মনোনিবেশ করি। এক অব্যক্ত সনাতন ছাড়া সব দেবতাই তাঁর উপর আরোপিত রূপ। ঈশ্বর বহুর মধ্যে এক নয়। তিনি সর্বদা পরিবর্তনশীল বহুর পশ্চাতে এক। তিনি সকল আকারের উর্দ্ধে, অন্তহীন সচলতার তিনি নির্বিকার কেন্দ্র।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১৩)* এই অব্যক্ত নিরাকার ঈশ্বরই একমাত্র ধ্যেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'অবক্তোহক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

অর্থাৎ এই অব্যক্তকেই অবিনশ্বর বলা হয়ে থাকে। তিনিই পরমাগতি, যাঁরা তাঁকে প্রাপ্ত হন তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। এটাই শ্রেষ্ঠজ্ঞান এবং এর কথা স্মরণ করেই বলা হয়েছিল যাকে লাভ করলে অন্য কিছুই আর লাভের যোগ্য থাকে না। এই নিরাকার নিরুপাধিক ব্রহ্মের কথা স্মরণ করেই উপনিষদ্ গেয়েছেন— 'মহতস্তমসঃ পারে প্রশান্তহ্যতিতেজসম্।' *('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ')* মানুষের সমগ্র চিন্ময় সত্তা যখন তার সাথে যুক্ত হবে তখনই হবে পূর্ণ সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ এই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করতে উপদেশ করে বললেন যে 'ময্যর্পিত মনো বুদ্ধি মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৮ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)* অর্থাৎ তোমার মন ও বুদ্ধি যদি আমাতে লগ্ন থাকে তাহলে তুমি আমাকে নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হবে। এখানে অব্যক্তের উপাসনার কথা বলা হল। ভগবান পুনরায় নবম অধ্যায়ে ব্যক্ত উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করে বললেন—

'যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জুহোর্ষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

অর্থাৎ তুমি যা কর, যা আহার কর, যা আহূতি প্রদান কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর, হে কৌন্তেয় তা সকলই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। আবার পুনরায় বললেন— 'আমাতেই মনোনিবেশ কর, আমাকেই ভক্তি কর, আমাকেই পূজা কর

এবং আমাকেই প্রণাম কর। এইভাবে যোগ সমাহিত চিত্তে আমাকে লক্ষ্যে রাখলে আমাকেই লাভ করবে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এভাবে ব্যক্ত শরীরধারী অবতীর্ণ যে ঈশ্বর তাকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করার উপদেশ দেওয়া হল। তার পর একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পর ভগবান অর্জুনকে বললেন— 'যে আমার কার্যই করে, যে আমাকেই পরমাগতি বলে নিশ্চয় করেছে, যে সকল প্রকার আকর্ষণ বর্জন করে আমারই উপাসনা করে এবং যে কাউকেও শত্রুজ্ঞান করে না সে আমাকেই লাভ করে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এভাবে সাকার সগুণ ঈশ্বরের কাজে আত্মসমর্পণ করলেই মুক্তি লাভ হয়।

পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার এবং নিরুপাধিক, তিনি সর্বভূতে বিদ্যমান। কিন্তু তিনি তদতীতরূপেও আছেন, এটাই তাঁর নিরুপাধিকরূপ। ভূত সকল তার থেকেই উৎপন্ন হয় এবং তাতেই বিলীন হয়। সেই পরমপদ লাভেই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁকে প্রাপ্ত হলে জরামরণশীল অনিত্য এই সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করতে হয় না। কিন্তু সেই পরমপুরুষ যিনি আঁধারের পরপারে অবস্থিত তাঁকে জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দূরহ। সাংসারিক সুখ দুঃখে যাঁদের মন আবিষ্ট, তাঁরা এই বিশ্ব সংসারের স্বরূপ সেই অব্যক্ত এক পরমপুরুষ হতেই যে সমগ্র বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হয়েছে এবং এক পরমাত্মাই সমগ্র জীবের মধ্যে বিরাজ করছেন এই তত্ত্ব যথার্থ অনুধাবন করতে পারেন না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান সাধারণ অজ্ঞ লোক স্বচ্ছ বুদ্ধির অভাবের জন্য লাভ করতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ করার জন্য চাই বুদ্ধি। কেউ কেউ অবশ্য একমাত্র বুদ্ধিকেই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় মনে করেন। কিন্তু এটা যথার্থ নয় কারণ এই বুদ্ধি আসে শ্রদ্ধারূপ অপর এক মনোবৃত্তির দ্বার দিয়ে। বুদ্ধির সাথে শ্রদ্ধার যোগ হলে তবেই জ্ঞান লাভ হয়। প্রসঙ্গাত মনে রাখতে হবে যে, যেকোনো প্রকার অন্ধবিশ্বাসকে শ্রদ্ধার সমতুল মনে করবার কোনো কারণ নেই। সাধনের মূল কথাই হল 'আদৌশ্রদ্ধা'। কিন্তু এই শ্রদ্ধা করার জন্য যদি একটি সাকার সগুণ ঈশ্বরের প্রতীকের কল্পনা করা না হয় তা হলে অজ্ঞলোকের পক্ষে পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। অতএব সাধারণের সাধারণ উপাসনার নিমিত্ত সগুণ সাকার ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। একেই পরমেশ্বর বলে জানলে জ্ঞান লাভ হবে। এই জানার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধি যে বুদ্ধির মূলে থাকবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন—

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রদ্ধা এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছাতে হবে।

বিশ্বাসই হল শ্রদ্ধার ভিত্তি যা না থাকলে জ্ঞানের বিন্দুমাত্র লাভ হয় না এবং এই শ্রদ্ধার অভাবে বিনাশ পর্যন্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
ন্যায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ জ্ঞানবিহীন অজ্ঞ ও সন্দিগ্ধ স্বভাবের লোক বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ চিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোক কিছুই নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু এবং তাঁর পিতার কথোপকথনের মাধ্যমে এই তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়েছে যে অব্যক্ত নির্গুণ পরব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূল কারণ। পিতা শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বের উপদেশ করে বললেন যে— 'এর উপর শ্রদ্ধা রাখো। এই ব্যক্ত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্তা তাঁর উপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে তাঁর সাথে জীবের অন্তরের ব্যবধান ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। ভগবান তাই বলেছেন যে, 'সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে আমাতে অবস্থিত হয়ে আমারই অর্চনা করেন তাকেই আমি শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী মনে করি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এই শ্রদ্ধা বা ভক্তি যেকোনো প্রতীক গ্রহণ করে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরে অর্পণ করাই প্রকৃত ব্যক্ত উপাসনা। সাধারণ অব্যক্ত পরব্রহ্মের যে ধ্যান বা উপাসনা তা সবসময় সাধারণের বোধগম্য হয় না এটা ঠিকই কিন্তু জ্ঞানিগণও এই বিষয়ে পরস্পর মতদ্বৈততা প্রকাশ করে থাকেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এই মতবিরোধও শ্রদ্ধার দ্বারা অতিক্রম করা যায়। যাঁদের মধ্যে মতের সমন্বয় হবে না, তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যিনি অধিক বিশ্বাসের যোগ্য হবেন তাঁরই কথার উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করতে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন—

'অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বহন্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চারিততরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৩শ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

সুতরাং এটা সিদ্ধ হয়েছে যে যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে আসবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং এর দ্বারাই হবে চরম লাভ। এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত রূপের যে উপাসনা তা কেবল গীতাতেই প্রতিপাদিত হয়নি। শাস্ত্রমতে অবতারেরও দুই রূপ আছে—

'দ্বে রূপে বাসুদেবস্য ব্যক্তং চাব্যক্তমেব চ।
অব্যক্তং ব্রহ্মনোরূপং ব্যক্তমেতচ্চরাচরম্।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, পাদটীকা)

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই রূপ। অব্যক্তরূপে তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ও ব্যক্তরূপে তিনি এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ। গীতার মধ্যে যখন ভক্তি একটি

মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং ভগবানও যখন এই ভক্তিকেই পুনঃপুনঃ প্রাধান্য দিয়ে আসছেন তখন এই ভক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন অনুভূত হয়। জ্ঞান থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ আবার ভক্তির মধ্যে অন্যন্যাভক্তি শ্রেষ্ঠ। এই অনন্যা ভক্তি লাভের জন্য প্রয়োজন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কারণ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভের উপযোগী। এই শ্রদ্ধার বিষয় ভাগবতে বলা হয়েছে—

'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াত্তুনির্গুণা।।'

('ভাগবত', ১১ স্কন্ধ, ২৫-তম অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

অর্থাৎ 'আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রভৃতিতে যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, কর্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা রাজসী এবং অধর্মে ধর্ম বলে যে শ্রদ্ধা তা তামসী আর আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা তা কিন্তু নির্গুণা।' গীতা প্রবক্তা অর্জুনকে বলেছেন— 'ত্রিবিধা ভবতি সা শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৭-তম অধ্যায়, ২ শ্লোক)* অর্থাৎ দেহধারীর সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়ে থাকে। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন— 'শ্রদ্ধা মানে যেকোনো বিশ্বাস মেনে নেওয়া নয়। বিশেষ আদর্শের উপর মানব শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে আত্মোপলব্ধির প্রয়াসই শ্রদ্ধা। মানবসমাজের উপর পরমাত্মার চাপ থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এই শক্তি মানুষকে শ্রেয়ের দিকে ঠেলে দেয়, শুধু জ্ঞানময় রাজ্যেই নয়, অধ্যাত্ম জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩২০)* কেবলমাত্র সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনো কার্যে নিষ্ঠাই আমাদের সাফল্য প্রদান করে। নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধাবিহীন কার্য তখনও সফল হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— 'সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি। কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। ... এই আমাদের মরু পথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের পানে এসে পৌঁছায় সেই দিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তাঁর দাসীশালায় লুকিয়ে রাখে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ১৪৮)* আমাদের সাধনায় সিদ্ধি, কর্মে সিদ্ধি প্রভৃতি আন্তরিক ভাবনা থেকেই জন্ম গ্রহণ করে। সিদ্ধি হয় তদনুরূপ যেরূপ আমাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি স্মর্তব্য—

'মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' *(চাণক্য শ্লোক)*

অতএব ইহা নির্বিবাদ যে ভক্তির পূর্বে শ্রদ্ধা একান্ত অপরিহার্য। ঈশ্বরের চরণে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আত্মসমর্পণ করে এই আত্মতত্ত্ব অর্জুন অবগত হয়েছেন। কিন্তু

বর্তমানে তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, ঈশ্বরের সাকার এবং নিরাকার স্বরূপ বিষয়ে। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে পরিদৃশ্যমান রূপ তাঁর সম্মুখে রথোপরি উপবিষ্ট তাই ধ্যেয় নতুবা সর্বত্র বিরাজিত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের আরাধনা করা বিধেয়। কারণ—

'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুর্দুলভঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

এই শ্লোকে ভগবান্ 'মৎ' শব্দের দ্বারা তাঁর নিরাকার স্বরূপের প্রতি সকল ভক্তকে আকৃষ্ট করেছেন আবার— 'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৫৩ শ্লোক)* ইত্যাদি শ্লোকে তিনি তাঁর সাকার রূপেরই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অর্জুন সংশয়াবিষ্ট করেছেন।

অর্জুনকে এরকম সংশয়ের মধ্যে বেশি সময় থাকতে হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছেন— 'যাঁরা আমার প্রতি মন সন্নিবিষ্ট করে সতত আন্তরিকতার সঙ্গে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার অর্চনা করে আমি তাঁদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি।' অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান নীলোৎপল সদৃশবর্ণযুক্ত দেবকীনন্দন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত অনন্যা ভক্তির দ্বারা যে অর্চনা করে সেই যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। তিনি অর্জুনকে পূর্বেই বলেছেন যে—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগনা ইব।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! আমার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কেউই নেই। মালিকার মণিসমূহ যেরকম সূত্রে গ্রথিত থাকে এই সমগ্র বিশ্বচরাচর তেমনই আমাকে গ্রথিত আছে। গীতা উপদেষ্টা নবম অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান রাজ রহস্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে— 'যে অনন্যা ভক্তির সাথে আমাকে একটি ফুল, একটি ফল বা একটু জল দেয় শুদ্ধ চিত্ত ভক্তের সেই ভক্তি উপহার আমি গ্রহণ করি।' অর্থাৎ পূজার উপচার যত দীনতম, সামান্যতম হোক না কেন তা যদি ভক্তির সাথে নিবেদিত হয় তাহলে ঈশ্বর তা গ্রহণ করে ভক্তকে কৃতার্থ করে থাকেন। কিন্তু উপচার বা সাজসজ্জার আড়ম্বর যদি ভক্তিকে অতিক্রম করে অহংকারের পর্যবসিত হয় তাহলে তাতে ঈশ্বর কখনো পরিতুষ্ট হতে পারেন না। সেই উপাসনালয় স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ্ হিসাবে শোভা পায়। ভক্ত সকল সময় চান ঈশ্বরের সাযুজ্য, তাই রাজার কাছে ভক্তের একান্ত প্রার্থনা--

'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে

সেইস্থানে মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।।'

('কথা ও কাহিনী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫৭)

মহাভারতে দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের বিপুল রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে দরিদ্র বিদূরের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আবার ভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা সুদামার আনা উপায়ন গ্রহণ করে বলছেন—

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।'

('ভাগবত', ১০ স্কন্ধ, ৮১-তম অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কেউ কেউ মনে করেন যে ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা গীতায় প্রদর্শিত হয়েছে তা ভাগবত অনুযায়ী। কথিত আছে যে ব্যাসদেব মহাভারত নামক অমূল্য গ্রন্থ বিরচনের পরেও নিজে আত্মতুষ্ঠি লাভ করতে পারেননি। 'মহর্ষি বেদব্যাস সকল লোকের মঙ্গল কামনায় সনাতন বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তথাপি তাঁর মনে শান্তি নাই। অন্তরে কিসের অভাব রহিয়াছে তাহা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না, সরস্বতী নদীর তটে চিন্তাকূল চিত্তে বসিয়া আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। কুশল প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব স্বীয় মনোবেদনার হেতু নির্ণয়ে নিজের অক্ষমতার কথা দেবর্ষিকে নিবেদন করিলেন। নারদ তাঁহাকে শান্তি লাভের উপায় স্বরূপে শ্রীভগবানের লীলা ও গুণের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিতে উপদেশ দিলেন। এইভাবে নারদের উপদেশে ভক্তগণের পরমপ্রিয় 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচিত হইল।' *('ভক্তিপ্রসঙ্গ', স্বামী বেদান্তানন্দ, ১ম মুদ্রণ, পৃ. ১৬)* সুতরাং ভাগবতে সনাতন ধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তের হৃদয় মাধুরীর সাথে মিশে গিয়েছে। এই গ্রন্থের ভক্তিতত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়েছে গীতায়।

গীতায় ভক্তি প্রসঙ্গ যাকে অবলম্বন করতে ভগবান পুনঃপুনঃ নির্দেশ করেছেন এবং কেবলমাত্র যার দ্বারাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ কবা যায়, তার বিষয় আলোচনা করার আগে ভক্তির সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ভক্তির স্বরূপ কী এবং কে এই ভক্তি লাভের যোগ্য? বিশেষত এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা এখানে করা হচ্ছে। দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তি সূত্রে বলেছেন— 'সা তস্মিন্ পরপ্রেমরূপা' *('ভক্তিসূত্র', নারদ ২)* অর্থাৎ অন্য কোনো বস্তু নয় কেবলমাত্র পরমেশ্বরের উপরে যে ঐকান্তিক প্রেম তাকেই ভক্তি অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার প্রীতির সম্পর্ক মানুষের সাথে মানুষের স্থাপিত হয়েছে। সেই সকলের মধ্যে প্রধান হল স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বা ভালোবাসা। একে প্রেম বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই প্রেম যখন ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয় তখন তা হয় ভক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

বলেন— 'প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যা এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যাবে।' *('ভক্তিপ্রসঙ্গ', স্বামী বেদান্তানন্দ, ১ম মুদ্রণ, পৃ. ২৪)* মানুষের সাথে মানুষের এই প্রেম প্রীতি ভালোবাসা যখন শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখন তাকেই বলে ভক্তি। তাই শাণ্ডিল্যের ২য় সূত্রে বলা হয়েছে— 'সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় যে প্রীতি তাই ভক্তি পদবাচ্য। ভগবানে যৎপরোনাস্তি অনুরক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি—

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।।' *('ভক্তিরসামৃত')*

ইষ্টে অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বরসপূর্ণ পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ আপন হৃদয়ের রসভরা অত্যন্ত গাঢ় আবেগ, তার নাম রাগঃ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভক্তির এই রকম সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন— 'যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।' *('ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৩)* ভাগবতে বলা হয়েছে— 'অহেতুকাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।' *('ভাগবত', ৩ স্কন্ধ, ২৩-তম অধ্যায়, ১২ শ্লোক)* অহেতুক ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তির কোনো কারণ থাকবে না। ধন, জন, যশ ইত্যাদির জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রাণপাত করা নয়, এই ভক্তি কোনোরকম কারণ হীন, এই ভক্তি মুহূর্তে নষ্ট হবার নয়, নিরন্তর যার কখনও লয় ক্ষয় নেই, সর্বোপরি নিষ্কাম অর্থাৎ কামনা শূন্য। অমুক দ্রব্য পেলে বা লাভ হলে ঈশ্বরের পূজা করব এরকম কোনো কামনা হতে এই ভক্তি উদিত হতে পারে না। গীতায় এরকম নিষ্কাম ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সেবকের প্রকারভেদ করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যারা অর্থার্থী অর্থাৎ বিষয়ের জন্য পরমেশ্বরের সেবা করেন তাঁরা নিকৃষ্ট। এইখানে 'অর্থ' বলতে কেবল টাকাকড়ি, ধন-দৌলতই বিবক্ষিত নয়, বিষয়ের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা তাই অর্থপদবাচ্য। এই ভক্তি ভাগবত পুরাণে নয় প্রকাররূপে বলা হয়েছে—

'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।'

('ভাগবত', ৭ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)

অর্থাৎ বিষ্ণুর লীলা মাহাত্ম্য শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা, তাঁর নিয়ত স্মরণ, তাঁর শ্রীচরণ সেবা, অর্চনা করা, বন্দনা করা, তাঁর দাস্যভাব গ্রহণ, সখ্যভাব ধারণ করা এবং তাতেই আত্মসমর্পণ করা। একটি মানুষের সাথে অন্যান্য মানুষের যত প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হতে হতে পারে ভক্তের সাথে ভগবানের তার সবকটি সম্পর্কই স্থাপন করা সম্ভব। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় নারদের ভক্তি সূত্রে।

'গুণমাহাত্ম্যাসক্তি - রূপাসক্তি - পূজাসক্তি - স্মরণাসক্তি - দাস্যাসক্তি - সখ্যাসক্তি - কান্তাসক্তি - বাৎসল্যাসক্তি - আত্মনিবেদনাসক্তি - তন্ময়াসক্তি - পরমবিরহাসক্তিরূপা একধা অপি একাদশধা ভবতি।' *('নারদের ভক্তিসূত্র')* ভক্তি এক হলেও গুণমাহাত্ম্যাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে একাদশ প্রকার ভক্তির কথা বলা হয়েছে। গীতায় কিন্তু ভগবান বলেছেন যে সাধারণত চার প্রকার লোক তার ভজনা করেন—

'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ভারত প্রধান অর্জুন! যে সদাচারিগণ আমাকে ভজনা করেন তাদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, সন্তপ্ত, জ্ঞানপিপাসু, অর্থলিপ্সু বা বিষয়াসক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানী। এদের মধ্যে যে আমার সাথে দিব্য সংযোগ বজায় রাখে এবং ভজনায় একনিষ্ঠ সেই জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। মহাভারতে ঐকান্তিক ভক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে বলা হয়েছে—

'চতুর্বিধা মম জনা ভক্তা এবং হি মে শ্রুতম্।
তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈব নান্যদেবতাঃ।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৩৪১ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)

সুতরাং প্রকৃত ভক্তি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে তার কীরূপ প্রকারভেদ করা হয়েছে তা লিখিত হল। এরপর প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ আলোচিত হচ্ছে।

ভক্তিলাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্তি মন্দিরের সোপান স্বরূপ যে ভাগবত গ্রন্থ তাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখ্য ভক্তি পাশে আবদ্ধ উদ্ধবকে বলেছেন—

'যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তি যোগহস্য সিদ্ধিদঃ।'

('ভাগবত', ১১ স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির আমার কথাতে শ্রদ্ধা জন্মেছে, যার তীব্র বৈরাগ্য উদিত হয়নি আবার বিষয়েও আসক্তি নেই, ভক্তিযোগ আশ্রয় করলে তাঁর সিদ্ধি লাভ হবে।' ঈশ্বরের প্রতি এই ভক্তি হঠাৎ আগত হয় না। বাল্যকাল থেকেই এর অনুশীলন করতে হয়। ভাগবতের অন্যত্র দেখা যায় ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যাদের সাথে বাল্য ক্রীড়া করতেন তাদের বলছেন—

'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।' *('ভাগবত', ৭। ৬। ১)*

অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাল্যকাল থেকেই ভক্তি ধর্মের অনুশীলন করবেন। একেই তো মনুষ্য জন্ম দুর্লভ; তাতে সার্থক জীবন আরও দুর্লভ। বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরের চরণে ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন করে ভক্তের গৌরব লাভ করা যায়, এরকম ভক্তের জন্য ভগবানই সদা চিন্তিত থাকেন, ভক্তকে কিছুই ভাবতে হয় না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বললেন— 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)* হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়ই জানবে আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না। ঐকান্তিক ভক্তি ভগবানের প্রতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। ভক্তি এবং ভক্তের চরম উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে যে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' সেখানে দেখা যায়— 'সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ!

সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন।।'

('চৈতন্য চরিতামৃত', অন্ত্যলীলা, ৪র্থ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)

যা হোক পুনরায় ভগবদবাক্যে প্রণিধান করা যাচ্ছে।

সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংশয়োত্থিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন— 'যাঁরা ঈশ্বরের সগুণ আকারের উপাসনা করে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।' কিন্তু ঈশ্বরের সাকার রূপের উপাসনা করার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাঁর সগুণ এবং সাকার রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা তাঁকে নিরাকার বলে জানেন বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা সাকারের উপাসকগণের চাইতে নিকৃষ্ট নয়। নিরাকার ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য সাকার সোপাধিক ঈশ্বরের উপাসনা একটি উপায় মাত্র। বৃহদাকার বিশিষ্ট কোনো সুখাদ্য একবারে গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয় বলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে আস্বাদ করতে হয়। ঈশ্বর তাঁর সাকার মূর্তিতে দৃষ্ট হলেও তিনি তদতীতএবং নিরুপাধিক। এই তত্ত্বই গীতোক্ত ভক্তিযোগে প্রতিপাদিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'যাঁরা সর্বভূতের কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে অক্ষয়, অব্যক্ত, অচিন্ত সর্বব্যাপী ধ্রুবের উপাসনা করেন তাঁরা সক্রিয় ঈশ্বরের উপাসকগণের মতই আমাকে লাভ করেন।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১২ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৪ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এখানে উল্লেখ্য যে অব্যক্ত পরব্রহ্মের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'সর্বত্রগ' অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ঈশ্বরের মধ্যেও বিরাজ করেন, ইহা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয়। অতএব সাকার এবং নিরাকারের উপাসকগণ পরস্পর যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি করেছেন তা অবান্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অথর্ব বেদের অন্তর্গত রামপূর্বতাপনীয় উপনিষদের ঋষি যা বলেছেন সেই একটি মাত্র শ্লোকের দ্বারাই হিন্দু ধর্মের মূলগত যে সাকার নিরাকার দ্বন্দ্ব তার নিরসন হতে পারে

বলে মনে হয়। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি হল—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।।'

('রামপূর্বতাপনি উপনিষদ', ১ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'স মে যুক্ততমো মতঃ' এই কথা বলে সাকার ঈশ্বরের উপাসকগণকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন সত্য কিন্তু তার কারণ রয়েছে পরবর্তী শ্লোক দুটিতে—

'ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১২শ অধ্যায়, ৫ শ্লোক)

অর্থাৎ যাঁদের মন অব্যক্ত পরম পুরুষে নিবিষ্ট তাঁরা বেশি কষ্ট করেন, কারণ দেহধারিগণের পক্ষে অব্যক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন। অব্যক্তের উপাসনা সাধারণ উপনিষদগুলোতে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। উপনিষদের ঋষি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে এক পরমেশ্বরের আবাসস্থল জ্ঞান করে তাঁরই আরাধনা করছেন। উপনিষদের ঋষি তাঁর ধ্যানালোকিত লোচনে দেখতে পেয়েছিলেন সেই পরব্রহ্মকে এবং বলেছিলেন—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।।'

('শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্', ৩য় অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ অন্ধকারের পরপারে আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান পরমপুরুষকে আমি জেনেছি। তাঁকে জেনে মৃত্যুকে কেবল অতিক্রম করা যায়, অন্য উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে—

'আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়
তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

কিন্তু সাধারণ গৃহীর পক্ষে সমাজ-সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বসে তপস্যা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই গীতায় ভগবান এই পথে সাধন করার দুষ্করতা প্রতিপাদন করেছেন। উপনিষদে অব্যক্ত নিরাকার পরব্রহ্মের বিষয় বা জ্ঞান মার্গই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু

নারদের ভক্তিসূত্রে, শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রে সর্বোপরি ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থে ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়েছে। উপনিষদে ব্রহ্মবাদিনী ধর্মদুহিতা মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সেই পথ যে পথে অমৃতের সন্ধান লাভ করা যায়— 'যেনাহং নামৃতা স্যাম তেনাহংকিংকুর্যাম।' *('বৃহদারণ্যকোপনিষদ', ২য় স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)* কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক নারী কণ্ঠেই যদি উপাসনার এই বিশেষ প্রকার অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার আকুল আবেদন প্রকাশ পায় তা হলে তা মঙ্গালজনক হতে পারে না। সেজন্য ভক্তি প্রধান গ্রন্থগুলো সাধারণ জনমানসের কথা অনুধাবন করে ভক্তি পথে ঈশ্বর লাভের উপায় দেখিয়েছে এবং যার উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্ঘ্য অর্পিত হবে তিনি সাকার সগুণ দেবমূর্তি বিশেষ। সংসারে সকল কর্ম সম্পাদন করে সাকার ঈশ্বরে ভক্তি নিবেদন করে সেই পরমপুরুষের সাথেই মিলিত হওয়া যায়। এই ভক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতীক স্বরূপা শ্রীরাধা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কার্যত মৈত্রী এবং শ্রীরাধার চরম লক্ষ্য সেই অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দেখিয়েছে এক অপূর্ব পন্থা। সেখানে জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তি মার্গের স্বরূপ বর্ণনার পর নিষ্কাম কর্ম এবং সমবুদ্ধির দ্বারা এই দুই মার্গের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। গীতায় অসীমের প্রকাশ, নবদূর্বাদলশ্যাম দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেই আশ্রয় করবার জন্য ভক্তপ্রধান, শরণাগত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে উপদেশ দিলেন—

'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১২শ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ আমাতেই মন সংযুক্ত কর, আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এতে কোনো সংশয় নেই যে এরকম করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে। গীতায় কেবল জ্ঞানই একমাত্র প্রতিপাদ্য নয়। গীতার যে অনুপম মাধুর্য, যে প্রেমরসে গীতাভক্তগণ শতশত বছর ধরে সতত অবগাহন করে আসছেন তার পশ্চাতে গীতায় প্রতিপাদিত ভক্তিমার্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্ত অক্ষয় নিরুপাধিক ব্রহ্মের সেবা করতে বলেছেন তথাপি তাতে ব্যক্তের উপাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে। এর কারণ হল ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন সাধারণের সামনে। অর্জুন যখন শুনলেন যে তাঁর সামনে সেই অব্যক্ত অক্ষয় পরব্রহ্মের প্রতিভূস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান তখন তাঁর অন্তর ভক্তির প্রবল স্রোতে আপ্লুত হল। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমেশ্বর বলে ঘোষণা করে সেই ব্যক্ত স্বরূপকে আগে স্থাপন করে সর্বত্র প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার করে বলেছেন— 'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক)* ইত্যাদি। এরকম অনেক জায়গায় তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। ভক্তির বীজ এভাবে সমগ্র গীতা গ্রন্থের মধ্যে বপন

করা হয়েছে এবং এতে ফল ফলেছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন— "হে ধনঞ্জয়! তুমি যদি আমাতে মনস্থির করতে না পার তাহলে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে লাভ করার প্রয়াস কর, তাও করতে যদি অসমর্থ হও তাহলে আমারই জন্য কর্ম করে যাও, আর তাও যদি করতে না পার তাহলে— 'সর্ব কর্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১২শ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* আমার যোগের আশ্রয় করে সর্বকর্মের ফলত্যাগ কর। কারণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ এবং এই ত্যাগের ফলেই আসে শান্তি।" ত্যাগের দ্বারা লাভ করার এই চরমতম উপদেশ। এটাই সনাতন হিন্দুধর্ম তথা গীতার উপদেশগুলোর মধ্যে মুখ্যতম।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ভাগবত তথা নারদের ভক্তি সূত্রে প্রকৃত ভক্ত বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বা কী কী গুণ প্রকৃত ভক্তের মধ্যে থাকা উচিত। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ কাকে প্রকৃত ভক্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তা আলোচিত হচ্ছে। 'যিনি মৈত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, দ্বেষরহিত, সদা সন্তুষ্ট সংযত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যাঁহার মন আমাতেই সমর্পিত *সেই ভক্তই আমার প্রিয়'* এটাই শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণা। যিনি কিছুই প্রত্যাশা করেন না, শুদ্ধ *ও দক্ষ নিরাসক্ত এবং কার্যে সকল প্রকার নব প্রবর্তন ত্যাগী তিনিও ঈশ্বরের ভক্ত। যিনি শত্রুমিত্রে সমদর্শী,* মান ও অপমান সমান জ্ঞান করেন, সুখ ও দুঃখ যাকে বিচলিত করতে পারে না, যিনি স্থির চিত্ত, যাঁর নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, যিনি নিন্দাস্তুতি উভয় অবস্থাতেই মৌন থাকেন, সেই রূপ ভক্তই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়। এই ভক্তিযোগের অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'যাঁরা আমার বর্ণিত আনুপূর্বিক এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন সেই শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* ভক্তিরসে আপ্লুত চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, ভক্তের নিম্নোক্ত গুণগুলো থাকা প্রয়োজন—

'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ।।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি দক্ষ মৌনী।।'

('চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা', ২২ স্কন্ধ, ৭৪শ অধ্যায়, ৭৬ শ্লোক)

মানুষের একমাত্র লক্ষ্যই হল ভগবানের প্রতি পরমা ভক্তি ও সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা। ভাগবতে ভক্ত প্রহ্লাদের কণ্ঠে এই বাক্যই ধ্বনিত হয়েছে—

'একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।' *('ভাগবত', ৭ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)* যিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তিনি ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তির অধিকারী হন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক)

এর দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে নিরাকার পরব্রহ্মে ব্যক্তিবিশেষের নির্বাণ লাভই গীতার চরম লক্ষ্য নয়। যে পরমেশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, ভক্তির দ্বারা তাঁকে লাভ করাই উদ্দেশ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ এবং নরদেহ অবলম্বনের কারণ প্রভৃতি আগেই অর্জুনকে বলেছেন। গীতার অন্তিমে সকল প্রকার সংশয় এবং সমস্যার সমাধান করে তিনি বললেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

এভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখা করে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে তাঁকে আশ্রয় করার উপদেশ দিয়ে সহানুভূতির হাত ভক্তের উদ্দেশ্যে প্রসারিত করেছেন।

কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়

কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিন স্রোতস্বতী গীতারূপ মহার্নবে মিলিত হয়েছে। সেখানে এই ত্রিধারাকে পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত করার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম, অতঃপর জ্ঞান এবং অন্তিমে ভক্তি এভাবে কোনো সীমা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোনো কোনো গীতা ব্যাখ্যাতা এরকমভাবে গীতাকে তিনটি ষট্‌কে বিভক্ত করার অভিমত পোষণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ভাষ্যকার এইভাবে বিভাগ করে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো একটির অর্থাৎ কর্মের জ্ঞানের বা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন আচার্য শঙ্কর এবং তার অনুগামিগণ। কর্ম এবং ভক্তি তাঁদের মতে জ্ঞান লাভের দুটি সোপান মাত্র। কেউ কেউ কর্মকেই প্রকৃত পথ বলে ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধরূপ কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে অর্জুনের মোহ উপস্থিত হলে সেই মোহপাশ ছিন্ন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দিয়েছেন। এই মতই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কারণ কর্মীকে কর্ম প্রেরণা দেবার জন্য যে উপদেশ বাণী প্রদত্ত হয়েছে তাতে কর্মের প্রাধান্য থাকবেই। এই কর্মের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে গীতকার নিষ্কাম কর্মেরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। কর্মে আসক্তি ফললাভের

আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মে কর্তৃত্ববোধ এই ত্রিবিধ দোষমুক্ত যে কর্ম তাই নিষ্কাম পদবাচ্য। তাই প্রাপ্তির আশা বর্জন করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপদেশই শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন। অন্যায়কারী পাপাচারীর শাস্তি বিধান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ম। এই কথা স্মরণ করে যুদ্ধ করতে হবে, কখনো যেন 'ভোগের জন্য রাজ্য জয় করব' এই চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কর্মের জন্য কর্ম করতে হবে। ফলের জন্য কর্ম নয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অনুরূপ উক্তি দেখা যায়—

'মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথা ব্যাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মনি ক আগ্রহঃ।।'

('যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ কিছু কাজ হোক বা না হোক আমার কাছে উভয়ে সমান। কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকবো কেন? আমি উপলক্ষ্য পেলেই কাজ করি।

সর্বদা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা উচিত। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাঁরা দারা সুত পরিবৃত হয়ে সংসারের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছেন তাদের পক্ষে নিষ্কামভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। যে কোনো কাজ করতে গেলেই তাঁর লাভ এবং অলাভবিষয়ক চিন্তা তাদের চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করে। ঠিক একইভাবে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অর্জুন মোহাবিষ্ট হয়েছেন। তাকে শ্রীকৃষ্ণ যদি ক্রমাগত বলতে থাকেন যে নিষ্কাম কর্ম কর, নিষ্কাম কর্ম কর, তাহলে অর্জুনের মনে এইরূপ সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক যে কর্ম না করলেই বা ক্ষতি কি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপায়ই বা কী? তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংশয় অপনোদন করে বললেন যে কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালের জন্যও থাকতে পারে না। কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের সাথে জীব সৃষ্টি করে ব্রহ্মা বলেছিলেন— 'অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্ঠকামধূক'। *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ১০ শ্লোক)* অর্থাৎ এই যজ্ঞরূপ কর্ম দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও। আমরা যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ এবং বর্জন করি তাও এক প্রকার কর্ম, সুতরাং কর্ম বর্জন সম্ভব নয়। এটা আগেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি তাঁর চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা নিয়ে অহোরাত্র কর্ম করে চলছে। সুতরাং অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ যে তুমি কর্ম কর, কিন্তু সেই কর্ম যেন নিষ্কাম হয়।

নিষ্কাম কর্ম সাধনের উপায় স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান কীরকম?—

'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

যা লাভ করলে যোগী অন্য কোনো লাভকে আর অধিক মনে করেন না এবং যাতে অবস্থিত হলে মহাদুঃখও বিচলিত করতে পারে না। চরাচরাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরাজ করেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের অংশ স্বরূপ জীবাত্মা। তাঁর কোনো দিন বিনাশ নেই, তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য এবং সর্বগত। তিনি মাঝে মাঝে দেহান্তর গ্রহণ করেন মাত্র। সাধারণ মানুষ যাকে মৃত্যু বলে ভয় করে তা এই আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আত্মা সর্বব্যাপী পরমাত্মার অংশ। ঘটে বা পটে যেমন ঘটাকাশ বা পটাকাশ ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না সেই ঘট বা পট বিনষ্ট হয়। তেমনই আত্মা জীব দেহকে আশ্রয় করে থাকে কিন্তু সেই দেহের বিনষ্টির পর ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিলিত হয় তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। সুতরাং পরিদৃশ্যমান এই যোদ্ধাগণ সকলেই একদিন না একদিন চির আঁখি মুদবে। অতএব তাঁদের বিনাশ করতে কোনো বাধা নেই এটাই অর্জুনের প্রতি উপদেশ। কর্ম করতেই হবে, কর্ম না করলেই যে সিদ্ধি তাও নয়। অতএব কর্তব্য কর্ম অবশ্য বিধেয়, সেই কর্মে নিষ্কামতা আসবে আত্মাতত্ত্ব জ্ঞান হতে। অর্থাৎ উপরিউক্ত আত্মার স্বরূপ, উৎকর্ষ ইত্যাদি জ্ঞান হলে কর্মের প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না। ভালর প্রতি আকর্ষণ এবং মন্দর প্রতি বিকর্ষণ বোধ লুপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সমদর্শী হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন—

'সুখে দুঃখে সমকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্সসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)

নিষ্কাম কর্ম সমাচরণ করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। সাধারণত শুভ কর্ম করলে যে আনন্দ লাভ হয় তা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে আনন্দ তার অংশমাত্র। অতএব ক্ষুদ্র সুখ বা আনন্দের অলাভজনিত যে নিরানন্দ তা পরিহার্য। নিষ্কাম কর্ম করলেই আপনার আনন্দ লাভ হয়। 'কিন্তু নিষ্কামতা, কর্মফলত্যাগ, বলা মাত্রই হয় না। এটা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ নয়। এটা হৃদয়ের মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়। এই ত্যাগ শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞান চাই। এক প্রকার জ্ঞান তো অনেক পণ্ডিতই পেয়ে থাকেন। বেদাদি তাদের কণ্ঠে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ভোগে লিপ্ত থাকেন। জ্ঞানের ব্যবহার শুষ্ক পাণ্ডিত্য রূপে যাতে না দেখা দেয়, সেজন্য গীতাকার জ্ঞানের সাথে ভক্তি মিলিয়েছেন এবং তাকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন। ভক্তি বিনা জ্ঞান নিরর্থক। সেজন্যই বলা হয়—'ভক্তি কবতো জ্ঞান মিলিবেই। ভক্তি মাথার মূলে কিনিতে হয়। সেই হেতু গীতাকার ভক্তের লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় করেছেন।' *('গান্ধী রচনা সম্ভার', শতবার্ষিক সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩)* গীতোক্ত এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং এর সাথে

ঔপনিষদিক জ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। সকল বস্তুতে বিরাজমান ব্রহ্ম স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধ হলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সংশয় ছিন্ন এবং সকল কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। মণ্ডুক উপনিষদের ভাষায়—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যতে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্বকর্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।'

('মণ্ডুকোপনিষদ', ২য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)

গীতায় বলা হয়েছে— 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক)* সেই একই ভাব ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। আচার্য শঙ্করও জ্ঞান লাভের উপায় রূপে কর্মের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন—

'ন ক্রিয়ারহিতং জ্ঞানং ন জ্ঞানরহিতা ক্রিয়া।
জ্ঞান ক্রিয়া বিনিস্পন্নঃ আচার্য ন উপাশ্পহা।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', শঙ্কর ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১১ শ্লোক)

জ্ঞান এবং কর্ম দুই পক্ষেই মোক্ষ লাভ হয়। কোনো একটিকে গ্রহণ করে অপরটিকে বর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে ব্রহ্মজ্ঞান এবং তা থেকেই মুক্তি। 'জগতের মুক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন— 'জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তখন শক্তি যোগে কর্ম দ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ৯৬)* প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এই সমুচ্চত্বয়াত্মক জ্ঞান এবং কর্মই দিতে পারে শান্তি এবং মুক্তির যথার্থ পথের সন্ধান। সংসারে সকল বন্ধনের মধ্যে থেকে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। তখন রোগ শোক কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না। কেবল একটি পন্থাবলম্বন করে কেউ ব্রহ্ম লাভ করতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তাকেও কর্ম করতে হয় আবার যিনি কর্মী, কর্মের পথেই জ্ঞান তার কাছে সমাগত হয়। জ্ঞান ও কর্মের অবিচ্ছিন্ন ধারায় সিক্ত মানব হৃদয় ক্রমশই মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।

মোক্ষের জন্য কেবল কর্ম নয় জ্ঞানেরও প্রয়োজন। কিন্তু সেই জ্ঞান নিরর্থক হয়ে যায় যদি তাতে ভক্তির সংযোগ না ঘটে। গীতায় সেই জন্য ভক্তি এক প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেছে। ভক্তি তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে প্রধানত ভাগবতে। সেখানে দেখা যায় 'নৈষ্কর্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞান মলং নিরঞ্জনম্' *('ভাগবত', ১২ স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)* অর্থাৎ জ্ঞান এবং নৈষ্কর্ম্য মোক্ষদায়ক হলেও ভক্তি ব্যতীত শোভা পায় না। গীতায় ভগবান বলেছেন 'ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি'। অর্থাৎ আমার ভক্ত কদাচ বিনষ্ট হন না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এক সগুন সাকার

ভগবানের সঙ্গো প্রেম ও বিশ্বাসের মধুর সম্পর্কই ভক্তি। গীতার ভক্তি জ্ঞানাশ্রয়ী। আগে সগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানার পরেই ভক্তির উদয় হয়। ভগবান তাই অর্জুনের সামনে নিজের স্বরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। নিজের বিভূতিগুলো বর্ণনা করে বুঝালেন যে সকল বস্তুর মধ্যে যা যা শ্রেষ্ঠ তাই তিনি। সমগ্র জগৎ তিনি তার এক পদের দ্বারা ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অর্জুন ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও স্থিতির গোপন রহস্য সম্পূর্ণ অবগত হলেন। ভগবান পুনরায় বললেন যে 'ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ' ভক্তিমান আমার অতীব প্রিয়। জ্ঞানের সাথে ভক্তির বিরোধ সম্পর্ক নয়। শ্রীকৃষ্ণ আগেই তার চার প্রকার উপাসকের কথা বলেছেন— বিপন্ন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিষয়কামী এবং জ্ঞানী। অবশেষে জ্ঞানের সাথে ভক্তির যে কোনো বিরোধ নেই তা প্রতিপাদন করে বলা হয়েছে—

'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

অর্থাৎ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়। গীতায় কর্মযোগের মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা হল নিষ্কাম হওয়া বা সমবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অখণ্ডমণ্ডলাকার পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী যে স্বরূপ তার জ্ঞান। এই জ্ঞান পরমেশ্বরের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়রূপের উপাসনার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরের দৃশ্যমান যে রূপ ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁর আরাধনা করে মুক্তি লাভ করা গীতার মতে সহজতর পথ। এইভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান না হলে ভক্তি আসতে পারে না। 'জ্ঞান এবং ভক্তি ইহারা পিতা এবং মাতার স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। ভক্তি না হইলে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, কার্য্য না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হইলে জ্ঞান জন্মে না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ২৩৬)* এটা প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অভিমত : জ্ঞান মার্গ এবং ভক্তিমার্গের মধ্যে প্রভেদ এই যে জ্ঞান মার্গের শুরুতেই বুদ্ধির সাহায্যে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয় এবং ভক্তির পথে পরমেশ্বরের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয় শ্রদ্ধার মাধ্যমে। গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করে ভগবান বলেছেন—

'ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক)

অর্থাৎ এই জ্ঞান লক্ষণ ভক্তির দ্বারা আমার স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং তার পরে সেই ভক্ত আমাতে এসে মিলিত হয়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন— 'আমার বিশ্বাস কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞান কাণ্ডে যে বিরোধ দেখা যায় সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার ভগবদ্গীতায় ঘটিয়াছে।' অতএব জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ গীতার আলোকে বিদূরিত হয়। 'জ্ঞান চাইই, মুক্তির জন্য ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর কিছুই নাই। তবে জ্ঞানের সহিত কর্মের প্রয়োজন আছে। কর্ম ও জ্ঞানের মিলনের দ্বারা আত্মা শুধু কর্মশূন্য শান্তির অবস্থায় নহে, ভীষণ কর্ম কোলাহলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ভক্তি সর্বতোভাবে প্রয়োজন কিন্তু ভক্তি সহিত কর্মও প্রয়োজনীয়, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি একইকালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধিশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করেন। ইহাই গীতার সমন্বয়।' *('গীতা নিবন্ধ', শ্রীঅরবিন্দ, অনিলবরণ রায় সম্পাদিত, ১৯৭১, পৃ. ৭৫)* ঋষি শ্রীঅরবিন্দ গীতার মধ্যে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় দেখে উপরিউক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। অতএব এই দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও গীতায় জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। জ্ঞানাশ্রিত ভক্তিমূলক নিষ্কাম কর্মই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশেষে এক উদ্ধৃত শ্লোকের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই বিষয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে—

'চরাচর মিদং সর্বং যৎ সৃষ্টং কর্মনা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম ভজেন্নিত্যং ভক্তি জ্ঞান সমন্বিতম্।'

('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ২৪০)

'আমি কর্মের দ্বারাই চরাচর সমুদায়ের সৃষ্টি করেছি অতএব ভক্তি এবং জ্ঞানযুক্ত হয়ে নিত্যই কর্মের সেবা' করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— 'অনন্ত পথ — তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি - যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। ভক্তিযোগ যুগ ধর্ম তার মানে এই নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আরেক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধরেও যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।' *('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', মৌসুমী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২৩)* এই হল সমন্বয়ী মহাসাধকের দৃষ্টিতে গীতা সমন্বয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মানুষের উৎপত্তি এবং সমাজের স্বরূপ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সকল প্রকার ইহলৌকিক বন্ধনের মধ্যে সমাজবন্ধন সুদৃঢ়তম। সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা সোনার পাথর বাটীর ন্যায় অলীক। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানসিক এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সমাজ উন্নত হয় এবং সমাজের অগ্রগতিই রাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যা মানুষের চিত্তকে কলুষিত করে তুলেছ। তার ফলে সমাজ দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই অবনতি এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে গৃহ, সমাজ তথা রাষ্ট্র রক্ষা পেতে পারে একমাত্র গীতার উপদেশাবলীর যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে। গীতা কীভাবে এই সকল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হয়। এটা সর্বজন বিদিত যে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। এই মর্মে মহাভারতকার বলেছেন—'গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি. ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৯৯-তম অধ্যায়)* অতএব সমাজ যারা সৃষ্টি করেছে, বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সেই মানুষের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে তাই প্রথম আলোচ্য। দ্বিতীয়ত, সমাজের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ কী?

পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের একটি আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় প্রত্যেকে বিদেশজাত দ্রব্য পরিহার করে স্বদেশজাত দ্রব্যের সমাদর করত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে পরানুকরণের এক ব্যাপক সাড়া পড়েছে। অর্থাৎ স্বদেশের শিল্প-সাহিত্যের চরম অবমাননা করেও বিদেশী শিল্প-সাহিত্যের স্তুতি করা বর্তমান উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমরা বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করি। কিন্তু তা ভ্রম প্রমাদ শূন্য কিনা ভাববার অবকাশ

পাই না। কিন্তু ভারতবর্ষের শাস্ত্রসমূহ, যা কোন্ সুদূর অতীতে লিখিত হয়েছিল তাতে এবং রামায়ণ, মহাভারতে তৎকালীন সমাজের যে নিখুঁত চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব যেমনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকে অলীক কল্পনা করা হয়। মানুষ তথা এই বিশ্বের সৃষ্টির বিষয়ে 'ক্রমবিবর্তনবাদ' বলে যে মতবাদ প্রচলিত আছে তার সাথে হিন্দুশাস্ত্র ও ইতিহাসের অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু এক বৃহৎ সংখ্যক জনসমষ্টি হিন্দু ধর্ম এবং শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসবশত তদুক্ত মতামতকে অগ্রাহ করে অধুনা প্রচারিত বিদেশী ব্যক্তিবর্গের লিখিত কোনো কোনো ত্রুটিযুক্ত ইতিহাসকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছে। 'ক্রমবিবর্তনবাদ' অনুসারে বর্তমানে পরিদৃষ্ট বানর জাতীয় জীবই মানুষের পূর্ব পুরুষ। তাহাদের পশ্চাদ্দেশে লম্বমান বিশেষ প্রত্যঙ্গটি লুপ্ত হয়ে বর্তমান পূর্ণ রূপটি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের বা ভারতবর্ষের যে চিরকালীন ইতিহাস অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, পুরাণ তাতে কোথাও এই কথার বিন্দুমাত্র সমর্থন পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই বিশ্বসৃষ্টির সময়ই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবর্ষি-পিতৃ-দানব, মনুষ্য প্রভৃতির সৃষ্টি করেছেন। উপনিষদ বলেন—'মোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' অদ্বিতীয় পরমাত্মা কামনা করলেন 'আমি বহু হইব'। 'ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' *('তৈত্তিরীয়োপনিষদ', ২য় অধ্যায়, ৬ শ্লোক)* দৃশ্যমান সমস্তই সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তৎ সমস্তে প্রবিষ্ট হলেন। প্রসঙ্গাক্রমে সর্বশাস্ত্রবিদ্ কবি নজরুল ইসলামের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে— 'যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টিকাম,

সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।'

('সঞ্চিতা', কাজী নজরুল ইসলাম, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৪২)

আবার বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় মৈত্রেয় জানতে চাইছেন—

'যথা সসর্জ্জ দেবোহসৌ দেবর্ষি-পিতৃ-দানবান্।
মনুষ্য-তির্য্যগ্-বৃক্ষাদীন্ ভূ-বোম-সলিলৌকসঃ।'

('বিষ্ণুপুরাণ', ৫ম অধ্যায়, ১ শ্লোক)

অর্থাৎ 'হে দ্বিজ! দেব ব্রহ্মা যে রূপে দেবর্ষি-পিতৃ-দান-মনুষ্য-তির্য্যক পশুপক্ষী প্রভৃতি, বৃক্ষাদি-ভূ-আকাশ-জলবাসীদের সৃষ্টি করলেন তা আমাকে বলুন।' তার উত্তরে সৃষ্টি বর্ণনা করতে করতে পরাশয় বললেন—

'রাজোমাত্রাত্মিকা মন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ।
রাজোমাত্রাৎকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজ সত্তম।'

('বিষ্ণু পুরাণ', ৫ম অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)

'হে দ্বিজ সত্তম! তখন ব্রহ্মা জারোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করলেন, তাতে রজোগুণ প্রধান মানুষেরা জন্মিল।' এর থেকে *স্পষ্টতই প্রতীত হয় যে বিশ্বসৃষ্টির* সাথে ব্রহ্মা মানুষেরও সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া 'মনুসংহিতার'—

'তেষাত্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্বভূতানি নির্মমে।'

('মনুসংহিতা', ১ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যায় টীকাকার কুল্লূকভট্ট বলেন— 'তেষাং ষন্নাং পূর্বোক্তাহংকারস্য তন্মাত্রাণাঞ্চ যে সূক্ষ্মা অবয়বাস্তান্ আত্মমাত্রাসু ষন্নাং স্ববিকারেষু যোজিয়িত্বা মনুষ্য-তির্য্যক্-স্থাবরাদীনি সর্বভূতানি পরমাত্মা নির্মিতবান্।' *('মনুসংহিতা', ১ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক, টীকা)* অর্থাৎ অনন্ত কার্যক্ষম অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি সূক্ষ্মতম অবয়বকে তাদের বিকার—ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সাথে যোজনা করে তিনি (ব্রহ্মা) দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি সকল জীবের সৃষ্টি করলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে সৃষ্টির প্রথম সময়েই মনুষ্য সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান কি এই তথ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার মতন বলিষ্ঠ কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পেরেছে? আধুনিক বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত এমন কোনো নূতন আলোক দেখাতে পারেনি যা ভারতীয় ঋষিগণের কল্পনালোকে তরঙ্গায়িত হয়নি। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিগত শতাব্দীতে তার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে গাছেরও প্রাণ আছে। কিন্তু শত শত বৎসর আগে সংহতিকার মনু তাঁর মনুসংহিতায় লিখে গেছেন— 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেব সুখ দুঃখ সমন্বিতা।' অর্থাৎ গাছের চেতনা আছে এবং তারা সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে। সেই মহাবিজ্ঞানী তাঁই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন— 'যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা স্বরূপ নয়। সর্বদা ভুল দেখি ভুল ভাবি, ভুল শুনি।' সুস্থ জীবনযাপনের জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য হলেও মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান দিক্ দর্শন করাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন অহংকার ও লোভকে প্রশমিত করে মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলোর উৎকর্ষ সাধন করা। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বা বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিককে ধর্ম, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein বলেছেন— 'Science is lame without religion and religion is blind without Science.' অর্থাৎ ধর্মহীন বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম হচ্ছে অন্ধ।

কিন্তু সমস্যা হল এই যে অধুনাতন কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রসমূহ, পুরাণ প্রভৃতিকে সাধারণ সাহিত্যকর্ম বলে অবহেলা করে থাকেন, ইতিহাস বলে

এদের স্বীকার করেন না। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী তার গ্রন্থে নিম্মোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন— 'সত্যই কি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই? ভক্ত বলিয়াছেন— আকাশ যদি পাত্র হয়, সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয় তাহা হইলেও ভগবানের মহিমা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেকটা সেই উক্তিই প্রযোজ্য। ভারতের ইতিহাস কী? ভারতের ইতিহাস ভগবান্মহিমা ঘোষণা। যখনই ধর্মের গ্লানি হইয়াছে, যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে আর যখনই শ্রী ভগবান ধর্মরক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই ভারতের সাহিত্যে ভারতের ইতিহাস বিকাশ পাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে তৎ সমুদয়ও প্রধানত বিপ্লবের ইতিহাস—সংঘর্ষের ইতিহাস। তবে পার্থক্য এখন রাজ্য, ঐশ্বর্য লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সে দ্বন্দ্ব ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন ধর্ম ও অধর্মের সংঘর্ষে ধর্মের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে সর্বত্রই সেই দুন্দুভি নিনাদ। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে যে বীণা ধ্বনির ঝঙ্কার তুলিয়াছেন তাহাতেই বা কি মূর্চ্ছনায় কি স্বর-লহরী উত্থিত হইয়াছে? শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নিনাদে ব্যোম প্রতিধ্বনি করিয়া কী বাণী ঘোষণা করছেন? তন্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে প্রাচীন ভারতের আর আর প্রাচীন ইতিহাসে কী নিদর্শন প্রকটিত হইয়াছে? সকলেরই লক্ষ্য-অধর্মের বিক্ষোভ বিদূরণে ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন। তাহাই কি ভারতের ইতিহাস নহে?' *('ভারতের ইতিহাস', শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০)* উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতকে যদি ইতিহাস হিসাবে স্বীকার না করে সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় তাহলেই তাদের ঐতিহাসিকতা সিদ্ধ হবে। কেননা সাহিত্যের উপর তৎকালীন সমাজ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে যেসব সাহিত্য অর্থাৎ নাটক, উপন্যাস, কাব্য ইত্যাদি রচিত হচ্ছে তাতে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং আগের গ্রন্থগুলিকে যদি উত্তম সাহিত্য কীর্ত্তি হিসাবে স্বীকার করা হয় তা হলে সেই সকল গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ তৎকালীন সমাজের যথার্থ ইতিহাস হবে এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন— 'পুরাণগুলিকে অলীক কাব্য রচনা মাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্য।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ৩২)* অতএব ভারতবর্ষীয়দের উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোকে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে মান্য করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সুতরাং মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে যা লিখিত হয়েছে তাকেই প্রামাণ্য হিসাবে

স্বীকার করতে হবে।

বর্তমান সমাজ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রকৃতি ও স্বরূপ কী তাই সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হবে। সমুদ্র মন্থনের সময় চঞ্চলা কমলার যেভাবে উদ্ভব হয়েছিল সমাজ সেইভাবে কোনো একদিনে বা বিশেষ মুহূর্তে উদ্ভূত হয়নি যেহেতু তা কোনো বিশেষ বস্তু নয়। মৌমাছি সংঘবদ্ধ হয়ে মধুচক্রে বসবাস করে, কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণীর মৎস্য ঝাঁকে ঝাঁকে সন্তরণ করে থাকে কিন্তু তাদের সমাজবদ্ধ জীব বলে না। কতকগুলি পরিবার যখন সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থানের জন্য পরস্পর সৌহার্দপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক সংস্থাপন করে বসবাস করে তখন তাকে সামাজ আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি সমাজে এক একটি পরিবার স্তম্ভের মতো ভূমিকা পালন করছে। সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। Aristotle বলেন— 'Man is by nature an animal intended to live in a polis (association). He who is without a polis, by reason of his own nature is either a poor sort of being, or a being higher them man.' *(Tr. by Earnest Barker, 'সামাজিক প্রবন্ধ', পৃ. ৬৮ থেকে সংকলিত)* মানুষের নিকট সমাজ হল উপায়, উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ সমাজ বন্ধনের সাহায্যে মানুষ নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করতে পারে। মানুষের উদ্দেশ্য সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় হল সমাজবন্ধন। 'যুক্তি এবং শাস্ত্রমতে সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১ পৃ. ৩০)* যেখানে সুখ ও দুঃখ, হাসি-অশ্রু পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত সেখানেই সমাজ এই অভিমত পোষণ করেন কথাশিল্পি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'যে সমাজ মরা মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়, বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয় অথচ বৌভাতে হয়ত বাকিয়া বসে; কাজ কর্মে হাতে পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে ব্যসনে যে সাহায্যও করে বিবাদও করে; যে সহস্র দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয় আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দারা শাসিত হয় সেই বস্তুটিকেই সমাজ ধর্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।' *('সমাজ ধর্মের মূল্য', শরৎ রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭)* এটাই সমাজের যথার্থ রূপ এবং পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষ প্রকৃত সমাজ অর্থে একেই বুঝে থাকে। তাবলে এরকম কল্পনা সঙ্গত নয় যে কেবল প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। তাহলে সমাজ হবে মানব মনের কারাগার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই জন্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— 'যখনই

জানব প্রয়োজনই মানব সমাজের মূলগত নয়, প্রেম এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয় তখনই একমুহূর্তে আমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাব।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ১৭)* এই সমাজের আয়ুকাল বা উৎপত্তি কোন্ সুদূর যুগে হয়েছিল তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তাই মনীষী প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমাজকে দেব শরীরের সাথে তুলনা করে বলেছেন— 'দেব শরীরের আদ্যারন্ত নেই, তেমন কোন্ সমাজ পৃথিবীতে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যেমন দেবতারা চিরকাল যৌবনাবস্থ, তেমনই সমাজও চিরকাল যৌবনাবস্থ। আপনা হইতে সমাজের জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু নাই। যেমন দেবতাদিগের এক একটি বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনই প্রত্যেক সমাজ আপনাপন মূল প্রকৃতি লইয়াই চিরকাল চলিয়া থাকে।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ৪৯)* বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজ তথা সামাজিক ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ব্যাতীত সমাজের কোনো অস্তিত্ব নেই। 'মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাই। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা আর ভাষা সমাজের মাতা। ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং বল। সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম এবং ভাষা গিয়াছে সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে এমন কথা বলা চলে না।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ১৮৬)* সমাজের সৃষ্টি যে মানুষের দ্বারা এবং তাদেরই জন্য তা স্মরণ করে ঋষি অরবিন্দ বলেন— 'মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট। যাঁহারা মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে ভুলিয়া সমাজকে বড় করিয়া তোলেন, তাঁহারা অপদেবতার পূজা করেন। অযথা সমাজ পূজা মনুষ্য-জীবনের কৃত্রিমতার লক্ষণ, স্বধর্মের বিকৃতি।' *('বিবিধ রচনা', শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৫৫ সংস্করণ, পৃ. ৩)* রাষ্ট্র এবং সমাজের উৎপত্তির বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে— 'দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত; যারা সমতল জমিতে, তাদের চাষ-বাস, যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চড়াত, যারা মরুময় দেশে তারা ছাগল, উট চরাতে লাগলেন। কতকদল জঙ্গালের মধ্যে বাস করে শিকার করে খেতে লাগল। যারা সমতল দেশ পেলে চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগলো। ... এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথা সকলের সৃষ্টি হতে লাগলো।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩)*

সমাজের উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। তা সাধিত হতে পারে ব্যক্তির উন্নতির মাধ্যমে। কারণ ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে— 'Charity begins at home'. এই দয়াদাক্ষিণ্যের মত সব মানবিক বৃত্তিগুলোরই অভ্যাস গৃহেই করা উচিত। তা হলে তাই সমাজের বুকে প্রতিফলিত হবে। তাই এক কথায় বলা চলে যে পারিবারিক জীবনই সমাজ জীবনের শিক্ষাগার। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে একত্র বসবাস করাকেই পরিবার বলে। অনেকগুলো ব্যক্তি সেখানে এক গৃহকর্তার অধীন থাকে। বিন্দু বিন্দু জল যেমন অতল সাগর গড়ে তোলে তেমনই অনেকে মিলে এক হবার ধারণা প্রথমে পারিবারিক জীবনেই শিক্ষা হয়। মানুষের সুখ সৌন্দর্যবোধ এবং তার যথাযথ আচরণের মাধ্যমে সমাজ জীবন সভ্য জীবনে পরিণত হয় অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা নব নব ভাবে তাদের সভ্যতার বিকশ ঘটতে থাকে। এই সভ্যজীবনেরই পরিপূর্ণ ফল এক জাতি। ব্যক্তির উন্নতির দ্বারাই যে সমাজের উন্নতি দ্রুততর হয় তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পর যুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা; আর একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তির উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছন্ন নয়। ... বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানুষের লক্ষ্য।' *('রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্ত্তি গ্রন্থমালা, পৃ. ৫০৬)* ব্যক্তি বা সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য বা সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য সমাজস্থ সকলের যথাযথ ধর্মাচরণ করা বিধেয়। এই 'ধর্মের দুটো দিক আছে যে, একটা নিত্যদিক, আর একটা লৌকিক দিক। ধর্ম সেখানে সমাজের নিয়েমে প্রকাশ পাচ্ছেন সেখানে তাকে অবহেলা করতে পারা যায় না; তা করলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০৬)* সাধারণ মানুষ সমাজের মধ্যে যে সমস্ত উচ্চভাবনাগুলো আছে তাকে কুসংস্কার বলে অবমাননা করে কিন্তু তাই প্রকৃত ধর্ম এবং লোকশিক্ষার জন্য সমাজের কোনো বিশেষ নিয়মের দ্বার দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। 'ব্যক্তি এবং সমাজ দুইয়ের উপরেই একটি ধর্ম আছে, সেইটের উপরে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। যেমন ব্যক্তিকে বাঁচানোই আমার চরম কর্তব্য নয় তেমনই সমাজকে বাঁচানোও আমার চরম কর্তব্য নয়, একমাত্র ধর্মকে বাঁচানোই আমার চরম শ্রেয়।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ৬ষ্ঠ*

খণ্ড, পৃ. ৫০৬) এটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি। তা হলে এটাই প্রতীত হচ্ছে যে ব্যক্তির দ্বারাই সমাজের চরম উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে যদি ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত আচার বিচাররূপ বিভিন্ন ধর্মগুলোকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ এবং হৃদয়ে ধারণ করতে পারে।

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ। কালে কালে এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বহু ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে আবার অন্ত-শাসন প্রবল না থাকার দরুণ কালের গহ্বরে তা বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কাউকেও পরিত্যাগ করেনি। সকলকেই তার অন্তরে ধারণ করেছে। কবি সম্রাটের ভাষায়— 'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগ সাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমনা, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ২৫১)* ভারতবর্ষের চিরন্তন ও সনাতন ধর্ম হল আর্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম। ভারতবর্ষস্থ অপরাপর ধর্ম সকলের মধ্যে এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করেন— 'আর্য ধর্মের অপেক্ষা উদারতার ধর্ম মনুষ্যের মনে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এই ধর্ম কোনো একটি বাক্যে অথবা কোনো ঘটনা বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোনো বিশেষ মতবাদে সন্নদ্ধ নয়। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা অধিকার ভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে পারে। ইহা অপর কোনো ধর্মের প্রাপ্য বস্তু নয়। ইহাতে প্রীতিপ্রণোদিত বর্বরজাতীয়দিগের অর্চন বন্ধনাদি, বশ্যতা প্রধান এবং সম্মিলন পটু যুদ্ধকুশল লোকদিগের দাস্য সখ্যাদি, ভক্তি পরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেম বাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্মদর্শনোন্মুখ মানবদিকের আত্মনিবেদন এবং অভেদভাবাদি অতি প্রোজ্জ্বলরূপেই বিদ্যমান। আর্য ধর্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ১৭৯)* অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম কেবল বাহ্যিক শাসনেই শাসিত নয়, যে গুণে এটা সহস্র সহস্র বৎসর স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তা হল এর অন্তঃশাসন। এই অন্তঃশাসনের বলেই হিন্দুধর্ম উত্তুঙ্গ শিখর হিমালয়ের মতো সমগ্র বিশ্বে আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেছে। তারই স্নেহছায়ায় পুষ্ট হয়েছে অন্য কয়েকটি ধর্ম। রবীন্দ্র মানসের এই চিন্তা 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে এইভাবে বিচলিত হয়েছে— 'আমি হিন্দু। কিন্তু তা কোনো দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এজাতি এত বৃহৎ যে কিসে এই জাতির জাতিত্ব তা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমনি দল নয়।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬,*

৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৫৩) বস্তুতপক্ষে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে দল বা গোষ্ঠীই প্রধান কিন্তু ভারতবর্ষের ঐক্যবন্ধনের মূল সুরটি ধর্মের সেতারে বাঁধা। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন— 'ব্যক্তির পক্ষে যেমন প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনই জীবনের এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবন সঙ্গীতের প্রধান সুর, সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐকতান সৃষ্টি করিতেছে। কোনো দেশের যথা ইংল্যান্ডের জীবনীশক্তি রাজনীতিক অধিকার। কলা বিদ্যার উন্নতিই হয়তো অপর কোনো জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন জাতীয় জীবন সঙ্গীতের প্রধান সুর।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৮)* হিন্দু 'ধর্ম' শব্দটিকে কেবলমাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবদর্চ্চনা অর্থেই গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষীয় আর্য ধর্মের যে লক্ষণ উক্ত হয়েছে তদপেক্ষা উদার এবং মহত্তম ধর্ম লক্ষণ পৃথিবীর অপর কোনো ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়নি। মনু বলেছেন—

'ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।'

('মনুসংহিতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯২ শ্লোক)

অর্থাৎ ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটিই ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ। এর যথাযথ অনুশীলনকেই যথার্থ ধর্মাচারণ বলা হয়। অতএব অনায়াসেই প্রতীত হয় যে হিন্দু জাতির উৎকর্ষের মূলে আছে তাদের যথার্থ ধর্মানুরাগ। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন তা কেবলমাত্র তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নয়। তার মূলে ছিল অহিংসা এবং সততারূপ দুই গভীর ধর্মানুরাগ। এই প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীকে উদ্ধৃত করে বলেন— 'Mahatma Gandhi has attempted to define it– 'If I were asked to define the Hindu creed. I should simply say search after truth through non-violent means.' *('The Discovery of India', Jawaharlal Nehru, 1946, P. 53)* হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান করে পন্ডিত নেহেরু বলেন— 'Its essential spirit seems to be to live and let-live.' *('The Discovery of India', Jawaharlal Nehru, 1946, P. 53)* শুধুমাত্র এই বিষয়েই নয় অন্যান্য বিষয়েও এই সনাতন আর্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। 'ধর্ম জীবের স্বভাবগত বস্তু; সুতরাং ন্যূনধিক পরিমাণে সকল শ্রেণীর জীবেই কোনো না কোনো প্রকার ধর্মানুশীলন আছে। কিন্তু অপর সকল জাতিতে ধর্মাচরণের চরম ফল কোনো না কোনো প্রকার স্বর্গলাভ মাত্র। কোনো বিশেষ প্রকার স্বর্গাধিপতিরূপেই

'ঈশ্বর' অপরাপর ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছেন এবং সাধারণত অপর দেশবাসী কর্তৃক পূজিত হবেন। পরন্তু কেবল ভারতভূমিতেই পূর্ণ অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে এবং অদ্বৈতব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ মোক্ষই যে জীবের চরম আদর্শ তাহা কেবল ভারতভূমিতেই ঋষিগণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিদ্যা অন্যত্র নেই।' *('ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', সন্তদাস কাঠিয়াবাবা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২)* অতএব এটা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যেতে পারে যে পরিবার গঠিত হয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে এবং প্রত্যেক পরিবারস্থ ব্যক্তি যখন তাদের যথাযথ ধর্মসমূহ পালন করে পরম জ্ঞান ও চরম সত্য লাভের জন্য সচেষ্ট হয় তখনই সমাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা

একটি পরিবারে যেমন পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রমুখ বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সহাবস্থান হয় তেমনই এই বৃহত্তর পরিবাররূপ সমাজের চারটি ভ্রাতা হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এদের মধ্যে যেমন অভিন্নতা আছে তেমন স্বাতন্ত্র্যও আছে। আগে ভারতবর্ষের সমাজে প্রত্যেকটি মানুষ তাদের বর্ণবিহিত ধর্ম পালন করে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শান্তিলাভের পথ সুগম করত। এই ধর্মের স্রষ্টা ভগবান স্বয়ং। তিনি নিজেই বর্ণ সৃষ্টি করেন। মহাভারতের দুই তিন স্থানে এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীষ্মপর্বে বলা হয়েছে—

'মুখতঃ সোহসৃজৎ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা।
বৈশ্যাংশ্চাপ্যুরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা।।'

('মহাভারত', ভীষ্মপর্ব, ৬৭ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক)

পুনরায় এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় শান্তিপর্বের দু'টি স্থানে—

'ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৭২ অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

সুতরাং যা ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত তাকে মনুষ্য সৃষ্ট বলে সেই মনুষ্যকুলের অবমাননা গর্হিত কাজ বলেই অনুমিত হয়। এই বর্ণ ব্যবস্থা অল্প বিস্তর সকল সমাজেই দেখা যায়। প্রত্যেক সমাজেই একটি উচ্চাবচভাব আছে এবং একে গুণানুসারি করার প্রচেষ্টা সকল সমাজেই হয়ে থাকে। মনু বলেছেন—

'বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীযো যদ্ যদুত্তরম্।।'

('মনুসংহিতা', ২য় অধ্যায়, ১৩৬ শ্লোক)

সমাজে সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান ছিল বিদ্বানের, তার নিচে সুনিপুণ কর্মীর, তারপর বয়োবৃদ্ধের, অতঃপর আভিজাত্যের এবং সর্বনিম্নে স্থান ছিল ধনীর। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ অর্থের দাসত্ব করছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ সেই ধনীর স্থান দিয়েছিল মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বনিম্নে। এই বর্ণানুক্রমিক জাতিভেদ কেন প্রবর্তিত হয়েছিল তা আলোচনা করলে একে ভারতীয় সমাজধর্মের একটি উদারতম দৃষ্টিভঙ্গি বলে বর্ণনা করতে হয়। এটা অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল।

এই প্রথা প্রধানত বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল বলা চলে। জাতিভেদের মুখ্য তাৎপর্যই ছিল বিবাহের বিশুদ্ধি বজায় রাখা। একবর্ণের পুরুষ অপর বর্ণের নারীকে বা এক বর্ণের নারী অপরবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করবেন না, এই ছিল প্রাচীন সামাজিক অনুশাসন। যদি এই অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করে বিবাহ করা হয় তা কদাচ সুফল প্রদান করতে পারে না বলে আর্য ঋষিগণ অনুমান করেছিলেন এবং বর্তমানে বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যায় উন্নত। মানুষও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই সত্যোপলব্ধি করেছেন। সংহিতাকার মনু বলেন—

'বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্তেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে।।'

('মনুসংহিতা', ৯ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ কোথাও পুরুষ উৎকৃষ্ট, কোথাওবা স্ত্রী উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়ে সমান হলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্রে বীজের বৈষম্য হতে পূর্বপুরুষের দোষাদি সন্তানের মধ্যে দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত থাকায় মানুষকে অস্ত্রের এবং ঐশ্বর্যের দাসত্ব করতে হয়নি। এই সমাজে রাজপুত্রগণও বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে তাঁর সেবা করে বাল্যকাল অতিবাহিত করত। একমাত্র ভারতভূমিতেই বলা হয়েছে যে— 'বিদ্যার এখনও সে তেজ আছে যে, সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে।' *('দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১ম ভাগ, পৃ. ৫৯)* যেহেতু এই প্রথা বৈদিক যুগে ছিল না সেই কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে জাতিভেদ প্রথা কৃত্রিমভাবে পরবর্তী কোনো সময়ে সমাজধর্মে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এটা ভাববার অবকাশ আছে যে বেদ পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য এবং এই বেদের যুগেই আর্য সভ্যতার উৎপত্তি এবং চরম বিকাশ হয়েছিল। সেই উন্নত সমাজে অনার্যের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার কল্পনাও আর্যঋষিগণ করতেপারতেন না। ক্রমে সমাজ ব্যবস্থা জটিল হয়ে উঠল এবং সেই প্রয়োজনও অনুভূত হল। মূলত বিবাহ বিষয়ে নিয়ম নির্ধারণ করবার জন্যই বর্ণভেদ প্রবর্তিত হল। নিজ নিজ বর্ণের শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল অনাসক্তভাবে সম্পাদন করে ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ সভ্যতার

চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে পরিদৃষ্ট হয় যে বর্ণানুগ শাস্ত্রবিহিত কর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কর্ম অনিপুণভাবে হলেও সম্পাদন করছে। বর্তমানে স্বীয় বর্ণের মধ্যেই কেবলমাত্র বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় না অসবর্ণ বিবাহ যথেষ্টভাবেই প্রবর্তিত হচ্ছে। মনে করা হয় যে এতেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু সাম্য জগতের কোথাও নেই। প্রাচীন ঋষিগণ যে ধনবৈষম্য হতে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও সুদীর্ঘ স্থিতি কামনা করেছিলেন বর্তমানে সেই বর্ণভেদের বিলোপ সাধন করে কৃত্রিম সাম্য প্রতিষ্ঠার ছলে মানুষের আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীর প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সেই দিনও সুদূর নয় যেদিন এই তিন শ্রেণীর মানুষ পরস্পরের মধ্যে পানাহার বন্ধ করবে। কার্যত সামাজিক ক্ষেত্রে তা হচ্ছেও। বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে তথাকথিত ধনী সম্প্রদায়ের সেবা বা পরিচর্যার জন্য নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ নিযুক্ত রয়েছে এবং ছলে বলে তাঁরা পুরুষাণুক্রমে শোষিত হচ্ছে। বর্ণাশ্রমী শাসন ব্যবস্থায় স্থিত ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিত সম্প্রদায়কে শোষকরূপে প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস করা হয়। কিন্তু তাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ, দয়া প্রভৃতি গুণের দ্বারা সর্বজন মান্য হতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'মদীয় আচার্যদেব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কল্পনা করিয়া দেখ— এরূপ জীবন কি কঠোর! ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরহিত্য- ব্যবসায়ের কথা তোমরা অনেক শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ—এই অদ্ভুত মানুষগুলি কিভাবে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল! দেশের সকল জাতির মধ্যে তাহারা দরিদ্রতম; ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখনো ধনের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। জগতের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিত, সেইজন্যই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। তাঁহারা নিজেরা এরূপ দরিদ্র বটে, তথাপি দেখিবে—যদি গ্রামে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণ পত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখনও অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ইহা ভারতীয় মাতার সর্বপ্রথম কর্তব্য, যেহেতু তিনি মাতা, সেইজন্য তাঁহার কর্তব্য সকলকে খাওয়াই সর্বশেষে নিজে খাওয়া। ... ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাঁহার বিধিনিষেধও তত বেশি। খুব নীচ জাতিরা যাহা খুশি খাইতে পারে, ততপেক্ষা উচ্চতর জাতি সমূহে আহারে বিধিনিষেধ দেখা যায়, আর উচ্চতম জাতি ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি, ব্রাহ্মণের জীবনে পূর্বেই বলিয়াছি— খুব বেশি আচার নিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহারের তুলনায় এই ব্রাহ্মণদের জীবন বিরামহীন তপস্যায় পূর্ণ, কিন্তু তাহাদের খুব স্থৈর্য আছে। তাঁহারা কোনো একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না। একবার তাহাদিগকে

কোনো একটা ভাব দাও, সহজে তাহা অপসারিত করিতে পারিবে না, তবে তাহাদিগকে কোনো নূতন ভাব দেওয়া বড় কঠিন। *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ. ২৪৫)* কিন্তু বর্তমান সমাজের যিনি শোষক তিনি হলেন নির্গন্ধ কিংশুক ফুলের মতো বহুদোষান্বিত এবং তাঁর উদ্ভব হয়ত বর্ণশাঙ্কর্যের ফলে হয়েছে। অতএব যে সমাজ অর্থ এবং দলগত স্বার্থের নিকট আত্মবিক্রয় করে তাদের দাসত্ব করে, মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে সেই সমাজের উচ্ছেদ সাধন করে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরণুশীলনের মাধ্যমে হীনস্মন্যতা বর্জন করে সকলে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করলে যথার্থ শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। গীতায় এই উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারটি বর্ণের আচরণীয় স্বভাবজাত কর্মগুলোর উল্লেখ করে বলেছেন—

'শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪২ শ্লোক)

অর্থাৎ বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, অন্তর এবং বাহ্য শৌচ, ক্ষমা সরলতা শাস্ত্রজ্ঞান, ভগবানে বিশ্বাস ইত্যাদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

'শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়র্নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)

অর্থাৎ শৌর্য, তেজ, ধৃতি, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া, দান এবং প্রভুত্বের ভাব— এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম।

'কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক)

কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যের এবং সেবা বা পরিচর্যামূলক সকল কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক বর্ণের বিহিত কর্তব্যগুলোর উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণ অন্তিমে বললেন—

'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক প্রথমাংশ)

অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণবিহিত কর্ম, নিষ্ঠা ও তৎপতার সাথে যাঁরা সম্পাদন করে তাঁরা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবস্থাপিত এই বর্ণভেদ পরবর্তী সময়ে জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে যে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার

কথা বলা হয় তা চিন্তা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল এবং ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানব সন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্য শক্তি জড়াশক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগ শোক আর মনুষ্য শরীরকে আক্রমণ করতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে—তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।' *('চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', রামকৃষ্ণ মিশন, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৮)* সুতরাং স্বামীজী কথিত সেই সময় আসবার আগে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়।

চতুরাশ্রম ব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের আর এক গৌরবময় ঐতিহ্য হল চতুরাশ্রম ব্যবস্থা। চাতুর্বর্ণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ভারতবর্ষীয় সমাজকে সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছিল। কিন্তু বর্তমানে চারবর্ণের বিলোপের অপপ্রচেষ্টার সাথে সঙ্গতি রেখে যা ইহলোক এবং পরলোকে পরমশ্রেয় লাভের অনুকূল সেই আশ্রম ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। "আমাদের জীবনের চারটি পর্যায়কেই আশ্রম বলা হইয়াছে। 'আ সমন্তাৎ শ্রমো যত্র সএব আশ্রমঃ'— সর্বপ্রকারে শ্রমদান করিতে হইবে বলিয়াই আশ্রম। জীবনটি নিরন্তর শ্রমেই কাটাইতে হইবে, তাই আমাদের জীবন হইল আশ্রম। অপরের শ্রমার্জিত অর্থের দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যপুষ্ঠ শ্রমিক নেতা না হইয়া প্রতিটি ব্যক্তিকেই শ্রমিক হইতে বলিয়াছেন ঋষি।" *('সংস্কৃতির সংকটে ভারত', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৪)* ভারতবর্ষের জ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি সকল কিছুই বেদমূলক। সংহিতাকার মনু বলেন—

'চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি।।'

('মনুসংহিতা', ১২শ অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক)

অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্য, স্বর্গাদিলোকত্রয়, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদয়, বেদ হইতেই উদ্ভূত হয়েছে। অতএব তাকে অবহেলা না করে পুনরায় সমাদরে গ্রহণ করলে ভারতবর্ষ মর্যাদার শীর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণের যথাযথ ধর্মগুলো পালনের জন্য চতুরাশ্রম ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে উভয় ব্যবস্থাই ভারতীয়

সমাজের উন্নতির প্রধান সোপান ছিল। কিন্তু কলিযুগের আরম্ভের কিছুকালের মধ্যেই এই উভয়বিধ ব্যবস্থা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। বিষ্ণু পুরাণে এর সমর্থন পাওয়া যায়—

'বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্ যজুর্বেদ বিনিস্পাদন হেতুকা।।'

('বিষ্ণুপুরাণ', ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ১০ শ্লোক)

অর্থাৎ কলিযুগে মানুষের বর্ণের এবং আশ্রমের আচার অনুযায়ী প্রবৃত্তি আর থাকে না। বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি শিথিল হয়। শঙ্করাচার্যের সময়েও বর্ণাশ্রম যথাযথ ব্যবস্থিত ছিল না তা তিনি নিজেই স্বীকার করেন— 'ইদোনীমেব চ কালান্তরেহব্যবস্থিত প্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্মান্ প্রতিজানীত।' *('ব্রহ্মসূত্র', ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৩৩ ভাষ্য)* বর্তমানে যদিও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এই প্রথা শিথিল হচ্ছে তথাপি এর দ্রুত অবক্ষয়ের জন্য এক সম্প্রদায় বিশেষ যত্নপর। চারটি আশ্রমের মধ্যে এখন কেবল গার্হস্থ্যাশ্রমই দেখা যায়। পুরাণাদিতে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে সমগ্র পৃথিবীতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং ভাগবতে এটাও বলা হয়েছে যে কলিযুগেই ধর্মের অবক্ষয় এবং বিলুপ্তি ঘটবে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই—

'কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোহধর্ম হেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মানোহন্তে সোহপি বিনঙ্ক্ষতি।।'

('ভাগবত', ১২শ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ২৪ শ্লোক)

অর্থাৎ সত্যযুগে চারপাদ ধর্ম, ত্রেতাযুগে তিন পাদ, দ্বাপরে দুই পাদ, কলিতে একপাদ এবং কলির অন্তে ধর্মের একেবারে লোপ হবে। অতএব 'ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবন্তি সর্বত্র' *('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', কালিদাস, ১ম অঙ্ক, ১৬ শ্লোক)* এই ভাবের বশবর্তী হয়ে থাকলে এই বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা ক্রমেই বিলুপ্ত হবে। কিন্তু যতদিন বর্ণাশ্রমধর্মকে সমাজে প্রচলিত রাখা যায় ততই সমাজের মঙ্গল সে পর্যন্ত কলির অন্তিম সময় সুদূর পরাহত হবে।

চারটি আশ্রমের প্রত্যেকটিতে অবস্থানকালে কোন্ কোন্ ধর্মাচারণ করা বিধেয় বা কর্তব্যানুষ্ঠান করা উচিত তা মহাভারতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় সমাজধর্ম যেমন— চাতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনই ব্যক্তিগত জীবন ধর্মের প্রতিষ্ঠা এই চতুরাশ্রমের উপর। খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে হতে পারে যে চতুরাশ্রম ব্যবস্থা পালনের উদ্দেশ্য কী অর্থাৎ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করবার প্রয়োজন কী? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবন পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য সদা উন্মুখ। বৃক্ষ

যেমন সর্বদা উর্দ্ধাকাশে তার পল্লবদল প্রসারিত করে মানুষও তেমনই চায় তার অন্তঃমুখী বৃত্তিগুলোকে উর্দ্ধমুখী করে সেই বিরাট পরম পুরুষের সাথে মিলিত হতে। সেই মিলনে কোনো বিচ্ছেদ নেই। তাই মানুষের জীবনকে সর্থক ও পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ভগবান স্বয়ংই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে— 'পূর্বমেব ভগবতা ব্রহ্মণা।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ১৯১-তম অধ্যায়, ৮ শ্লোক)* "অন্তরের দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল বর্ণের কার্য। মুক্তির পথে ওঠবার ছিল চারটি পৈঠা। এই চারটির সাধারণ নাম 'আশ্রম'। 'আশ্রম' এই কথাটির সঙ্গো জড়িত হয়ে রয়েছে এক মহান পবিত্রভাব। মহান ও পবিত্রভাব বাদ দিয়ে ধর্ম অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিলাভ হয় না।... সমাজকে পুণর্গঠিত করতে হলে আনতে হবে ঐ আশ্রমের ভাব, উদ্দীপিত করতে হবে আশ্রমবোধ।" *('আর্যপ্রভা', শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৮, পৃ. ৫১৫)* ক্রমান্বয়ে চারটি আশ্রমের বিহিত কর্তব্যাদি আলোচনার পর এটাই পরিস্ফুট হবে যে প্রত্যেকটি জীবন এই আশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে থেকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হবে।

চতুরাশ্রমের প্রথমেই হল ব্রহ্মচর্য্য। বাল্যকালে উপনয়নাদির দ্বারা সংস্কৃত হয়ে গুরুগৃহে বাস করে বিদ্যাভ্যাস করাকেই সাধারণত ব্রহ্মচর্য বলা হয়। ঋষি অরবিন্দ বলেন— 'প্রাচীন আর্যব্যবস্থার মূলে ছিল অতি অবশ্য পালনীয় ব্রহ্মচর্য সাধনা। মানস সৌধের প্রকাণ্ড চূড়া যদি রচনা করতে হয় তবে তার জন্যে প্রথমে সেই ভার বহনের উপযুক্ত একটা বেশ সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করা দরকার।' *('ভারতের চিন্তাশক্তি', ঋষি অরবিন্দ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০)* জীবনের প্রথম ভাগেই এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্তব্য। এই সময়ে ব্রহ্মচারী জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর সেবা করবেন। সর্বদা গুরুবাক্য পালন করবেন। গুরুর নিদ্রার আগে নিজে নিদ্রিত হবেন না এবং গুরুর নিদ্রাভঙ্গোর আগে ব্রহ্মচারী বিছানা ত্যাগ করবেন। গীতায় জ্ঞানলাভের পন্থার কথা বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিণস্তত্ব দর্শিণঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

এই সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূল উগ্ররস, উগ্রগন্ধ ইত্যাদির ব্যবহার বিহিত নয়। ব্রত এবং উপবাসাদির দ্বারা ব্রহ্মচারী শরীরকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন তা যথেষ্ঠ কষ্টসহ হয়। সাধারণত চতুর্বিংশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার নিয়ম। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত করার জন্য কঠোর তপস্যা ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্তব্য বলে বিহিত হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন হতে নিজেকে

মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হয়। স্ত্রীলোকের সাথে সংস্রব এমনকি বাক্যালাপ পর্যন্ত করা সমীচীন নয়। কেবলমাত্র গুরুপত্নীর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দুষ্করত্বের বিষয়ে মহাভারতে বলা হয়েছে— 'সুদুষ্করং ব্রহ্মচর্য্যমুপায়ং তত্র মে শৃণু।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২১৪-তম অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* প্রসঙ্গানুসারে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত হচ্ছে— 'ব্রহ্মচর্য পালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধনা বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময় অনাবশ্যক রূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে। সে সময় যে সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষণ করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য। .. ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তি সঞ্চার করে।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০০)*

ব্রহ্মচর্যের কালকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে বেদধ্যয়ন, গুরুসেবা, ক্রোধাদি জয় করা। দ্বিতীয় ভাগে আচার্যের প্রীতিজনক কার্য সম্পাদন করা এবং আচার্য্যের পুত্র ও পত্নীর সাধ্যমত সেবা করা। তৃতীয়ভাগে বিদ্যালাভের সময় আচার্য্য যেভাবে অনুগ্রহ এবং আনুকূল্য প্রধান করেছেন তা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা এবং শেষভাগে অত্যন্ত বিনীতভাবে উপযুক্ত দক্ষিণা গুরুকে প্রদান করা। এই ব্রহ্মচর্যের শক্তি অপার, ঋষিগণ ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমেই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। দেবগণ এই শক্তির দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। যারা এই ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছেন জগতে তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্রে ব্রহ্মচর্যের প্রশংসা করে শিব বলেছেন—

'ন তপস্তপেত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, ১ম সংস্করণ. পৃ. ১৮৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যই আসল তপ এবং যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তিনি মানুষ নয় দেবতা। মহাভারতকার বলেছেন— 'ব্রহ্মচর্যেন বৈ লোকান্ জয়ন্তি পরমর্ষয়ঃ।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৪১-তম অধ্যায়, ৬ শ্লোক)* প্রকৃত ব্রহ্মচারী তাকেই বলে যিনি কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মের আরাধনা করেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি বলেছেন—

'ব্রহ্মণ্যের চারঃ কায়বাঙমনসাং প্রবৃত্তির্যেষাম্।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ১৯২-তম অধ্যায়, ২৪ শ্লোক, নীলকণ্ঠ)* কেবলমাত্র মহাভারতেই নয় প্রায় সকল উপনিষদেই ব্রহ্মচর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন— 'সত্যেন লভ্যঃ ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্।' *('মুণ্ডকোপনিষদ', ৩য় স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ৫ শ্লোক)* কঠোপনিষদ বলেন— 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মাচর্যং চরন্তি।' *('কঠোপনিষদ', ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ১৫ শ্লোক)* যারা আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়। মহাভারত সহ সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে এরকম ব্রহ্মচারী তথা ব্রহ্মচারিনী উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে মহাভারতের একটি মুখ্য ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ সেই ভীষ্মদেব আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করে আদর্শ স্থানীয় হয়েছেন। যা হোক গুরুগৃহ থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে তাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের জন্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। এটাই সমাবর্তন নামে সুপরিচিত। মহাভারতে বলা হয়েছে 'গুরুবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্তেদ যথাবিধি।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ২৪১-তম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)* কিন্তু হায় সেই ব্রহ্মচর্য এখন কোথায়? কোন সুদুর অতীতে আমাদেরই কোন পূর্বপুরুষ তপোবনে আম্রকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় আত্মদর্শনাভিলাষে গুরুর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সন্নত নয়নে গুরুর দক্ষিণ চরণ নিজের দক্ষিণ হাতে এবং তাঁর বামচরণ নিজের বাম হাতে গ্রহণ করে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেছিলেন— 'ভগবন্! বিদ্যা দান করুন।' কিন্তু কালের গতিতে সেই তপোবন রাজ পথে পরিণত হয়েছে এবং গুরুগৃহের স্থানে উদ্ভুত হয়েছে প্রস্তরময় ছাত্রাবাস এবং বিলাস নিকেতন যেখানে সভ্যতার প্রেক্ষাপটে কদর্যতার মলিন রূপ অহরহ প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমানের সভ্য মানুষ গুরুগৃহে বাস করতে অপমান বোধ করে এবং ব্রহ্মচর্যের নিন্দা ও অবমাননা করে সুখলাভ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিবর্তিত রূপ এখন দেখা যায়। সমাজের এই প্রকার অপ্রীতিকর অবস্থার কথা স্মরণ করেই কবি বলেছেন—

> '... আজ কালকার দিনে
> সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
> সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৫৭০)

এই সংযমের অভাবেই চরম্ দুর্গতি। তাই স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানালোকে এই ভাবনার উদয় হয়েছিল যে— 'ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত্ব হয়ে যায় .... এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০)*

দ্বিতীয় আশ্রম হল গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচর্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুলক্ষণা রমণীকে বিবাহ করে ব্রহ্মচারী গৃহী হবেন। বর্ণগুলোর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে তেমনি আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই—

'যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্য মাশ্রিত্য বর্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৬৮-তম অধ্যায়, ৬ শ্লোক)

অর্থাৎ মাতৃহীন জীবজন্তু যেমন অকল্পনীয় বা মাতাকে আশ্রয় করে যেমন সকল জীবজন্তু প্রাণধারণ করে তেমনই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপরই অন্যান্য আশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। সমাজ সংসারের সৃষ্টি স্থিতির জন্য যা কিছু কর্তব্য তার সকল কিছুই এই আশ্রমে অনুষ্ঠিতব্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কেবল সেই আশ্রমের অনুকূল শিক্ষা বা জ্ঞানই লাভ হয়। বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে আশ্রমী কেবল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু গৃহস্থের কাছে অধিক লোকের সর্বাঙ্গীন সুখবিধান করাই একমাত্র লক্ষ্য। গার্হস্থ্য ধর্মের আলোচনার শেষে এই বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হবে। গৃহস্থের কর্তব্যগুলো এত মহৎ যে তা ব্রতরূপে বলা হয়েছে। গৃহস্থের কী কী অবশ্যকর্তব্য আছে মহাভারতে তা এইভাবে বলা হয়েছে—

'ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী।।'

('মহাভারত', আদিপর্ব, ৯১-তম অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

অর্থাৎ ধর্ম সংগত উপায়ে ধন লাভ করে তার দ্বারা দেবতা, অতিথি এবং পোষ্যবর্গের সেবা করা, কারও ধনে লোভ না করা, এটা গৃহস্থের অবশ্য পালনীয়। গৃহস্থ কেবল নিজের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করবেন না। গীতায় ভগবান বলেছেন—

'যজ্ঞশিষ্ঠাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জন্তে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৯৩ শ্লোক)

অর্থাৎ যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন, তারা সর্বপাপ হতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মাগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে তাহা পাপভোজন করে। যজ্ঞাবশেষ বলতে বোঝানো হয়েছে গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য যে পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ, তা সম্পাদন করে যা অবশিষ্ট

থাকবে গৃহী তাই ভোজন করবেন। এই মর্মে সংহিতাকার মনু বলেন—

'ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপরেৎ।।'

('মনুসংহিতা', ৪র্থ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

গৃহস্থ তার এই পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা বিশ্বের সকলকে আপনার বলে গ্রহণ করে। প্রসঙ্গানুসারে কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করে প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগ যুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সাথে আপনার মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠিবে।" *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৮)* অধ্যয়ন অধ্যাপনার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির মন্ত্রগুলোর দ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ। ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা সেই ঋষি ঋণ হতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক এবং বাহক ছিলেন ঋষিগণ, সুতরাং তাদের বিদ্যাবত্তার কথা প্রত্যহ শুনে অন্যকে সেইভাবে ভাবিত করলেই ঋষিগণের ঋণ পরিশোধ হয়। এটা অবশ্য স্মর্তব্য যে প্রত্যেক মানুষ তাঁর জন্মের সাথে সাথে এই পঞ্চযজ্ঞরূপ পঞ্চঋণে আবদ্ধ হয়। গার্হস্থ্যাশ্রম এই ঋণ পরিশোধ করবার পক্ষে আদর্শ স্থান বলে বিবেচিত হয়। তাই এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রত্যেক গৃহীর একান্ত কর্তব্য।

যে বংশে যার জন্ম সেই বংশের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর কিছু কর্তব্য থাকে। কারণ তাদেরই সাধনার ফল সেই বংশের উত্তরপুরুষেরা ভোগ করছে বিবেচনা করে পিতৃতর্পণ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের ঋণ পরিশোধ করা যায়। বর্ণাশ্রমী সমাজের বিশ্বাস যে এভাবে পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ফলে তাঁরা তৃপ্ত হন। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাই শত্রুর পর্যন্ত কল্যাণ কামনায় তর্পণকালে এই মন্ত্র পাঠ করেন—

'আ-ব্রহ্মভুবনল্লোকাঃ! দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতা মহাদয়ঃ।।
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।।
যে বান্ধবাঃ অবান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণ।।'

('রামতর্পণ', বিশুদ্ধ নিত্য কর্ম পদ্ধতি, ১৯৮০, পৃ. ৮৯)

এইভাবে যারা শুধুমাত্র এই জন্মের নয় পূর্বজন্মের পর্যন্ত শত্রু তাদেরও কল্যাণ কামনা একমাত্র ভারতভূমিতে গার্হস্থ্যধর্মপালনকারী যথার্থ হিন্দুর কণ্ঠেই ধ্বণিত হয়েছে। এই পিতৃতর্পণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহী ব্রহ্ম থেকে তৃণ খণ্ড পর্যন্ত সকলের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

দেবযজ্ঞ পালন গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। জগতের যা কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সব কিছুই ঈশ্বরের অংশ সম্ভূত। গীতায় বলা হয়েছে—

'যদ যদ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সম্ভবম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

জগতের কল্যাণ সাধনে ঈশ্বরের অংশসম্ভূত শক্তিসমূহ নিয়োজিত আছে। সেই শক্তিরূপী দেবগণকে হোম প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা প্রীত করা গৃহস্থের কর্তব্য। এর ফলে দেবগণ সন্তুষ্ট চিত্তে জগৎ কল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং সংসারের শত কর্ম কোলাহলের মধ্যে থেকেও গৃহস্থকে দেবযজ্ঞ সাধন করতে হয়।

গৃহস্থের অপর এক অবশ্য কর্তব্য ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করা। গৃহস্থকে কেবলমাত্র মনুষ্যলোকের উপকার সাধন করলেই চলবে না। কীটপতঙ্গ জীবজন্তু পর্যন্ত তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। গৃহস্থ আপনার আহার্য্য হতে অপরকে তৃপ্ত করে অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করবেন, এটাই বিহিত। এর দ্বারা ভূতবর্গ উপকৃত হবে। অন্যান্য দেশে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য-খাদক সম্পর্ক কিন্তু ভারতে সে সম্পর্ক প্রেমের মধুরতার। ভারতবর্ষের সাধকই বলেছেন—

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

('চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', রামকৃষ্ণ মিশন, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫)

এই বলার সাথে কর্মের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে অসংখ্য ধর্মনিষ্ঠ ভারতীয় আমিষ আহার পরিত্যাগ করেছেন। একান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তপোবন' নামের প্রবন্ধে বলেছেন— 'বহু কোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য- মাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে—পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনায় পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ আহার না করে। ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।' *('শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৩, পৃ. ২৭৪)* সকল জীবের মঙ্গল বিধান করাই আদর্শ গৃহস্থের একমাত্র

কর্তব্য। গৃহের স্বল্প পরিধির মধ্যে গৃহস্থ যে পশুপালনের ব্যবস্থা করেছে তা কেবল স্বীয় উপকারের জন্যই নয়, এর মাধ্যমে ভূতযজ্ঞও সম্পন্ন হয়। মনু বলেন—

'শাক্তিতোহপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।
সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্তব্যোহনুপরোধতঃ।।'

('মনুসংহিতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)

অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্মচারী বিভিন্ন কারণবশত পাক করতে অসমর্থ তাদের আহার্য প্রদান করে অবশিষ্ট খাদ্যদি প্রাণিগণকে ভাগ করে দেবেন।

নৃযজ্ঞ পালন গৃহস্থের অপর এক কর্তব্য। নৃযজ্ঞ হল অতিথি সেবা। ভারতবর্ষীয় ধর্মগ্রন্থগুলো এই ধর্মটি গৃহীর অবশ্য পালনীয় রূপে ঘোষণা করেছে। এমন সময় ছিল যখন অতিথিকে অন্নদান না করে গৃহস্থ আহার গ্রহণ করত না। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে—

'ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্নভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্।।'

('মনুসংহিতা', ৩য় অধ্যায়, ১০৬ শ্লোক)

'অনিত্য স্থিতি' এই বুৎপত্তি হতে অতিথি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'অনিত্যং হি স্থিতি যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে' *('মহাভারত', ৯৭-তম অধ্যায়, ১৯ শ্লোক, ভাবানুবাদ)* এটা মহাভারতকারের অভিমত। গৃহাগত অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করে তার পরিচর্যা করা কর্তব্য। অতিথি সৎকার যেহেতু নিত্য বিধান করা কর্তব্য সেই কারণে সকল প্রকার আড়ম্বরবিহীনভাবে তা সম্পাদন করতে হয়। অর্থাৎ গৃহী যা আহার্য্য হিসাবে গ্রহণ করবেন তাই অতিথিকে নিবেদন করবেন। পৃথিবীর অপরাপর দেশে অতিথিকে অর্থের বিনিময়ে আহার্য্য প্রদান করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও এমন গৃহস্থ আছেন যাঁরা 'অতিথিঃ নারায়ণঃ সাক্ষাৎ' এই বোধে অতিথিকে গৃহে সমাদর করেন। এইভাবে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গৃহস্থ সকল ঐশ্বর্য লাভে সমর্থ হন। গৃহস্থের অপর কতকগুলো সাধারণ কর্তব্য আছে যা সবসময় পালন করা মঙ্গলজনক। তাকে ধৈর্যশীল হতে হয়, দান ধ্যানাদি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, তপঃশীলতা অহিংসা প্রভৃতি গৃহস্থের গুণ। মহাভারতে উমামহেশ্বর সংবাদে গার্হস্থ্য ধর্ম নিরূপণ করে বলা হয়েছে—

'অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতানুকম্পনম্।
শমো দানং যথাশক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম উত্তমঃ।।'

('মহাভারত', ১৪১-তম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

সকল প্রকার হিংসা বর্জন, সদা সত্য ভাষণ, সর্বভূতের প্রতি দয়াভাব প্রদর্শন, আপন সাধ্যমত দান করা প্রভৃতি উত্তম গার্হস্থ্য ধর্ম। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকলেই গৃহস্থ হতে পারে না। নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে কালাতিবাহন করতে হয়। সংসার প্রতিপালনের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অপরাপর তিন আশ্রমের একমাত্র আশ্রয়স্থল হল গার্হস্থ্যাশ্রম। সমস্ত নদনদীর যেমন শেষ আশ্রয় হল সাগর তেমনই অপরাপর আশ্রমিগণের একমাত্র আশ্রয় হল গৃহস্থ। মহাভারতের শান্তিপর্বে তাই বলা হয়েছে—

'যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
একমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৯৫-তম অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক)

উপরন্তু যে সমাজ, রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করে এবং যার গৌরবে রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি পায় সেই সমাজ মূলত গার্হস্থ্যাশ্রম নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে সৎ গৃহস্থ যিনি উপরে লিখিত ধর্মগুলো পালন করে চলেন তাঁর প্রয়োজনই সমাজের পক্ষে সর্বাধিক। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা কর্তব্য। গৃহস্থের পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রমের পর দেহে শৈথিল্য বা অবসাদ দেখা দেয়। সেই সময় পুত্র-পৌত্রদের কাছে সংসারের দায় দায়িত্ব সমর্পণ করে তিনি বাণপ্রস্থ ধর্মাবলম্বন করবেন। এই ধর্ম সস্ত্রীক পালন করা সম্ভব যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে বন গমনে ইচ্ছুক হন। অন্যথায় তাকে পুত্রদের কাছে রেখে গৃহস্বামী একাকী বন গমন করতেপারেন। বন গমনের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহস্থকে সংসারের নানা রকম দায় দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে সকল সময় ঈশ্বর চিন্তায় তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন না। কিন্তু নির্জনে ঈশ্বরারাধনা করবার উপযুক্ত স্থান হল বন। এই বনে বসে এই ধর্মাচারণ করতে হয় বলে একে বানপ্রস্থ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটি কথা অবশ্য স্মর্তব্য যে বনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করতে হবে বলে যেন এইরূপ ধারণা না হয় যে গৃহস্থের পক্ষে ঈশ্বর চিন্তা করা সঙ্গত নয়। বস্তুত গৃহস্থ তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন। তবে বানপ্রস্থে সেই পথ সুগম। সংসারের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে যা সকল সময় সম্ভব হয় না তা এই বনপ্রস্থে সম্পন্ন হয়।

বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর বনে বসে উপনিষদ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। বস্তুতপক্ষে আরণ্যক নামটিরও এখানেই সার্থকতা— 'অরণ্য এব পাঠত্বাদারণ্যকমিতীর্যতে।' *('বৃহদারণ্যক উপনিষদ', শঙ্করভাষ্য, ভূমিকা)* মহাভারতে

বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'তত্রারণ্যক শাস্ত্রানি সমধীত্য স ধর্মবিৎ।

উর্দ্ধরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষর সাত্মতাম্।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ৬১-তম অধ্যায়, ৫ শ্লোক)

যাঁরা এই ধর্ম পালন করবেন তাঁরা পুণ্য তীর্থক্ষেত্রগুলো এবং পুণ্যতোয়া নদ-নদীর কাছে কোন বনপ্রদেশে বসবাস করবেন। সাধারণ মানুষের মতন আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ তাকে বর্জন করতে হবে। গৃহস্থোচিত খাদ্য গ্রহণ না করে তিনি বন্য ফলমূলের দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করে পর্ণকুটীর নির্মাণপূর্বক তাতে রাত্রিযাপন করবেন। যিনি এইভাবে তৃতীয় আশ্রমের উক্ত ধর্মগুলি পালন করেন তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন। এইরূপ সকল পাপমুক্ত, দাতা, পরোপকারী এবং সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানকারী অরণ্যবাসী ঋষি পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তাকে সকল সময় স্মরণ রাখতে হবে যে একমাত্র ধর্মানুষ্ঠানের জন্যই তার এই শরীর ধারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের বানপ্রস্থ গ্রহণের বিষয় মহাভারতের আশ্রমিক পর্বে বর্ণিত হয়েছে। রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর তীরস্থ বনদেশে কুশ শয্যায় শয়ন করতেন। বানপ্রস্থের কর্তব্যা কর্তব্য নিরূপণ করে মনু বলেছেন—

'স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।

দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ।।'

('মনুসংহিতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)

অর্থাৎ বানপ্রস্থ পালনকারী নিত্যই বেদধ্যয়নে নিযুক্ত থাকবে, শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব-সহনশীল হবে, পরোপকারী, সংযতমনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত এবং সর্বভূতে দয়াশীল হবে। বানপ্রস্থের বিধান যে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। শেষ জীবনে বনে বাস করা রাজর্ষিদের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হত। এই মর্মে মহাভারতকার বলেন—

'রাজর্ষীণাং হি সর্বেষামন্তে বনমুপাশ্রয়ঃ।'

('মহাভারত', আশ্রমিক পর্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ শ্লোক)

জীবনের অন্তিমপর্বে বানপ্রস্থ জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেহয়। এটাই চতুর্থাশ্রম। শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করে কর্মত্যাগ করাই সন্ন্যাস। গীতায় বলা হয়েছে — 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ২ শ্লোক)* অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি যে সকল কাম্য কর্ম তার পরিত্যাগকেই

সন্ন্যাস বলা হয়। সকল প্রকার কর্ম বর্জন করলেই নৈষ্কর্মসিদ্ধি হয় না। সন্ন্যাসাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কারও সাথে সংযোগ রক্ষা করা বিধেয় নয়। এই সময়ে কেশ এবং শ্মশ্রু সম্পূর্ণরূপে ছেদন করতে হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—

'জরয়া চ পরিদ্যূনো ব্যাধিনা চ প্রপীড়িতঃ।
চতুর্থে চায়ুষঃ শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ।।'

('মহাভারত', শান্তি পর্ব, ২৪-৩ম অধ্যায়, ২২ শ্লোক)

গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে থেকে আশ্রমী সন্ন্যাসের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করে নেবার সুযোগ লাভ করেন। গৈরিক বসন পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে গৃহস্থের কাছ থেকে যা পাবেন তার দ্বারাই সন্ন্যাসী জীবিকা নির্বাহ করবেন। সর্বভূতে তিনি সমদর্শী হবেন। কাকেও দ্বেষ করবেন না। এরকম ব্যক্তিকেই গীতায় নিত্য সন্ন্যাসী বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই—

'জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৫ম অধ্যায়, ৩ শ্লোক)

গীতায় অর্জুনের মনে একবার সংশয় দেখা দেয় যে— কর্ম সন্ন্যাস বা নিষ্কাম কর্মযোগ কোনটি অবলম্বন করা শ্রেয়? ভগবান এর সমাধান করে বলেন— 'একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৫ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক)* অর্থাৎ একটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে উভয়ের ফল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন— 'মনুষ্যের এমন একদিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দু শাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করবার বিধি আছে। তাকে সচারচর সন্ন্যাস বলে।' *('ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৭৮)* সন্ন্যাসী কেবলমাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় নেন। মৃণ্ময় ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষের মূল, জীর্ণ কৌপিনাদি বসন, অসহায়ভাবে একাকী অবস্থানই সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে কথিত হয়েছে। কুকথা বা অপমানজনক বাক্য কেউ বললে তা সহ্য করবেন কাউকে অপমান দ্বারা পরিতাপ দেবেন না। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করে কারও সাথে শত্রুতা করবেন না। সন্ন্যাসীকে এই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে মনু বলেন—

'অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ।।'

('মনুসংহিতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস আশ্রমের বিহিত কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—

'নিরাশী সাৎ সর্বসমো নির্ভোগো নির্বিকারবান্।
বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষর সাত্মতাম্।।'

('মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৬১ অধ্যায়, ৯ শ্লোক)

প্রাচীন ভারতে আশ্রম ধর্ম ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এইভাবে পালিত হত। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের জন্য ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু মহাভারতোক্ত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির অধিকারী কেউই পরম্পরাক্রমে চারটি আশ্রমবর্ণের অনুবর্তন করেননি। কিন্তু তা বলে এটা অনুমিত হয় না যে সেই সময়ে আশ্রম ব্যবস্থার কেউ অনুবর্তন করত না। বস্তুত সমগ্র জীবনকে এইভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হত। এতে প্রত্যেক আশ্রমে আশ্রমী যদি নিয়মানুগভাবে সেই সেই আশ্রম বিহিত ধর্মগুলো পালন করে তা হলে জীবনের শেষভাগে তাকে ঈশ্বরলাভের জন্য অধিক প্রয়াস করতে হয় না। সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্যাশ্রম পালন করলেই চরম ফল লাভ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ হয়। এটা আগেই বলা হয়েছে। মহাভারতের ঘটনাবলীর পারম্পর্যে এটাই অনুমিত হয় যে সেই সময়েও গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। মহাভারতের শান্তিপর্বে সকল আশ্রমের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—

'ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণঃ সর্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।।' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব)*

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী যদি নিষ্ঠার সাথে আপন আপন কর্তব্য পালন করেন, তাহলে তার পরম গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। যা হোক, এমন সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা যথাযথ রূপে পালিত হত।

কিন্তু ভারতবর্ষের তথা হিন্দুধর্মের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্তিমিত প্রদীপের মতো অস্তগমনোন্মুখ হয়েছে। মহাভারত যে মানুষের সম্বন্ধে গেয়েছিল—'ন মানুষাশ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' *('মহাভারত', শান্তিপর্ব)* সেই মানুষ তাঁর ষড়রিপুর তাড়নায় আপনার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ঘনান্ধকারে ক্রমশ প্রবিষ্ট হচ্ছে। বর্তমান ভারতে নব নব অস্ত্রের ঝঙ্কারে—

'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে।'

('নৈবদ্য', ৬৪ নং কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন)

দেশের সর্বত্র দুর্যোধনের মতো অনার্য দস্যু কর্তৃক দ্রৌপদী স্বরূপা ভারত ললনা অপমানিতা এবং লাঞ্ছিতা হচ্ছেন। সংহিতাকার মনু নারীর মর্যাদা প্রদান করে বলেন—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।'

('মনুসংহিতা', ৩য় অধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)

অর্থাৎ যে গৃহস্থের বাড়িতে নারীগণ পূজিতা হন, তথায় দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করেন। আর যেখানে তারা পূজিত হন না সেখানে সকল ধর্ম-কর্ম ব্যর্থ হয়। বৈদিক বা বৈদিকোত্তর যুগে যে নারী সমাজ এইরূপ মর্যাদা লাভ করত এবং পুরুষের একমাত্র প্রেরণাদাত্রী শক্তিরূপে বিরাজ করত সেই নারী বর্তমানে হয়েছে মদোন্মত্ত চরিত্রহীন পুরুষের পাশববৃত্তির শিকার। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'নারী ও সামাজিক অধিকার' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তা এখানে উদ্ধৃত হল— 'যে জাতি ও যে দেশ নারীকে সম্মান করেন না সেই জাতি ও সেই দেশ কখনো বড় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। তোমাদের জাতি এতটা অবনত তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা মহাশক্তির জীবন্ত প্রতীক নারীগণকে সম্মান প্রদর্শন কর না। যদি দেবমাতৃকার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি স্বরূপ নারীগণকে উন্নত না করিতে পারো তবে ইহা জানিও যে তোমাদের উন্নত হইবার অন্য উপায় নাই!' *('গান্ধী রচনা সম্ভার', শতবার্ষিক সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩২)* চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর যে আর্য সমাজ সুদীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার বিলোপ সাধনই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধুনা একটি প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়। চাতুর্বর্ণ্যের অপলাপ করে মানুষের সাথে মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় কোনো কোনো বিশেষ গোষ্ঠী আজ বদ্ধ পরিকর। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বর্তমানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাম্য শব্দটিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এটা স্মর্তব্য যে— 'জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুটি পাতাও পরস্পর সমান হয় না। একটি বালুকারেণুও অপর কোনো বালুকারেণুর সমান নয়। একটি বৃষ্টি বিন্দুও অপর কোনো বৃষ্টির বিন্দুর সমান নহে। জগতে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সাম্য নেই।' *('সামাজিক প্রবন্ধ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবী চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ৮৫)* এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন— 'আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, আবার কেহ কেহ এইরূপ হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কখনো এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না।' *('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ.*

৩৪৮) তথাপি এই কৃত্রিম সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণগণ এবং পুরোহিতবর্গকে তাঁদের কৃত পূজা-জপ-তপাদি মঙ্গলজনক কর্মের জন্য জনসমাজে অবমাননা করা হচ্ছে। এই আদর্শ সম্ভবত গৃহীত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম থেকে কারণ তাতে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। এই বিদ্বেষ ভাব সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে যাতে সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করে সেই চেষ্টার কোনোরকম ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন— 'যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।' *('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯০)* এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সুফল এত সুদূর প্রসারী ছিল যার দ্বারা ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত জ্ঞান সাধনায় ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু ঈশ্বরোদ্দিষ্ট এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধনকল্পে ব্রাহ্মণকে একমাত্র দায়ী করে তাঁদের প্রতি যে বিষোদ্গার করা হচ্ছে তা যথার্থই নিন্দনীয়। এই নিন্দাভাজন ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'দেখ বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কী? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।' *('ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৫৬-৫৭)* বর্তমানে অজ্ঞান তিমিরে আবৃত মানুষ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করায় অপরের দুঃখ সুখকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাই 'গীতাপ্রবচনে'র প্রবক্তা আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন— 'ব্যক্তি ও সমাজে ভেদ করিও না। একই ক্রিয়া স্বার্থ ও পরার্থকে কিরূপে স্ববিরোধী বানাইয়া দেয় ইহাই গীতার শীক্ষা। আমার ঘরের হাওয়ায় আর বাহিরের অনন্ত হাওয়ায় বিরোধ নাই। বিরোধ কল্পনা করিয়া আমি যদি ঘর বন্ধ করিয়া দিই তবে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব। অবিরোধ কল্পনা করিয়া ঘর খুলিয়া দিয়াছি কি অনন্ত হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিবে। ... যে পথে ব্যক্তি ও সমাজ উত্তম সহযোগ হইবে এমন সোজা সুন্দর পথ গীতা দেখাইয়াছে। সমাজে এই সহযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই গীতা চিত্তশুদ্ধি

পূর্বক—যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়ার কথা বলিতেছে। এরূপ কর্মের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।' *('গীতা প্রবচন', আচার্য বিনোভা ভাবে, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ২৫০-২৫১)*

চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ সংগঠনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান গীতার আলোকে করা সম্ভব। এই কথা স্মরণ করে Mr. R.B. Lal বলেন—'When we study the Gita we are stunt by the fact that in its teachings and its general approach to the problems of life, it anticipated by long the methods and thoughts of modern Science.' *('The Gita in the Light of Modern Science' by R.B. Lal, 1970, P. 4)* শুধু তাই নয় সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রেও গীতা এক মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিভাবে এটা সম্ভব সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায় 'কর্মযোগ' নামে প্রসক্ত। এর আগে আছে 'বিষাদযোগ' এবং 'সাংখ্য বা সন্ন্যাসযোগ'। যে কোন বিষাদগ্রস্ত লোক যদি অর্জুনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে নেন তাহলে পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়গুলোর মর্মানুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে গীতা একখানি ধর্মগ্রন্থ হলেও এটা কোনো ধর্মশালায় বা কোনো স্ফটিক গঠিত মন্দিরের মধ্যে উপদিষ্ট হয়নি। একদিকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে অধর্মের বিনাশের জন্য কর্তব্যের আহ্বান অপরদিকে আত্মীয় ও জ্ঞাতিবধ এই দুই তীক্ষ্মাগ্র শাণিত তরবারির মধ্যে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য অবধারণ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এই সমস্যা বাস্তব সমস্যা, এবং তারই নাগপাশে বদ্ধ হয়েছেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন। উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেননি। অর্জুনের মোহ বিনাশের জন্য তাঁকে সন্ন্যাসযোগের মাধ্যমে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং দেহের অনিত্যতা পূর্বক মোহ নাশ করালেন এবং শেষে বললেন— 'যথেচ্ছসি তথা কুরু।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৬৩ শ্লোক)* গীতার মহত্ত্ব এবং ঔদার্য এই একটি কথাতেই প্রকটিত হয়েছে। অর্থাৎ গীতা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কখনও খর্ব করেনি। সমস্ত উপদেশ সমাপনের পর ভগবান বলেছেন 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি কর।' এখানে কোনোরকম বাধ্যবাধকতার দ্বারা অর্জুনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়নি। সুতরাং সাধারণত কোনো সমস্যায় কেউ যদি গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহলে উপদেশ গ্রহণের পর শাস্ত্রানুসারে সকল কার্যই তিনি করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

গীতা সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্তমানে মানুষের শান্তি ও সুখের খুবই অভাব। যেহেতু এই দু'টি বিষয় অর্থের আয়ত্তাধীন নয়। অর্থোপার্জন সদুপায়েই হোক বা অসদুপায়েই হোক অল্প বিস্তর সকলেই করে থাকে। কিন্তু অর্থের সাথে সুখের আপাত বিরোধ আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অর্থকেই সুখলাভের একমাত্র উপায় মনে করে এবং অর্থের বৃদ্ধিতেই সুখ বৃদ্ধি জ্ঞান করে মৃগতৃষ্ণিকার মতো অর্থের পিছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু গীতা শিক্ষা দিয়েছে এইভাবে—

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৬৬ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজের বশে রাখতে পারেননি তাঁর কোনো বিবেক বুদ্ধি নেই। অবিবেকী ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বা পরমেশ্বরের কোনো চিন্তাই করতে প্যারেন না। যিনি ঈশ্বরের অনুধ্যান না করেন সেই ব্যক্তির শান্তিও নেই, আর যাঁর শান্তি নেই তাঁর সুখ কোথায়। সংসারে মানুষ কেবলই সুখের অনুসন্ধান করে, দুঃখকে অতিক্রম করে কিভাবে অতিরিক্ত সুখলাভ হয় তার জন্য প্রাণপন চেষ্টার অন্ত নেই। দুঃখ নিবৃত্তির কত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে কিন্তু দুঃখ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। তাই গীতা বলছে— বাইরের বিষয় থেকে যতই দুঃখ নিবৃত্তির এবং সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হোক না কেন তাতে কোনো ফল নেই, কারণ সুখ দুঃখের অবস্থান মানব মনের গভীরে। কাজেই চিত্তকে সংযত করতে না পারলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যাবে না। কোনো মানুষেরই সমস্ত কামনা কখনও পূর্ণ হয় না এবং কামনার অপূরণেই মানবচিত্ত উদ্বেলিত হতে থাকে। অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতিতে তৃপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তেমনই এই কামনা বিষয়ের সাথে যত সাযুজ্য লাভ করে ততই তার আকাঙ্ক্ষা স্ফীত হয়। তাই অশান্তচিত্ত অর্জুনের মত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গীতা দেখিয়েছে এই পথ—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৭১ শ্লোক)

অর্থাৎ কাম্য পদার্থকে লাভ করবার যে তীব্র স্পৃহা তাকে বর্জন করতে হবে। হৃদয়ে শান্তি লাভ করতে হলে সমস্তরকম কামনা বাসনাকে হৃদয় থেকে বিসর্জন

দিতে হবে। তারপরে হতে হবে আসক্তিহীন। হতে হবে 'যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট'। যা পাওয়া যাবে তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে পাওয়া এবং না পাওয়াকে সমান জ্ঞান করে কাজ করতে হবে। মায়া এবং মমতা মানুষের কাছে বহুরূপে আবির্ভূত হয়। মানুষের মায়া সর্বাধিক বেশি তাঁর এই নশ্বর দেহের উপর। প্রাণ ত্যাগ করতে কেউই চায় না। মানুষের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

('সঞ্চয়িতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬৬, পৃ. ৪২)

অনিত্য দেহের সুখ দুঃখে মানুষ বিচলিত হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ইত্যাদি মমত্ববোধ মানুষকে মোহচ্ছন্ন করে রাখে। তদুপরি আছে অহংভাব, যা মানুষকে পতনের মুখে নিক্ষেপ করে। আমি বড়, আমি জ্ঞানী আমি সুখী এরকম ভাব মানুষের অধঃপতনের মূল। সুতরাং গীতায় বলা হয়েছে— কামনা, মায়া এবং অহংভাব বিবর্জিত ব্যক্তি সুখ এবং শান্তির অধিকারী হন। পাশ্চাত্য চায় বাহ্য শাসনের বলে সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস করতে। কিন্তু ভারতবর্ষ বলে অন্তঃশাসনের দ্বারা সুখ এবং দুঃখের অতীত হতে। এখানেই ভারতবর্ষের তথা গীতার শ্রেষ্ঠতা।

সমাজবদ্ধ জীব এই মানুষ। সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ভারতবর্ষের মানুষ একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। কেউ ভাই, কেউ মা, কেউ পিতৃব্য ইত্যাদি। এছাড়া সকলেরই মাতা -পিতা-ভগিনী-ভ্রাতা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিজন আছেন। যাঁদের নিয়ে মানুষ সুখের নীড় তৈরি করে। কিন্তু জ্বরা-ব্যাধি-বার্ধক্য কাউকেও নিস্তার দেয় না। কেউ সময়ে কেউবা অসময়ে দেহ ত্যাগ করেন। সেই সময়ে যে শোক সঞ্জাত হয় তা নিবারণ করা সত্যই কষ্টকর। তাই শোকগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে গীতার এই সান্ত্বনা—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যাঁর মৃত্যু হয়েছে তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত। এইভাব যদি সর্বদা কেউ অন্তরে ধারণ করেন তাহলে মৃত্যুশোকে তিনি কখনও বিচলিত হবে না। গীতোক্ত এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। শিষ্য ক্রিটো যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন— 'হে সক্রেটিস, কিভাবে তোমাকে কবরস্থ করব।' সক্রেটিস উত্তর দেন— 'যেভাবে খুশী, কিন্তু তার আগে আসল আমিকে

ধরতে হবে। বৎস ক্রিটো, আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি আমার দেহটাকে সমাহিত করছ, আমাকে নয় এবং সেটাকে নিয়ে যা প্রচলিত প্রথা এবং যা তুমি উত্তম বুঝবে তাই করবে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৫)*

মৃত্যু শোক ভুলে থাকার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব প্রকরণ এক অসাধারণ আশীর্ব্বাদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশ পর্যন্ত প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামী এই তত্ত্বের জোরেই 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন' করেছিলেন। বর্তমান ভারতে এবং বিশ্বে প্রত্যহ রক্ত এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে। যে কোনো ব্যক্তি তাঁর প্রতিবেশীকে অপদস্থ করতে পারলে আত্মতুষ্ঠ হন। রাজনীতির নামে হিংসার তাণ্ডবে একদল উচ্ছৃঙ্খল মানুষ অপর একদলকে নির্মমভাবে হত্যা করতে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ করেন না। ধর্মের নামে ভণ্ডের দল হিংস্র পশুর মত রক্তপান করে। সমগ্র বিশ্ব যাঁর নামে শ্রদ্ধায় শির অবনত করে সেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত বুলেটের আঘাতে এই সমাজের বুকে শেষ রক্তবিন্দু পাত করতে হয়েছে। একের পর এক রাষ্ট্রনায়ক তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে হত হয়েছেন ভারতবর্ষে এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও। ভাই ভাইয়ের বক্ষে শাণিত ছুরি বিদ্ধ করতে আর নির্জন বনের প্রয়োজন অনুভব করে না। প্রত্যেক দিনের সংবাদপত্রগুলোতে একাধিক নববিবাহিতা রমণীর মৃত্যু সংবাদ মুদ্রিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য যে তার পশ্চাৎপটে স্বামী নামক অর্থলোলুপ এক ব্যক্তির নির্মমতা সর্বত্রই থাকছে। অর্থগৃধ্নু অপর একশ্রেণীর কিশোর সরকারি অধিকোষ হতে জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ লুঠ করছে। এই পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। তারপর আছে রাজনীতিতে বিভ্রান্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি। তার ফলশ্রুতি হিসাবে এক ধর্ম সম্প্রদায় অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে এবং মাঝে মাঝে তাদের অসন্তোষ মহামারীর আকার ধারণ করে বহুলোকের প্রাণ সংহার করে। সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি বর্তমান সমাজে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সকল ধর্মের প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা সহকারে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায় বিশ্বপ্রেম এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ তাদের নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। অবশ্য এর জন্য তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকেই দায়ি করা যায়। কারণ বাইবেলের বিভিন্ন প্রবক্তা বলেছেন— '... The holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in christ Jesus.' (II Trmothy. 3.15.) অপর এক প্রবক্তা বলেন— '... No man cometh unto the father, but by me.' (John.14.6.) অপর এক বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ কোরানে বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি পয়গম্বর রসুলকে না মানে, সে 'কাফের'। কাফেরের গতি

নরকে এবং তারা নিষ্ঠুরভাবে বধযোগ্য।' *('সংস্কৃতির সংকটে ভারত', ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৫)* এরকম ধর্মোপদেশ যা ভিন্নধর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে উপদেশ দিয়েছে তার যথাযথ আচরণকারীই তো ধার্মিকাগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীকে ধর্মপালনের নামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। এবং যথার্থ খ্রীষ্টান সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মোন্নতির পথ প্রস্তুত করছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের যিনি অবতার তিনি বলেন— 'পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১১শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)* এবং 'পিতাহমস্য জগত।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)* তাঁরই কণ্ঠে শোনা যায় সেই অমৃতবাণী— 'সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)* অর্থাৎ সমগ্র ভূতবর্গের প্রতি আমার সমদৃষ্টি, কেউ আমার শত্রু বা মিত্র নয়। অতএব সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ উন্মেষের জন্য গীতার পুনঃপুনঃ অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। এতে সমাজ তথা রাষ্ট্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভগবান তথাগত বুদ্ধের সাধনকালে মার যেমন তাঁকে আক্রমণ করে সবসময় দুর্বল করার চেষ্টা করতো। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের ষড়রিপুগুলো সমসময় তাকে আক্রমণ করে তার দেবত্বে উত্তরণের বাঁধা সৃষ্টি করে। আমরা যদি একটু অসতর্ক হই একটু দুর্বল হই তাহলেই তারা সেই সুযোগটা গ্রহণ করে। এর জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমি কর্তা নই, অকর্তা, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন মাত্র। গীতা এই নিরাসক্ত নিস্পৃহ এবং নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এক বিরাট সামাজিক সমস্যার হাত থেকে আমাদের নিস্কৃতি লাভের পথ দেখিয়েছে। সমাজে এই প্রকার যে জটিলতা,যে সমস্যা তা হয়ত মহাভারতের যুগে ছিল না তথাপি সংশয়াবিষ্ঠ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ কার প্ররোচনায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩২ শ্লোক)

অর্থাৎ রজোগুণ হতে উৎপন্ন অতিশয় উগ্র কাম এবং ক্রোধ মানুষকে পাপাচরণে লিপ্ত করে। এই সংসারে একে পরম শত্রু বলে জানবে। প্রকৃত পক্ষে এইরকম বাস্তবমুখী উপদেশ কেবলমাত্র গীতাতেই দেখা যায়। উপর্যুক্ত সামাজিক যে কুকর্মগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির পশ্চাতেই রয়েছে এই কাম। রাজনীতির নামে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তার পশ্চাতে আছে ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভ বা কামনা।

সম্পত্তির লোভে এক ভাই অপর ভাইকে ছুরি বিদ্ধ করে। বিবাহে যৌতুক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলে নববধূকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অপরের সঞ্চিত অর্থ নিজেরা আত্মসাৎ করবার জন্য কোষাগারে ডাকাতি করা হয়। এভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে দেখা যায় যে কামনাই মানুষকে সর্বত্র কুকর্মের প্রেরণা দিচ্ছে। কামনা পূর্ণ না হলে বা কামনা প্রতিহিত হলেই জাগে ক্রোধ— 'কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৬২ শ্লোক)* এই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সকল প্রকার হিংসা কার্যের আচরণ অবলীলাক্রমে মানুষ করতে পারে। কিন্তু তা বলে কি এই সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের কোনো উপায় নেই? তা নয়, গীতার উপদেষ্টা দেখিয়েছেন সেই সোজা পথ—

'তস্মাত্ত্ব মিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্যৎ ভরতর্ষভ।
পাপ্মাণং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশণম্।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যেহেতু কাম দেহীকে মোহিত করে সেই কারণে তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে সকল পাপের মূল এবং মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর। যেহেতু কাম থেকে ক্রোধ উদ্ভুত হয় সেই কামকে বিনষ্ট করলে ক্রোধ মানুষের মনকে কলুষিত করতে পারবে না। তাই সমাজের সকল স্তরের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি গীতার এই উপদেশ— 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক)* অর্থাৎ দুর্জয় কামরূপ শত্রুকে জয় কর। কিন্তু সংশয় দেখা দিতে পারে যে কামকে যদি জয় করা হয় অর্থাৎ সকল মানুষ যদি জিতেন্দ্রিয় হয়ে যায় তাহলে সৃষ্টির ধারাই তো বিঘ্নিত হবে। অর্থাৎ নূতন কোনো প্রাণের আবির্ভাব হবে না। কিন্তু গীতা প্রবক্তা সেই দিকেও আলোকপাত করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* অর্থাৎ হে ভরতশ্রেষ্ঠ আমি ধর্মের অবিরোধী কাম। যে কামনা ধর্মের জন্য অর্থাৎ কেবলমাত্র পুত্র লাভের জন্য করা হয় তাই আমি। এইভাবে পরোক্ষ উপদেশের মাধ্যমে তিনি এটাই জানালেন যে কামনা তা ধর্ম হিসাবে পালন কর। সুখ লাভের জন্য অর্থের দাসত্ব করবার প্রয়োজন নেই, দুঃখের হ্রাস করতে চেষ্টা করাই বৃথা। গীতার মতে একমাত্র তিনিই সুখ লাভ করতে পারেন—

'শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৫ম অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)

এই জরা-মরণশীল সংসারে মৃত্যুর আগে যিনি কাম এবং ক্রোধের বেগ ধারণ করতে পারেন অর্থাৎ তাদের দ্বারা যাঁর চিত্র বিচলিত হয় না তিনিই প্রকৃত যোগী এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখলাভের যোগ্য। সুতরাং উপর্যুক্ত যেকোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানে গীতার এই উপদেশই চূড়ান্ত। আমাদের সকল প্রকার সমাজিক সমস্যার পিছনে আছে লোভ। আমাদের বিশ্বাস যে সৎকর্ম সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষের উর্দ্ধায়ন ঘটে। মানুষ দেব মানবে রূপান্তরিত হয়। ঠিক সেইভাবেই কুকর্মের দ্বারা মানুষ অধোগতি লাভ করে। এই উচ্চ নীচ স্থান লাভকেই গীতাশাস্ত্র স্বর্গ ও নরকের সাথে তুলনা করেছেন। এই নরকের প্রবেশ দ্বার তিনটি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মন।

কামক্রোধস্তথালোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যাজেৎ।।'

অর্থাৎ নরকের প্রবেশের তিনটি দ্বার আছে, তারা হল কাম, ক্রোধ এবং লোভ। কাম বলতে জৈবীক কামনা এবং অন্যান্য সকল প্রকার কামনা বাসনাকেই বোঝান হয়েছে। এই কামনা যখন পূর্ণ না হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন মানুষের মধ্যে জেগে উঠে ক্রোধ। ক্রুদ্ধ মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দেয়। তখন যে কোনো অপরাধজনক কাজ করতে সে পিছপা হয় না। ক্রমবর্ধমান লোভের বশবর্তী হয়ে সে পিতৃহত্যা পর্যন্ত করে।

আগে ভারতে ছিল বর্ণাশ্রমী সমাজ। কিন্তু বর্তমানে কেউ বর্ণানুক্রমিক ধর্মগুলির অনুসরণ করেন না। ব্রাহ্মণ স্বীয় ধর্ম থেকে স্খলিত হয়ে বৈশ্য শূদ্রাদির আচরণীয় ধর্মগুলি পালন করেন। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয় সমাজ নিজ নিজ কার্যগুলিকে বা ধর্মকে হীনমন্যতা বোধ হেতু অবহেলা করে তদিতর বর্ণের ধর্মগুলো অনুসরণ করে। বৈশ্য, শূদ্র কেবল তদপেক্ষা উচ্চ বর্ণ দু'টির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিন্দা এবং অপবাদ দেওয়াকেই নিজেদের আচরণীয় ধর্ম জ্ঞান করে। এভাবে সমাজের মধ্যে একটা উচ্চাবচভাব আপনা হতেই সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ অজ্ঞলোক তাকেই বর্ণ ব্যবহার কুফল মনে করে তার বিলোপ সাধনের জন্য যত্নবান হয়। বর্ণ ধর্মগুলো যেখানে সুচারু রূপে পালিত হত তা হল আশ্রম ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ বর্ণ ও ধর্মের অনুশীলন করত। কিন্তু বর্তমানে সেই বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থা উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটেছে। তাতে সমাজের সর্বস্তরে যে একটি সাম্য ফিরেছে তা নয় বরং অপর এক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা অর্থ এবং রাজনীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। একের সাথে অপরের দলগত ঐক্য না থাকায় উভয়ের মধ্যে মিলন সম্ভব হচ্ছে না। আর অর্থনীতি নির্ভর

যে সমাজ তাতে আর্থিক দিক দিয়ে যাঁরা বলবান তাঁরাই সমাজের প্রভুত্ব করছে। এবং এইভাবে সমাজে যে স্তরভেদ হয়েছে তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এটা সুখ বা শান্তি লাভের যথার্থ পন্থা নয়। সেই পথ প্রদর্শিত হয়েছে গীতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন যে 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্ট্যং'। *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক)* চারটি বর্ণ আমি সৃষ্টি করেছি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে চারটি বর্ণের আচরণীয় ধর্মগুলির উল্লেখ করে অবশেষে তিনি উপদেশে দিয়েছেন— 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১৮শ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)* অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে সিদ্ধি লাভ করে। কোনো কাজই কারও পক্ষে ছোট নয়। কেউ যদি মনে করে যে আমি শূদ্র এবং আমার কর্মসকল নিকৃষ্ট, সুতরাং আমি পরধর্মাচারণ করি, তবে তাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলা চলে যে নীচ সম্ভ্রম বোধ ত্যাগ করে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যে ধর্ম যাদের জন্য ব্যবস্থাপিত হয়েছে তারই অনুশীলন করা কর্তব্য। অন্যাথায় সমাজের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে। ঝাড়ুদার তাঁর পরিচ্ছন্নতার দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার করেন। কিন্তু এই কাজকে তার কোনো মতেই হেয় জ্ঞান করা ঠিক নয়। আবার উচ্চবর্ণের সকলের উচিত এই ঝাড়ুদারের প্রতি সহমর্মিতা এবং মমত্ব বোধ প্রদর্শন করা। প্রকৃতপক্ষে এটাই গীতার উপদেশ—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক)

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে আয়োজিত পরধর্মের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। বর্ণাশ্রম বিহিত স্বধর্ম পালন করে নিধনও শ্রেয় কিন্তু পরধর্মাচারণ করা খুবই ভয়াবহ। তাতে আপাত সুখ হলেও অন্তিমে তা দুঃখদায়ক বা গ্লানিজনক। সুতরাং এমতাবস্থায় গীতার উপদেশ পালন করাই যথার্থ মঙ্গলজনক। সমষ্টি তথা সমাজের অংশ হল ব্যক্তি। সমাজের সামঞ্জস্য ও কল্যাণেই ব্যক্তিরও কল্যাণ। ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে সমাজের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত করলে সমাজের অংশ ব্যক্তিও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমগ্রকে আঘাত করে অংশের উন্নতি অসম্ভব। এটাই গীতার অভিপ্রায়।

এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা যা আগে সমাজে প্রচলিত ছিল তা মূলত প্রবর্তিত হয়েছিল একবর্ণের সাথে অপর বর্ণের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবারণের জন্য, এটা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে অবহেলা করে অসবর্ণ বিবাহের প্রভূত প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু এর কুফলের চিন্তা বোধ হয় কেউই করেননি। পিতামাতা সবর্ণের এবং

সমগুণসম্পন্না না হলে তাদের সন্তান কখনো উত্তমগুণ সম্পন্ন হতে পারে না। অসবর্ণ বিবাহ সর্বত্র প্রচলিত হলে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সততা, সদাচার, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি গুণের অভাব দেখা দেবে। বর্তমানে যে কোনো স্কুল-কলেজের অধিকাংশ ছাত্র অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে সম্ভূত তা তাঁদের পারস্পরিক বাক্যালাপ এবং বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি অসদাচরণ দেখেই প্রমাণিত হয়। তাহলে কি আগের সমাজের অপেক্ষা বর্তমান সমাজকে কোন প্রকারে উন্নত বলা যাবে? এটা মনে হতে পারে যে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সমাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের বীজ যে সময়ে উপ্ত হয়েছিল তাছিল প্রাচীন ভারত। সুশ্রুত, চরক, আর্যভট্ট কেউই এই যুগের মানুষ ছিলেন না। যা বিজ্ঞান অদ্যাবধি দিয়েছে তাও ধার্মির ঋষির বহুযুগ সঞ্চিত সাধনার ফল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বলে মহাবিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় উদ্ভিদ রাজ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন বর্তমান শতাব্দিতে কিন্তু সুদূর অতীতে সংহিতাকার মনু বলেছিলেন— 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তেব সুখ দুঃখ সমন্বিতা।' *('মনুসংহিতা', ১ম অধ্যায়, ৪৯ শ্লোক)* অথাৎ এদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং এরাও সুখ-দুঃখ অনুভব করে। সুতরাং মনু প্রভৃতির জন্ম যে অসবর্ণ বিবাহ হতেই হয়েছিল এটা যথেষ্ট প্রত্যয়ের সাথে বলা যায় না। বর্তমান সমাজে যা চলছে তাহল বর্ণসঙ্কর। সেই মনুর কথাতেই বলা যেতে পারে—

> 'ব্যাভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেদ্যাবেদনেন চ।
> স্বকর্মানাঞ্চ চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।।'

('মনুসংহিতা', ১০ম অধ্যায়, ২৪ শ্লোক)

বর্ণের ব্যাভিচার অর্থাৎ এক বর্ণের স্ত্রী এবং অপর বর্ণের পুরুষের যে বিবাহ প্রধানত অধম বর্ণের পুরুষ এবং উত্তম বর্ণের স্ত্রীর বিবাহই প্রকৃত বর্ণ ব্যাভিচার। সগোত্রে বিবাহ সম্পাদন এবং বর্ণানুযায়ী নির্দিষ্ট যে কর্ম তার ত্যাগ এই দ্বিবিধ কর্মের দ্বারা বর্ণের সাঙ্কর্য উপস্থিত হয়। এই বর্ণ সঙ্কর যাকে বর্তমান সমাজে মানুষের উন্নতির প্রধান সোপান রূপে সমাদার করা হচ্ছে, তার কুফল সম্বন্ধে গীতা বলা হয়েছে—

> 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
> পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদাক ক্রিয়াঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ১ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক)

কুলের সঙ্কর হলে কুলনাশকারী ব্যক্তি নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি কাজে তার আর কোনো অধিকার থাকে না, ফলে তাঁর পিতৃপুরুষগণ পর্যন্ত নরকগামী হয়। বর্তমানে একশ্রেণীর সম্প্রদায় বিশেষ রাজনৈতিকভাবে ভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মের শাশ্বত ও সনাতন যে জন্মান্তরবাদ তাকে অস্বীকার করছেন এবং নিজ দলমধ্যে

এরকম প্রচার করছেন যে তা নিছক ধর্মীয় কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং জন্মান্তরবাদকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন এবং বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। যদিও তাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ভর করে না তথাপি সাধারণ অজ্ঞলোক নেতৃত্বগুণবিহীন এই সকল নেতার চাটুবাক্যে নিজেদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন। এমতাবস্থায় গীতার উপদেশ অনুসরণ করলে তাঁরা সত্যোদ্ঘাটন করতে সমর্থ হবেন। এবং তখনই বিবেকানন্দের মতন বলতে পারবেন যে— 'সত্যের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা যায় কিন্তু কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' ***('বাণী ও রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩২১)*** কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, এর জন্য প্রয়োজন সাধনার। সেই সাধনার স্বরূপ গীতায় এইভাবে বলা হয়েছে—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতের পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রণতি, জিজ্ঞাসা, এবং সেবার দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে উপদেশ করবেন। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। কারণ প্রণতি বর্তমান সমাজ হতে একেবারেই অন্তর্নির্হিত হয়েছে। পুত্র পিতাকে বা ছাত্র শিক্ষককে প্রণতি করছেন এই রূপ দৃশ্য বোধ হয় একবিংশ শতাব্দীতে একেবারেই হাস্যাস্পদ। দ্বিতীয়ত, সেবা, যা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ব্রহ্মচারীর একমাত্র গুণ ছিল এবং এই সেবার দ্বারা গুরু, গুরুপত্নী এবং গুরুতনয়কে সন্তুষ্ট করে শিষ্য সর্বোত্তম জ্ঞান লাভ করতে পারত। কিন্তু বর্তমান সমাজে চাতুর্বণ্য এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মানবিক গুণগুলি লুপ্ত হয়েছে। এখন সেবা কেবল আরোগ্যনিকেতনের সেবিকাদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে। আর বিনয়? সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা যাঁরা ভজনালয়ে দেবসন্নিধানে সাধন ভজন করেন তাঁদের মধ্যেও বিনয়ের অভাব। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

'এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, অত অহংকার!'

('রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯০)

কিন্তু গীতার উপদেশ স্মরণ করে প্রণতি, সেবা এবং প্রশ্ন পরিপ্রশ্নের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করে মহত্তম জ্ঞান লাভ করা যায় সুতরাং সেই পন্থাবলম্বনই শ্রেয়।

বর্তমান সমাজে যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার মুলানুসন্ধান করলে রাগ এবং দ্বেষকেই একমাত্র কারণ রূপে চিহ্নিত করা যায়। এই হিংসার বশবর্তী হয়ে বা রাগান্ধ হয়ে মানুষ করতে না পারে এমন কুকর্ম নেই। তাই গীতা উপদেশ দিয়েছে—

'ইন্দ্রিয়স্যোন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থি নৌ।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক)

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বীয় অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই রাগ এবং দ্বেষের অধীন হবে না, কারণ তারা পুরুষের শ্রেয়োলাভের বিরোধী। এই সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে যদি ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজেদের বশে রাখা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ২য় অধ্যায়, ৬১ শ্লোক)* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো যাঁর বশে আছে তার প্রজ্ঞাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কূর্ম যেমন ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য হস্তপদাদিকে নিজের অঙ্গের মধ্যে উপসংহার করে সেরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী বিষয়গুলো থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিবৃত্ত করে গোপন রাখে। গীতার উপদেষ্টা সমাজ সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন যে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় তাঁর পরিজ্ঞাত ছিল। উপদেশ প্রদান এবং পালনের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। উপদেশ প্রদান করতে হয়ত অনেকেই পারেন কিন্তু তা কার্যকর করতে সকলেই সমর্থন হন না। কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি এটা বলেছেন যে— 'আমার ত্রিভুবনে কোন কর্তব্য নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই তথাপি আমি লোককল্যাণের জন্য সর্বদা কর্মে লিপ্ত আছি।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক)* এর কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন—

'যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করেন সাধারণ লোকে তাই অনুকরণ করেন। শ্রেষ্ঠ লোকেরা কর্মের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ বলেন— 'অজ্ঞান আঁধারের ভিতর দিয়ে মানুষকে চলতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেব আচরণের আদর্শ তাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংস মুখে পতিত হইতে পারে। যাহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে, তাহারা স্বভাবতই মানুষের নেতা, কারণ

তাঁহারাই মানুষকে দেখাইতে পারে যে কোন আদর্শ মানবজাতিকে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু ভগবতভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার প্রভাবের, তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকবেই যাহা সাধারণ মনুষ্যের থাকিতে পারে না।' *('অরবিন্দের গীতা', অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত গীতার ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৪ হতে সংকলিত)* সমাজের এই সাধারণ বিষয়টিও গীতার দৃষ্টিভঙ্গি হতে বাদ যায় না। সুতরাং সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায় বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা উচিৎ যাহা সাধারণ মানুষকেও সেই কর্মে নিয়োজিত করতে পারে।

বর্তমান সমাজে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি উভয়ই তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার ব্রহ্ম এবং সাকার ঈশ্বরের বিষয়ে সবিস্তারে উল্লেখ করে বলেছেন যে নিরাকারের উপাসনা সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা সাকার ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারেন। এই উভয় বিধ আরাধনার ফল কিন্তু একই। অবতারবাদের মূল কথাটিও কিন্তু গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্যক্ত হয়েছে। যখন অধর্মের প্রাদুর্ভাব ও ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরের অবতরণ হয়। গীতোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যাতা অবতার হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁরাই প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন— 'শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)* অর্থাৎ শ্রদ্ধার সাথে মদ্গত চিত্তে যিনি আমার ভজনা করেন তিনি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জগতে ঈশ্বরলাভের অনেক পথ আছে এবং ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের অভাব নেই। সকল ধর্মই নিজেদের প্রশস্তি করে সেই সেই ধর্মানুসারে ঈশ্বর আরাধনা করতে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু গীতা বিশ্বের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হলেও তা কখনোই বলে নাই যে এই মতানুসারেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৪র্থ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* অর্থাৎ যে যেভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেইভাবেই তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করি। সমাজের যে কোনো স্তরের যে কোনো মানুষ তাঁরা যেরূপ বৃত্তি দ্বারাই জীবন ধারণ করুন না কেন ঈশ্বরকে ভক্তির সাথে যে যেভাবে অর্চনা করেন ঈশ্বর তাতেই তুষ্ট হন। বস্তুত— 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ ঋজু-কুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যঃ।' *('শিবমহিম্ন স্তোত্রম', বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি, ১৯৮০, পৃ. ১৭৬)* শিবমহিম্ন স্তোত্রের এই কথারই প্রতিধ্বনি গীতায় 'যে যথা মাং প্রপদ্যতে'-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের তথা গীতার সর্বোচ্চ আদর্শ এই বাক্যটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বর্তমান সমাজে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আছে। কেউ হয়ত শিবের উপাসক, কেউ কৃষ্ণের, কেউ খ্রীষ্টের, কেউ মহম্মদের, কেউ নানকের, কেউ

বা বুদ্ধের। কিন্তু এই বিভেদ নিরাকরণের জন্য যে সহজ সরল পন্থা গীতায় প্রদর্শিত হয়েছে তা বিভেদ ভুলিয়ে এক মহাধর্ম সমন্বয়ের সেতু রচনা করে। ভগবান বলেছেন—

'যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।'

('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৭ম অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

অর্থাৎ যে দেবভক্ত যে মূর্তি শ্রদ্ধার সাথে অর্চনা করেন সেই দেবমূর্তিতে আমি তাকে অচলা ভক্তি প্রদান করি। গীতা প্রবক্তার এই বাক্যের মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে, যা বর্তমান সমাজের পক্ষে খুবই হিতকর। এতে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি যা সমাজের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করতে পারে তা বিদূরিত হয়।

সাধারণ এক শ্রেণীর মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাদের যুক্তি এই যে ঈশ্বর যখন সকল কিছুই করতে পারেন সর্বত্র গমন করতে পারেন তখন তাঁর দেহ ধারণের প্রয়োজন কী? সন্দিগ্ধ চিত্ত একশ্রেণীর মানুষ যে কলির শেষে এইরূপ অসঙ্গাত প্রশ্ন উত্থাপন করবে সেই বিষয়ে গীতার উপদেষ্টা বেশ সচেতন ছিলেন। কারণ, তিনি বলেছেন— 'আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব এবং সকলের আত্ম স্বরূপ হলেও যেহেতু আমি মনুষ্য দেহ ধারণ করে আছি সেজন্য আমার পরম স্বরূপ না জেনে মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৯ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক)* পাপ এবং অধর্ম থেকে জগৎকে রক্ষা করে লোক কল্যাণ বা লোকসংগ্রহের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। মনুষ্য দেহ ধারণের পর সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা আচারণ করেন যে উপদেশ প্রদান কবেন তা সকলেই মান্য করে। ঠাকুরের চাপরাশ গীতার ভাষায়— 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।' *('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক)* অতএব সর্বভূতে সেই করুণা ঘন পরম প্রেমময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলে কোন সমস্যাকেই আব সমস্যা বলে মনে হবে না। আত্মসংযমবিহীন মানুষ একটুমাত্র সুখলাভে আহ্লাদিত হন, আবার স্বল্প দুঃখেই ভগ্ন হৃদয় হয়ে পরেন। ভারতীয় সংস্কৃতির বা হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তিই হল। আধ্যাত্মিকতা। সেই সুদূর নবজাগরণের সময়ে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ হওয়ার দরুণ কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই আধ্যাত্মিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে বলেছিলেন— 'যারা ভারতের নবজাগরণের কথা বলছে তাদের বলতে দাও। আমি সারা জীবন ধরে কাজ করছি, অন্তত করবার চেষ্টা করছি; আমি বলছি যতদিন না তোমরা আধ্যাত্মিক হবে ততদিন ভারতের নবজাগরণও নেই। শুধু তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর শুভাশুভ তারই উপর নির্ভর করছে।' *('বাণী ও*

রচনা', স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮২) খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে হতে পারে যে বিবেকানন্দ অধ্যাত্মিকতার রাজ্যে বিচরণ করেছিলেন বলে তিনি হয়ত সমস্ত পৃথিবীর শুভাশুভের একমাত্র কারণ হিসাবে এই আধ্যাত্মিকতার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মত কর্মব্যস্ত রাজনীতিবিদও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন— 'আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের আদর্শ অপরের আদর্শ থেকে ভিন্ন ! ভারতবর্ষ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত। এই দেশ স্বেচ্ছায় আত্মশুদ্ধির যে পথ বেছে নিয়েছে পৃথিবীতে তা বিরল। ভারতবর্ষে লৌহ নির্মিত অস্ত্রের আবশ্যকতা নেই, চিরকাল সে আধ্যত্মিক অস্ত্রে সংগ্রাম করেছে, আজও তা করতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি পশুশক্তিতে আস্থাবান। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সর্বজয়ী হতে পারে। পশুশক্তি আত্মশক্তির কাছে যে কত দুর্বল ইতিহাস তার অজস্র নিদর্শন বহন করছে, কবিগণ তার বিজয়গাথা গেয়েছেন, দার্শনিকগণ জানিয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা।' *('গান্ধী রচনা সম্ভার', শতবার্ষিক সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬)* প্রত্যেক মানুষ যখন তাঁর অন্তরস্থ অতীন্দ্রিয় চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে এবং বিশ্বাত্মার সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপন করবে সেই দিন ভারতবর্ষ জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। যে আধ্যত্মিকতা মানুষকে উন্নতির চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারে সেই আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করে ক্ষুদ্রকায় অথচ মহৎভাব বিশিষ্ট একখানি গ্রন্থ যা বর্তমান বিশ্বের সকল ভাষাভাষী এবং সকল ধর্মাবলম্বী কর্তৃক সমাদৃত হচ্ছে, তাই গীতা। গীতাপাঠের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেন— 'গীতার মধ্যে যে সার্বজনীন চিরন্তন সারসত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে পারে—তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতা পাঠের উদ্দেশ।' *('গীতা নিবন্ধ', অনিলবরণ রায় অনূদিত, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬)*

অধুনা সাধারণ্যের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে বিজ্ঞানের বলেই মানুষ সকল কাজ সম্পাদন করতে পারে তার জন্য ঈশ্বরের অনুধ্যান বা ধর্মাচরণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের যুক্তি এই যে বিজ্ঞানের সাধনা করেই মানুষ চন্দ্রলোকে পদার্পণ করেছে, মহাশূন্যে কালাতিবাহন করছে, সুতরাং ঈশ্বর চিন্তা দুর্বল মস্তিষ্কের লোকের পক্ষেই শোভন। কিন্তু অদ্যাবধি এমন কোনো জনহিতকর কার্য বিজ্ঞান বলে সম্পাদিত হয়নি যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুজ্ঞাত নয়। বিজ্ঞান বলে মানুষের চন্দ্রাভিযান যেমন সকল হয়েছে এটা সত্য তেমনই অনেক অভিযান এমনভাবেই বিফল হয়েছে তাও মিথ্যা নয়। বক্তব্য এই যে জগতের যা কিছু শুভাশুভ তার সকলের কর্তাই ঈশ্বর। মানুষ যে কার্যের কর্তা বলে নিজেকে দাবী করে সেই